জেলে মিসা
বাইরে মিসা

হরিপদ ভারতী

গ্রন্থপ্রকাশ | ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৪৮

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

শ্রীশিশিরকুমার সরকার

শ্যামা প্রেস

২০বি ভুবন সরকার লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

যাঁকে চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল তাঁকেই উৎসর্গ করলাম

লেখকের কথা

প্রথম প্রথম সোজা সড়কেই হেঁটেছিলাম,—চিঠিপত্তর লিখে নিয়মমাফিক জেলকর্তৃপক্ষের হাতেই সদ্‌গতির আশায় সঁপে দিয়েছিলাম। তা যথাকর্তব্য করেওছিলেন তাঁরা। আলীপুর থেকে বালীগঞ্জ পেঁছোতে পত্রের প্রায় একমাস লেগেছিল। তা-ও সেই প্রথম পত্রের বেলায়। তারপরের পত্রগুলো তো এতকাল পরেও পাত্রস্থ হতে পারিনি বলে শুনেছি। তা'ছাড়া বাড়তি বিড়ম্বনাটুকু তো এ প্রসঙ্গে অসহ্যই ঠেকেছিল একদিন। চিঠি-পত্রের কোন উত্তর পাচ্ছি না কেন—শুধোতে গিয়েছিলাম জেলের ওয়েলফিয়ার অফিসারের কাছে।—শুনলাম,—যুবকটি নাকি আমার ছাত্র ছিল ক'বছর আগে। তা সে তো আনন্দের কথাই,—কিন্তু ওই ছাত্র-অফিসারের মুখেই যখন আরও শুনলাম—যে আমার পত্রাদি সে যথারীতি প'ড়ে দেখেছে, এবং আপত্তিকর কিছু তো তার নজরে পড়েনি,—তাই লেনদেনে বিলম্বের কোন কারণ তো সে খুঁজে পাচ্ছে না,—তখন মনে হয়েছিল ধরণী দ্বিধা হও। আমার ছাত্র—আমার স্ত্রীকে লেখা পত্র পড়ে দেখবে! আর আপত্তিকর কিছু না পাওয়ায় —পাস্ যোগ্য ব'লে মন্তব্য ক'রবে! আর এত কাণ্ডের পরেও চিঠিগুলো যথাস্থানে যাবে না!—যথাসময়ে আসবে না!—হায় ভগবান! তা সেই থেকেই—ও সোজাপথ ছেড়ে বাঁকাপথ ধরেছিলুম। চিঠি লিখতুম, আর 'ইন্‌টার্‌ভিউয়ের টাইমে' 'আই, বি,'র আঁখিকে ফাঁকি দিয়ে টুপ্ ক'রে গৃহিনীর ব্যাগে ফেলে দিতুম। তা ওই ভাবে পাচার করা পত্র যখন,—তখন আকারেও বড়সড় করতুম, ধরণধারণও পাল্টে দিতুম,—মন খুলে মনের কথা বলতুম। তা স্ত্রীকে লেখা হলেও সেই পত্রগুচ্ছের কিছু কিছু—সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যেও আজ প্রকাশ করছি—এক অব্যক্ত আশা নিয়ে,—যে আশা পূরণের মধ্যেই এ লিপি-প্রকাশের সার্থকতা,—এ লিপি-লেখকের কৃত কৃতার্থতা।…

এক

হয়তো বা মগ্নচৈতন্যেরমাহাত্ম্য বশতই, কিংবা নিছক অভ্যাস-বশতই হয়তো বা,—অকস্মাতই নিদ্রাতুর চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত হলো। চোখে পড়ল—মোটা-মোটা লোহার রেলিং ঘেরা,—লোহার জালে মোড়া, সর্বাংগে সোনালী আলো মাখানো লম্বা একফালি ভেন্টিলেটার।

অর্ধ-আচ্ছন্ন চৈতন্য অবাক বিস্ময়ে ভাবল,—এ কোন্ ভেন্টি-লেটার?—কই, আগে তো কখনও চোখে পড়েনি! আর ওই আলোই বা কোন্ বহির্জগতের!—কই, পূর্বে তো কোনদিন প্রত্যক্ষ করিনি এমন ভাবে!...

কিন্তু এ বিস্ময় নিতান্তই ক্ষণকালের।—এ মোহ কেবলমাত্র মুহূর্ত কয়েকেরই। একটু একটু ক'রে সবই মনে পড়তে লাগল প্রিয়া। মনে পড়ল,—শুধু ওই ভেন্টিলেটার কেন,—এই ঘর,এই শয্যা, এখানকার তাবৎ সাজ সরঞ্জাম,—এ সবই তো আমার অপরিচিত।—এ সবই নতুন। আজকের এই প্রভাত,—প্রভাতের এই আলোকচ্ছটা,—এও আমার ঠিক পরিচিত নয়। এ প্রভাতও হয়তো তেমনি তমিস্রানাশী,—কিন্তু বেদনায় বিষণ্ণ। এ প্রভাতও হয়তো সোচ্চার মুক্তিমন্ত্রউদ্গাতা,—কিন্তু সে স্বয়ং শৃঙ্খলিত,—বড় বড় লোহার গরাদ ঘেরা 'লক্ আপে' বন্দী।...

ধীরে ধীরে পূর্বাপর অনেক ঘটনাই মনে পড়তে লাগল। দৃশ্যের পর দৃশ্য স্মৃতির পরদায় দ্রুততালে আসা যাওয়া সুরু করল। মনে পড়ল,—ছুটি আপাত নিরীহ,—নিতান্তই গোবেচারা গোছের ছুটি ভদ্র সন্তানের মুখ,—যাঁরা নাকি ছ'জন স্পেশাল ব্রাঞ্চের

অফিসার। ওঁদের কথাই প্রথম মনে পড়ল, কারণ ওঁদের দিয়েই এক অর্থে তাবৎ বৃত্তান্তটা শুরু। তুমি তো সে সবই জানো।...

শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৭৫ সাল। সন্থ মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত ক'রে একটু গড়িয়ে নেবার আশায় শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি। বিকেল চারটায় আবার প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স,—বিষয় মানা ক্যাম্পের উদ্বাস্তু,—তাই গড়িয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না কিছু। কিন্তু না, ওটুকুও বরাতে সইল না,—অকস্মাতই ব্যাকুলভাবে বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক বেলটা বেজে উঠল। পরিচারিকা এসে সংবাদ দিল,—ওঁরা এসেছেন। থানা থেকে।...

এর পরে আর জিজ্ঞাস্য থাকবার কথা নয়। জানতামও এক-রকম যে ওঁরা আসবেন। গত দু'দিন ধ'রে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী সাক্ষাতে, টেলিফোনে,—ওঁদের ভাবী পদধ্বনির বার্তা আমাকে শুনিয়েছেন। জয় প্রকাশ নারায়ণ থেকে শুরু করে তাবৎ বিরোধী দল নেতাদের সন্থ সন্থ গ্রেপ্তারের সংবাদও এ অভাজনের গৃহে মহাশয়দের শুভ পদার্পনের সম্ভাবনাকে স্বাভাবিক ক'রেও তুলেছিল। বেশ কিছু দিন ধ'রে 'টেলিফোন ট্যাপিং'-এর বন্দোবস্তটাও যে অহেতুক নয়,—তাও বুঝেছিলাম। কিছুদিন যাবৎ যত্রতত্র অনুসরণকারী সাদা পোষাকধারী ওঁদের কাউকে কাউকে যেন চিহ্নিত করতেও পারছিলাম। তাই এক রকম নিশ্চিতই জানতাম,—ওঁরা আসবেন। সত্যিকথা বলতে কি—ওঁদের অমন আসাটা যেন আত্মসম্মানের পক্ষে অনুকূল ব'লেও ভাবতাম। মনে মনে তাই প্রতীক্ষা করতাম,—কবে ওঁরা আসবেন!—কখন!—কোথায়!

কিন্তু কেন জানি মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে ওঁরা শেষ রাত্রেই আসবেন কোনদিন। সারা অঞ্চল যখন নিঃশব্দ নির্জন,—এমনকি এ বাড়ীর প্রতিটি ফ্ল্যাটের মানুষও যখন ঘুমে অচেতন,—তখন চুপিসাড়ে ওঁরা আসবেন,—সকলের অজান্তেই কাজ

সেরে চ'লে যাবেন,—যেমন সচরাচর ওঁরা করে থাকেন। কিন্তু না, —তা হলো না। এই একরকম ভরদুপুরেই ওঁরা এলেন।—তবে ভদ্রতাবোধ ওঁদের অসাধারণ, সৌজন্য সীমাহীন,—তাই পুলিশ মার্কা কোন গাড়ী টাড়ী নয়,—কনেষ্টবল নয়,—মায় ইউনিফরম পরা কোন অফিসারও নয়,—কেবল প্রায় নতুন চকচকে এক এ্যামবাসাডার কার,—আর ধোপদোরস্ত স্যুট পরিহিত ওঁরা দুই ভদ্রলোক,—তাও বিনয়ে প্রায় বিগলিত। তাছাড়া, গ্রেপ্তার টেপ্তার জাতীয় বিশ্রী ব্যাপার তো নয় কিছু। ডি, সি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর আহ্বানে তাঁরই পাঠানো গাড়ীতে চ'ড়ে নিছক কিছু আলাপ আলোচনার জন্যই তো একবার লর্ড সিন্‌হা রোডে রওনা হওয়া। ব্যস্,—তার বেশী তো আর নয় কিছু।··

কিন্তু একেবারে অপরিচিত তো নয় দৃশ্যটা,—তাই বহিরঙ্গ ছেড়ে অন্তরঙ্গ দিকটিতেই মন দিলাম। কাপড় জামা বদলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তোমাকে বললাম,—মনকে প্রস্তুত রেখো,—চলি· ·

তারপর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসলাম। ভদ্র সন্তান দুটি পেছনের সিটেই আমার দু'পাশেই দু'জন বসলেন। ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো।···

অসময় হলেও,—আশপাশের বাড়ী থেকে অনেকে এ দৃশ্য দেখলেন—দেখলাম।—তবে তেমন কোন বিশেষ কৌতূহল তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। হয়তো ভাবলেন, ···এমন তো প্রায়ই ঘটে,—যায় তো লোকটা এমনি গাড়ীতে চ'ড়ে সভাসমিতিতে,—এও বোধ করি তেমনি কোন মামুলী যাত্রাপর্ব। কিন্তু প্রকৃত কাহিনী জানতো যে মানুষটা—সেই তুমি ? তুমি তখন নিতান্তই এক বিষাদ প্রতিমার মত ওপরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছো। গাড়ীটা বাঁক নেবার মুহূর্তে পেছন ফিরে দেখলাম,—রেলিংয়ে মাথা রেখে তুমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছো।···

লর্ড সিন্‌হা রোডস্থ 'এস্-বি' অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছালাম,—

তখন আর সে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নয়,—দস্তুরমত বর্ষণ সুরু হয়েছে। সঙ্গে দাপট ভরা দমকা হাওয়া। আর ওই ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে যথাসম্ভব আমার মাথা বাঁচাবার জন্যই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করলেন সেই দুই এস বির ভদ্রলোক। গাড়ীটাকে নিয়ে গিয়ে তো একেবারে সিঁড়ির মুখে দাঁড় করালেনই,—তারপর চকিতে কোথা থেকে একটা ছাতা নিয়ে এসেও আমার মাথায় ধরলেন। প্রয়োজন মত আরও কোন সাহায্যে লাগতে পারেন ভেবে—কাছাকাছি ছুটে এলেন আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। তারপর নমস্কার ও কুশল প্রশ্নাদির স্বাগত সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে একজন বেশ গন্যমান্য ব্যক্তির মতই সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলাম। সেখানেও আবার আর এক দফা নতুন নতুন নমস্কারের নিবেদন-পর্ব, কুশল প্রশ্নাদির সোচ্চার সমারোহ। এবং—তারপর একটি প্রশস্ত অফিসকক্ষে চেয়ার গ্রহণের অনুরোধ ও একটি দামী পেয়ালায় ধূমায়িত স্পেশাল চা সেবনের আবেদন। অর্থাৎ এটা যে একটা গ্রেপ্তারী কাণ্ড-কারখানা,—এবং এর আসন্ন পরিণতি যে সরকারের শত্রুরূপে চিহ্নিত একটি নরাধমকে কারাগারে প্রেরণ,—আচারে আপ্যায়নে তার বিন্দু-বিসর্গও আঁচ করা শক্ত তখন। এমনকি—এরপরে একজন অফিসার এসে যখন আমার ষ্টেট্‌মেণ্ট অর্থাৎ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে বসলেন, তখনও সৌজন্য প্রকাশে এতটুকু ঘাটতি দেখা দিল না কোথাও। যেন নেহাতই একটা মামুলী কর্তব্যকর্ম, না করলেই নয়,—তাই। তাছাড়া ওই 'ষ্টেটমেণ্ট' পর্বের শুরুতেই এবং প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের আগে ও পরে যেভাবে 'এক্সকিউজ মি স্যার'—'মাপ করবেন' প্রভৃতি শব্দাবলী সমর্পণ করতে থাকলেন,—তাতে ক'রে ব্যাপারটা যে আদ্যন্ত বিরক্তিকরই তা মনে হবার তেমন অবকাশই মিলল না। এর ওপর আবার থেকে থেকেই তাবড় তাবড় অফিসাররা সব এসে এসে যখন কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং আমার ভাষণের যে বড়ই ভক্ত তাঁরা—সে কথাও বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করতে

আগলেন, তখন তো মর্যাদাবোধ যেটুকু বা ক্ষুন্ন বোধ করছিল মাঝে মাঝে—তাও আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। মোটের ওপর—যে ভাবেই দেখা যাক,—ঠিক বিরক্তিকর বা বিশ্রী কোন ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছিল না কখনও। এর ওপর একজন বড় ধরণের এক অফিসার এসে যখন দস্তুরমত দুঃখ প্রকাশই করলেন—আমাকে এভাবে ডেকে এনে কষ্ট দেবার জন্য,—তখন যে কেবলমাত্র তাঁর সৌজন্যবোধেই যারপরনাই সন্তুষ্ট বোধ করলাম—তাই-ই নয়,—মনের কোনে একটা ক্ষীণ আশাও পোষণ করতে সুরু করলাম যে সুরুতে সত্যি কথাই হয়তো বলেছিলেন সেই দুই ভদ্রলোক। কিছু আলাপ আলোচনার জন্যই ডেকেছিলেন এঁরা; আটক করে রাখবার মত কোন মন্দ অভিপ্রায় এঁদের নেই। তা না হ'লে—এমনধারা ব্যবহার সব করবেন কেন! এমন সব কথা বলবেন কেন! এত ঘন ঘন স্পেশাল চা খাওয়াবার জন্য অমন পীড়াপীড়ি করবেন কেন! খাইনা জানালেও—এমন বারবার দামী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে এগিয়ে ধরবেন কেন!…

তবে সুরুতেই অতিশীর্ণ আশালতা তো,—তাই 'পুয়ে পাওয়া' ছেলের মত সূতিকাগারেই অকালমৃত্যুর আশঙ্কা কিছুটা জড়িয়েই রইল। অন্তর্জলিটা অবশ্য সম্পূর্ণ হলো কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু ততক্ষণে সর্বোদয় নেতা শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং ভারতীয় লোকদলের রাজ্যশাখার সভাপতি শ্রীসুশীল ধাড়া মহাশয়ও আমার ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসেছেন। আর তাতে ক'রে কতকটা বাড়তি সুবিধেও হলো কর্তাদের। একজন অদৃষ্টপূর্ব অফিসার এসে একই জায়গায় পর পর আমাদের তিনজনকে তিন কেতা কাগজ ধরিয়ে দিলেন। আর তাইতেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেলো ব্যাপারটা। 'মেইনটেনান্স অব ইন্টারনাল্ সিকিউরিটি অ্যাক্ট'—অর্থাৎ এক কথায় সেই বহুখ্যাত 'মিসা'তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমাকে! কলকাতার সদাশয় পুলিশ কমিশনার মহাশয়—৭ভি,

কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা নিবাসী স্বর্গত কেদারনাথ ভারতীর পুত্র এই অভাজন হরিপদ ভারতীকে দেশের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কর্মাদি থেকে বিরত রাখবার জন্যই এই আটক আদেশ জারী করেছেন।

এরপর আর লর্ডসিন্‌হা রোডে কালহরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। পূর্বেও যে এতখানি সময় অযথা অপব্যবহারের প্রয়োজন কিছু ছিল,—তাও নয়। দেখেশুনে মনে হলো—আগে থাকতে সবই স্থির করা ছিল। তবুও এমন গড়িমসি করবার হেতুটা বোধ করি এই যে—যে কোন কারণেই হোক, গ্রেপ্তার করবার বেলায় দিবালোকটা বেছে নিলেও আমাদের জেলে পাঠাবার সময় হিসেবে রাত্রির অন্ধকারটাই ওঁদের বেশী পছন্দসই ছিল। তা ওই—বৃষ্টিঝরা বিগত সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যেই আবার সেই অ্যামবাসাডার কারে করেই সাদা পোষাক পরিহিত অফিসাররাই আমাদের নিয়ে চললেন আলীপুরস্থিত প্রেসিডেন্সী জেলের দিকে। ততক্ষণে অবশ্য জেনে গেছি যে ওই একই মিসা প্রযুক্ত হয়েছে আমি ছাড়া আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে। ক্ষিতীশবাবু, সুশীলবাবু ছাড়াও সঙ্গী হলেন—পঃ বঃ সংগঠন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, পি, এস, পি, নেতা—শ্রীঅশোককুমার দাশগুপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এক যুবক সংগঠন কংগ্রেস কর্মী শ্রীননী ঘোষ। আর একই

সঙ্গে দুর্ভাগ্যের দাঁড়িতে আমরা এতগুলি লোক যে এমন একইভাবে বাঁধা পড়লাম দেখে মনের অবস্থাটা অনেকটা 'বিষাদে হরিষ'-এর মতন হলো। যাক্ বাবা, একলা নই তাহলে,—একই সূত্রে সহস্র না হোক,—ছজন অন্ততঃ বাঁধা পড়েছি!···ব্যস্—তারই পরবর্তী অধ্যায় হিসেবেই এই তাবৎ দৃশ্যাবলী,—ওই অচেনা ভেন্টিলেটার,—এই ক্ষীণদেহ, শয্যা, এই গরাদ ঘেরা ঘর,—এমন বদ্ধ, সঙ্গীহীন পাণ্ডুর প্রভাত!···

তবে ঠিক সাবলীল ভঙ্গীতেই যে পূর্বাপর অধ্যায় দুটো রচিত হয়েছিল,—তা নয়। লর্ডসিন্হা রোড থেকে প্রেসিডেন্সী জেলের ফটক পর্যন্ত কাহিনীটা একরকম বেশ স্বচ্ছন্দগতিই ছিল,—কিন্তু তারপরই কেমন যেন গয়ংগচ্ছ ভাব ও গোঁজামিলী বন্দোবস্ত। একে তো অহেতুক জেল অফিসেই বসিয়ে রাখলে অনেকক্ষণ,—সঙ্গের টাকা পয়সা, সোনার বোতাম আংটি প্রভৃতি লিখে পড়ে জমা নিতেও বেশ কিছুটা সময় লাগালে অকারণ,—তার ওপর জেলের ভেতরে ঢুকিয়ে তো একেবারে সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা!—কোথায় যে নিয়ে যাবে আমাদের,—কোন্ অঙ্গনে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে একটু জিরোবার অবকাশ পাব আমরা,—তা যেন ঠিক জ্ঞাত বিষয় নয় ওদের কারো! দু'কদম হাঁটিয়ে—প্রথমটায় তো একটা অফিস মতন ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে গুটিকতক চেয়ারে বসালে। তারপর আমাদের আশেপাশে গুটিকতক মানুষকে দাঁড়-করিয়ে বাকী মানুষগুলো কোথায় কোথায় যেন সব ছুটলো কি কি সব ব্যবস্থা করতে। ব্যস্, সেই যে সব ব্যবস্থা করতে গেল—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তাদের কারো আর কোন পাত্তা নেই। অথচ—এদিকে তখন আমাদের সব যারপরনাই দুরবস্থা। একে তো তিন দিক খোলা খানিকটা আচ্ছাদিত জায়গা,—তায় ঝর ঝর বৃষ্টি আর অবিরাম ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, সর্বাঙ্গ ভিজে প্রায় একশা। থেকে থেকে চেয়ার টেবিল টেনে টুনে,—এদিক ওদিক সরিয়ে টরিয়েও

—কিছুতেই গা মাথা ঠিক বাঁচাতে পারছি না। তাছাড়া—পাশের প্রকাণ্ড খোলা ড্রেনের দুর্গন্ধও অস্বস্তি কম বাড়াচ্ছে না। তার ওপর—ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অতখানি রাত্রেও কাতারে কাতারে লোক আসছে আমাদের দেখতে,—আর তাদের অনেকেই আশে-পাশে জমে যাচ্ছে। আর তাতে ক'রে কষ্টের মাঝখানে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবার সুযোগ মিললেও—অতগুলি কৌতূহলী অথচ নীরব চোখের সামনে অমন দ্রষ্টব্য হয়ে বসে থাকতে বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ না করেও পারছিলাম না। আবার ওই কারণেই থেকে থেকে—বেশ বিস্ময়ও বোধ করছিলাম,—কিরে বাবা! জেলখানা তো,—এতরাত্তির অবধি তবুও এত লোক এমন জমছে কি ক'রে ইতস্ততঃ! যাই হোক, ঘণ্টাখানেক বাদে আমাদের আস্তানার অন্বেষণে রত দলটি ফিরে এল এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রায় অন্ধকার গলিমতন রাস্তা দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গিয়ে লোকে লোকারণ্য এক ওয়ার্ডের বারান্দায় গিয়ে আমরা উঠলাম। লক্-আপ খুলে আমাদের প্রায় সেখানে ঢোকায় আর কি ওরা,—এমন সময় অশোককৃষ্ণ দত্ত মশাই-ই কথাটা পাড়লেন,—'গ্রুপ্ সি'—মার্কা কয়েদীদের কি এইখানেই থাকবার ব্যবস্থা?—আর অশোকবাবুর ওই কথাতেই এতক্ষণের অনিশ্চিতির ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠল। লোটা-কম্বল নিয়ে—কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার সেই পূর্বস্থানে ফিরে আসতে হলো,—যেখানে বাইরে—এক কালো রঙের টীনের ফলকে—ওপর নীচে—পর পর লেখা আছে—'চুপ থাকুন', 'কেস্ টেবিল্,' আর 'চুপ্ রহিয়ে'। বাংলা আর রাষ্ট্রভাষায় লেখা দুটোর মর্মার্থ তো পরিষ্কার,—কিন্তু মাঝখানের ওই আংরেজী 'কেস টেবল্'—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তা না পারলাম,—অমন কত জিনিষই তো সংসারের বুঝতে পারিনি, তাতে কিছু আসে যাচ্ছেও না,—কিন্তু এতখানি রাত হলো,—এখন ওই গন্তব্যস্থানটার হদিশ না পেলে তো সত্যিই মুস্কিল। আরও

মুস্কিল—ঠিক মত কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবারও তো লোকজন পাওয়া যাচ্ছে না ধারে কাছে! এতক্ষণে—না জেলার, না ডেপুটি জেলার,—না কোন ইউনিফরম পরা সিপাই,—কারো দর্শনলাভেও তো ধন্য হবার সুযোগ পেলাম না! যারা সব আশে পাশে ঘুরছে, —এদিক ওদিক ছুটছে,—তারা তো সব সাদা পোষাকের লোক,— চেহারায়, ভাবে ভঙ্গীতে—নিতান্তই তালেবর গোছের সব কন্‌ভিক্ট। কি আশ্চর্য! কয়েদীরাই গোটা জেলটা চালাচ্ছে নাকি! কর্তা-ব্যক্তিরা সব গেলেন কোথায়!—থাকেন কোন্‌খানে!—তা শেষপর্যন্ত দর্শন মিলল অবশ্য কর্তা ব্যক্তিদের,—জেলার এলেন,—যথারীতি দুঃখ প্রকাশ করলেন, হেড্‌ জমাদার এলেন,—সেপাহি সান্ত্রী এলেন, —কিন্তু তখন রাত প্রায় একটা,—ইংরেজী মতে পরের দিন। যাই হোক,—শেষ পর্যন্ত রাত দুটো নাগাদ আমরা নির্দিষ্ট আস্তানায় এসে উঠতে পারলাম। অনেক অন্ধকার পথ পার হয়ে,—অনেকক্ষণ ঝড়ে জলে ভিজে,—অনেকবার হোঁচট খেতে খেতে উঠলাম এসে এই স্পেসাল্‌ ওয়ার্ডে,—জেলের ভাষায়—'গোরা ডিগ্রীতে,'—আর সাধারণ্যে প্রচলিত পরিভাষায়—ভি, আই, পি, ওয়ার্ডে। রাত আড়াইটের সময়—দুখানা জেলি মাখানো টোষ্ট আর একটা ডিমের অমলেট খেয়ে নির্দিষ্ট সেলের বিছানায় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম।—বাইরে থেকে লোহার গরাদ চাবি লাগিয়ে বন্ধ ক'রে দিল কে এক সেপাই।—আর সেই সবেরই অনিবার্য পরিণাম হিসেবেই —বুঝতে পারছ—আজকের এই নতুন প্রভাত,—পরিবেশ নতুনতর!…

…ঘুম তো ভেঙ্গে গেছে,—চারিদিক বেশ ফর্সাও হয়েছে,—তবুও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করলনা। একে তো রাতে ঘুম তেমন হয়নি,—ঘুমোবার সময়ও তেমন মেলেনি,—আর তাতেই একটা আলস্য আলস্য ভাব ছিল;—তার ওপর লক্-আপ্‌ তখনও খোলেনি, —তাই বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোবারও উপায় নেই। তাছাড়া—,

আজ কিসেরই বা এত তাড়া,—যে সাতসকালে তাড়াহুড়ো করতে বসব! আজ পাশে তুমি নেই। তাই ঘুম থেকে ডেকে তোলবারও তো কেউ নেই। উঠতে দেরী হলে—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শারীরিক কুশল প্রশ্ন করবার মত তো কোন সঙ্গীনীও নেই! 'বেড্‌টি' দিয়ে প্রভাতী আপ্যায়নেরও কোন ব্যবস্থা নেই। আজ নেই কোন্ অনুগত অবলাজীবও—সাত সকালে জান্তব আদরে আদরে অতিষ্ঠ ক'রে ঘুম থেকে তুলে দেবার জন্য! না, না,—প্রাত্যহিক জীবনের কোন কিছুই আজ আর এখানে বর্তমান নেই। প্রাতঃস্নান নেই,—বোধ হয় প্রাতরাশও নেই, সাত সকালে স্কুল কলেজে ছোটবার প্রশ্ন নেই। না, না,—আজ সে সব কিছু নেই!—আজকের শয্যাশ্রয়ের সময় তাই তেমন সীমিত নয়,—কালগতিও গজেন্দ্রগমন।…

কিন্তু, কি আশ্চর্য দেখ,—আপাতত যা সাথে নেই,—এমন কি নিকট ভবিষ্যতেও যার সঙ্গ পাবার সম্ভাবনারও নিশ্চয়তা নেই,—তার সম্বন্ধেই আজ অধিকতর সচেতন হয় মন। উতলা হয় মন তার সান্নিধ্য লাভের আশায়। অধিকন্তু, প্রাত্যহিক সাক্ষাতে যা হয়তো দৃষ্টিও এড়িয়ে যায়—অদর্শনে তাইই কেমন মনে মনে সবটুকু দৃষ্টি কেড়ে নেয়। জীবনের গতানুগতিকতায় যাকে নিতান্তই একটা সাধারণ পাওনা আদায় বলে মনে হয়,—সে যে প্রকৃতপক্ষে একটি অসাধারণ অনুগ্রহ ও অসামান্য দানকর্মই,—এমনি বিচ্ছেদের পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক না হলে বোধ করি মন ঠিক তা তেমন করে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বিচ্ছেদের পারমণ্ডল কেবল মাত্র স্মৃতিচারণের সহস্র দুয়ারকেই উন্মুক্ত করে দেয়না,—আকুলতার অর্গলমুক্তি ঘটায় না,—বিগলিত করুণার ও মহত্তর মূল্যায়ণের গোমুখীকেও উদঘাটিত করে।…তাই বোধ করি—মুখোমুখি দণ্ডায়মান রূঢ়বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে,—বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার অপরিহার্য ও আসন্ন প্রশ্নকেও পাশ কাটিয়ে—আমার মন—ডুবে থাকতে চাইল সেই সব 'মানুষ ও প্রাণীর' কথা ও কাহিনীর মধ্যে,—বর্ণাঢ্য ক'রে

আঁকতে লাগল সেই সমস্ত দৃশ্য দৃশ্যান্তরকে—যা বস্তুতঃ গতকালের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত একান্তভাবে প্রত্যক্ষ ও সত্য ছিল, সদা সমুপস্থিত ছিল,—বড় প্রিয় ছিল,—কিন্তু কার্যতঃ আজকের এই পরিবর্তিত প্রভাতে, নয়নসম্মুখে প্রসারিত প্রেসিডেন্সী জেলের এই বদ্ধ সেলে, —এই মশারীর ঘেরাটোপ ঢাকা সংকীর্ণ শয্যায় একান্তভাবেই অনুপস্থিত।—অসম্ভবও।…

অকস্মাৎ চাবি-তালার ঝনংকার শব্দে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শিয়রের দিকে ফিরে দেখলাম,—একজন মুরুব্বি গোছের সেপাহি লক্ আপ্ খুলে একতাড়া বিরাটাকার চাবি হাতে ঝুলিয়ে—আমার সেলের সামনে এসে ভেতরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছে। বোধ করি পরখ করে নিচ্ছে,—লক্ আপ্ তো খুললাম,—ভেতরের মানুষটা আছে তো ঠিক।…

তা মশারীর মধ্যে চোখ চালিয়ে না হক্ আর বাড়তি কষ্ট করে কেন্ বেচারী,—শয্যা ত্যাগ করে ঘরের ভেতরে দাঁড়ালাম,—ক্যা দেখ্তা হ্যায় সেপাহিজী?

নেহি নেহি বাবুজী,—দেখনেকা ক্যা হ্যায়!—নমস্তে বাবুজী,—ম্যায় তো স্রেফ্ রুটিন্ কাম কররহাহু,—লক্ আপ্ খুলনাহি মেরা কাম হ্যায়জী…এক কেতাদুরস্ত স্যালুট ঠুকে—কেমন বোকা বোকা হাসি হাসতে হাসতে লোকটা চলে গেল।…

টেবিলের ওপর থেকে রিষ্টওয়াচ্‌টা তুলে নিয়ে সময় দেখলাম, —সাড়ে পাঁচটা। দম্ দিয়ে ঘড়িটা বাঁ কব্জিতে বাঁধতে বাঁধতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সদ্য সেলমুক্ত প্রতিবেশী বন্ধুরা শুভেচ্ছা জানালেন—সুপ্রভাত।—আমিও বললাম—সুপ্রভাত। তারপর মামুলী কিছু কুশল প্রশ্নাদির পর যে যাঁর প্রয়োজনীয় কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম।…

গতরাত্রিতে বিশেষ কিছুই ঠাহর করতে পারিনি। একে তো

গোটা অঞ্চলটাই প্রায় অন্ধকার ছিল,—সঙ্গে ছিল জোর দমকা হাওয়া আর ঝির ঝিরে বৃষ্টি,—তার ওপর শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদও কম ছিল না। তাই আস্তানাটা কেমন,—তার আশপাশটা কি ধরণের,—এসব কথা তেমন মনেই আসেনি সে সময়। কিন্তু আজকের এই প্রভাত-আলোকে যা প্রত্যক্ষ করলাম—তা তেমন হতাশাজনক তো নয়ই,—বরঞ্চ একদিক থেকে বেশ প্রীতিপ্রদই।

বেশ চওড়া—এবং অনেকখানি লম্বা বারান্দার কোল ঘেঁষে—উঁচু পাঁচিল ঘেরা এক বাগান। সেখানে নানান রকমের ফুলের গাছ,—আর তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ রং বেরঙের সব ফুল। বারান্দাটার ঠিক সামনেই—ডানহাতি এক প্রকাণ্ড স্বর্ণচাঁপার গাছ,—তাতে অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে। আর তার পাশেই—অনেকগুলো গোলাপ গাছ, কয়েকটা বেলফুলের গাছ, তার পাশে একেবারে বারান্দার গা ঘেঁষে রকম-বেরমের পাতা বাহারের ঝাড়। তবে অমন পাতা-বাহারের ঝাড় যে কেবল ওই একদিকেই আছে,—তা নয়। ওগাছ আছে—আশে-পাশের আরও অনেক জায়গায়। যেমন গোলাপ গাছ আছে প্রায় সারা বাগানটা জুড়েই। গোটা চারেক কামিনী ফুলের গাছ,—দু'দুটো বড় গন্ধরাজের গাছ,—আর বারান্দায় ওঠবার সদর সিঁড়ির কাছেই আছে—এক বিস্তীর্ণ কাঁটালিচাঁপার গাছ। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে সেখান থেকে। আর ওই সিঁড়ির দুপাশে—ঠিক যেন গেট সাজাবার মত করে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া নাতি দীর্ঘ আশ্চর্য গাছ। ঠিক পাতা বাহারের গাছ নয়,—ফুলের তো নয়ই,—আবার ক্যাক্‌সটাস্‌ জাতীয়ও নয়,—ঘোর সবুজ রংএর ছড়ানো ছড়ানো কাঠি-কাঠি গোছের গাছ। আবার এই সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে—পাঁচিল ঘেরা এই গোরাডিগ্রির বাইরে বেরোবার দরজা পর্যন্ত গিয়ে—আবার পেছন ফিরে সোজা রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে এবং সেখান থেকে পিছু হেঁটে আবার ডাইনে মোড় ফিরে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে আবার কিছুটা পেছনে

ঘুরে ডানদিক থেকে সোজা খানিকটা এসে—পরিশেষে আবার সেই মূল সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পথে এসে মিশেছে যে সান বাঁধানো সরু মতন রাস্তাটা,—তার দু'পাশে রয়েছে সারি সারি রজনীগন্ধার ঝাড়, আর বড় বড় ফুলে অবনত অসংখ্য সূর্যমুখীর গাছ। আর ওই রাস্তার আবেষ্টনীর মধ্যে প্রায় চতুষ্কোণ গোছের যে জমিটুকু রয়েছে,—তাতে রয়েছে অনেকগুলো গোলাপ গাছ,—আর প্রায় মধ্যস্থলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দর ছোটখাটো ঝাউগাছ। এছাড়া—দু'দুটো হাসনাহানার ঝাড় আছে,—গোলক-চাঁপার গাছ আছে,—অপরাজিতা আছে,—কি নেই ?'—মায় শিউলী ও বাদ পড়েনি।···

তা কেবল ফুলের গাছই যে রয়েছে বাগানটায়,— তা নয়। ফলের গাছও আছে দুয়েকটা। সামনেই পাঁচিলের গা ঘেষে —ডালপালা বিস্তার ক'রে দাড়িয়ে থাকা পেয়ারা গাছটার দিকেই প্রথমে দৃষ্টি পড়ল। তা শুধু পাকা ডাঁসা—অসংখ্য নধর নধর পেয়ারার জন্যই নয় অমন,—বেশী ক'রে নজর পড়ল—ওই ফলাহারে ব্যস্ত এক ঝাঁক ঝকঝকে টিয়াপাখীর জন্য। এক পেয়ারা থেকে আর এক পেয়ারায়,—এডাল থেকে ওডালে, ওপর থেকে নীচে,—মুহুর্মুহু স্থান পরিবর্তন ক'রে,—ডানা ঝাপটে,—টিট্টি টিট্টি শব্দে চারিদিকে কলরোল তুলে,—তারা এমন এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে—কোন কলকাতাবাসীর পক্ষে অন্ততঃ তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই টিয়াপাখীর রূপেই কি বেশীক্ষণ আকৃষ্ট হয়ে থাকবার উপায় আছে—এখানে। একটা অত্যন্ত সুন্দর —হলদে পাখী আবার কোত্থেকে যেন উড়ে এসে বসল,—ওই পেয়ারা গাছের পাশেই,—ওই পাঁচিল ঘেঁষেই,—এক ছোট্ট আমগাছে। একেবারেই ফলশূণ্য সে গাছ,—ঠিক কোন্ আমের গাছ—তা বুঝতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে—ওই হলদে পাখীটাকে দেখলাম।—তাই আমগাছটাও নজর এড়াল না। রান্নাঘরের গা

ঘেঁষে—একটা গোলক চাঁপা গাছের পাশ বরাবর আরও একটা ছোট আম গাছও আছে অবশ্য,—কিন্তু একটা পরমস্ত ঝিঙ্গে গাছের পাল্লায় পড়ে সে বেচারা প্রায় পয়মল হয়ে বসে আছে। অকস্মাৎ—এমন সময় কোয়াক্, কোয়াক্,—ক'রে বিকট চীৎকারে অনেকগুলো পাখী যেন বাঁদিকের কোথা থেকে ডেকে উঠল। প্রথমটায় ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নেমে দু'পা এগিয়ে যেতেই চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁ দিকে—দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির ঠিক পাশ বরাবর একটি বিরাটাকার আম গাছ,—আর তারই শাখা প্রশাখায়—অসংখ্য বক বসে রয়েছে। বেশ এক বিচিত্র দর্শনই বকগুলো। সারা শরীরটা সাদাটে ধরণের,—পিঠের ওপর এক চিলতে কালচে মতন রং,—মাথায় বেশ একটা ঝুঁটি।—এমনিতে তেমন বোঝা যায়না,—কিন্তু গলাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিলেই ঝুঁটিটা পরিষ্কার দেখা যায়। তা শুধু ওই আমগাছেই যে ওদের আস্তানা, তা নয়।—ওই আমগাছের কাছাকাছি চারটে উঁচু উঁচু পাম গাছেও ওরা বেশ ঘর দোর বেঁধে ফেলেছে বলে মনে হলো। এমন কি—এই অঙ্গনের পাঁচিলের বাইরেও যতদূর চোখ যায়—সর্বত্রই—আম গাছে, তেঁতুল গাছে,—অশথবৃক্ষে—সর্বত্রই ওই-বকালয়। অন্যান্য আরও অনেক ছোট বড় পাখীও অবশ্য রয়েছে পাশাপাশি।···

বাড়ীর পেছনের দিকেও অনেকটা জায়গা রয়েছে। সামনের দিকের মতন অমন সাজানো গোছানো নাহ'লেও—নিছক অনাদরে উপেক্ষিত জমিও নয় সেটা। সেখানেও গোলকচাঁপা ফুলের গাছ আছে,—পেয়ারা, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের গাছও আছে। কুমড়ো গাছকে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা যায় ঠিক জানিনা, কারণ, ওর ফুল ফল দুটোই তো বেশ কাজে লাগে,—তা সেও আছে,—অনেক খানি জায়গা জুড়ে এঁকে বেঁকে,—লতিয়ে লতিয়ে একটা বরবটি গাছও গোলকচাঁপা গাছটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেশ বাড় বাড়ন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা ঢেড়স গাছ,—কিছু লঙ্কাগাছ, লাল শাক,—

এসবও আছে। আর পেছনের পাঁচিলের কাছ বরাবর এক জায়গায় বেশ কিছু আখের গাছও বেশ দাপটের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা থেকে থেকে বাতাসে হেলছে, দুলছে।···

মোটের ওপর—নেহাৎ জেল, নইলে এমনিতে বেশ পছন্দসই পরিবেশই। তাছাড়া—ভিন্ন ভিন্ন যে সব বন্ধুরা বিভিন্ন সময়ে এই কানন সৃষ্টির কারিগর হিসেবে কাজ করেছিলেন—তাঁরা সবাই নিতান্তই এক পেশে কাজ করবার মত অবিচক্ষণ ছিলেন না। নয়নানন্দও সৃষ্টি করেছেন, আবার রসনানন্দেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রয়োজনের সাধ আর অপ্রয়োজনের সাধনার যুগপৎ স্বাক্ষর রেখেছেন।—সত্যিই তাঁদের তারিফ না ক'রে উপায় নেই।···

কিন্তু সেই সব অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুদের কথা বেশী ক'রে ভাববার মত সময় নয় তখন। বেশীক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার মত কালও নয়।—একেতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কর্মই তখনও বাকী,—তার ওপর প্রথম দিন,—এমনিতেই গোছগাছ,—খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিব জন্যও কিছু তদারক করবার প্রয়োজন আছে। সাময়িক হলেও বস্তুতঃ একটা সংসারপাতার মতনই ব্যাপার তো। যদিও ওসব ঝামেলায় এ অভাজনকে অহেতুক জড়াবার কথা কেউ ভাবেন নি,—কিছুক্ষণের মধ্যেই এ অচল অধমকে ঠিক চিনে ফেলেন তো সবাই,—তাই অশোকবাবুরাই সব ক'রে কম্মে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। তবুও সেই যাকে ব'লে ছুটো খেয়েও উপকার করার জন্যও তো কিছু প্রস্তুতি দরকার। তা—ও ভোজন জাতীয় ব্যাপারটা যদিও দূরস্ত তখন,—তবে ওই প্রাতরাশনামক বস্তুটির জন্য আর বেশী বিলম্ব ক'রা চলে না,—আর তার জন্য প্রস্তুত হতে গেলে প্রাসঙ্গিক কিছু কাজকর্ম সেরে নিতে হয়,—স্নানাদি সম্পন্ন করলে ভাল হয়। জানোই তো প্রাত্যহিক অভ্যাসও তাই। অতএব—তোয়ালে সাবান প্রভৃতি নিয়ে চলো মন,—যথাস্থানে কর গমন······

দুই

জেলের প্রথম দিনের সকাল, সবটা মিলিয়ে যেন একটা দরবার। আমরা কটি প্রাণীকে ঘিরে সর্বক্ষণ শুধু মানুষেরই বৃত্ত। একের পর এক। মুহুর্মুহু। নব নব। বিচিত্র। প্রাতরাশ সমাপ্ত করতে না করতেই আনাগোনা সুরু হয়ে গেছে মানুষের। জেলেরই বাসিন্দা সব। প্রথমেই এলেন তিন নম্বর ওয়ার্ডের সি পি এম ফাইলের যুবক বন্ধুরা। আর সেটা প্রত্যাশিতও। কারণ, গতরাত্রে জেলের মধ্যে ঢোকার মুহূর্ত থেকে সেই প্রায় শেষ রাতে এই গোরা ডিগ্রিতে এসে পৌছানো পর্যন্ত ওই বন্ধুরাই সর্বক্ষণ আমাদের সাথী ছিলেন। বড় প্রয়োজনের সময়ে ওঁরাই ওঁদের ওয়ার্ড থেকে চা বিস্কুট নিয়ে এসে আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। আজকের সকালে সর্বাগ্রে তাঁরাই যে আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসবেন,—সেটা যেন এক রকম জানাই ছিল আমাদের। আনন্দ হলো ওঁদের দেখে।

কথায় কথায় খবর পাওয়া গেল সব। জনা বাহান্ন এখন আছেন ওঁদের ফাইলে। কেউ মিসায় বন্দী,—কেউ বা ইউ, টি, অর্থাৎ আন্ডার ট্রায়াল,—মানে বিচারাধীন কয়েদী। আর আছেনও সব অনেক কাল। দু'আড়াই বছরও কেটে গেছে অনেকের। তা ওই অনেকদিন আর অতগুলি মানুষ একসঙ্গে থাকতে থাকতে—নিজেদের মত সব ব্যবস্থা বন্দোবস্তও ক'রে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু যে যেমনই থাকুন এখানে,—মন স্বভাবতই পড়ে আছে বাইরে। সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে, তারই জন্য যত উদ্বেগ। এই এমনভাবে এতদিন ধ'রে কারাবাসটাই সার হবে শুধু?—না,

কায়া ধরবে তাঁদের কামনা ?—তাঁদের আদর্শ ?—মনে মনে বোধ হয় সর্বক্ষণই ওই চিন্তা,—বন্দীজীবনের ওই-ই সান্ত্বনা।

আর ওই চিন্তাতেই ভয় ক'রে বোধ হয় ওঁদের সেই ক'জন কাল অতক্ষণ ধ'রে আমাদের সান্নিধ্য চেয়েছিলেন,—সান্নিধ্য সাহায্য আমাদেরও দিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন,—এই তো সুরু হয়ে গেছে। এবার। প্রথমে এঁরা ক'জন এলেন,—এবার আসবেন সব একে একে,—দলে দলে,—কাতারে কাতারে। আসবেন তাঁদের নেতারাও,—সহকর্মী কমরেডরাও। এবার উদ্বেল হয়ে উঠবে পশ্চিমবাংলা,—তাই কলরব জাগবে এই কয়েদখানাতেও।...

মনের উৎকণ্ঠা প্রকাশও ক'রে ফেললেন কেউ কেউ,—আচ্ছা, জ্যোতিবাবুকে কি গ্রেপ্তার করেছে ? ওঁরা কি করছেন এ সময় ?—'অপরচুন মোমেন্ট' তো ? নিশ্চয়ই ওঁরা মুভমেন্ট্ শুরু করবেন এখন ?...

আমাদের ঠিক জানা ছিল না ব্যাপারটা,—তবুও অনুমানের আকারেই দু' একটা কথা বললাম।...

এটা, সেটা,—আরও পাঁচটা কথা ব'লে ওঁরা বিদায় নিলেন।

ওঁরা অদৃশ্য হয়ে যেতে না যেতেই প্রবেশ করলেন—সর্বশ্রী জঙ্গল সাঁওতাল, সাধন সরকার, নিমাই ঘোষ প্রভৃতি প্রখ্যাত নকশাল নায়কেরা।...

সাধারণ আলাপ পরিচয়াদির পর দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু কথাবার্তা উঠল। কিছু প্রাসঙ্গিক সংবাদাদির আদান প্রদানও হলো। তবে—নিতান্তই সৌজন্যমূলক সম্মেলন তো, তাই গুরুতর কোন তাত্ত্বিক আলোচনার আশ্রয় নিলেন না কেউ-ই। না ওঁরা, না আমরা। আর তাতে ক'রেই বোধ হয় আসরটি বেশ জমাটি হয়ে উঠল। মোটের ওপর—বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই কেটে গেল অনেকখানি সময়। নমস্কারাদি

বিনিময়ের পর—এক সময় ওঁরা বিদায় নিলেন। সাদর আহ্বান জানিয়ে গেলেন ওঁদের আস্তানায় একদিন যাবার জন্য।...

এর পর দফায় দফায় আরও কিছু দল এলেন। কাঁরা তাঁরা,—ঠিক বুঝলাম না। কোন্ কোন্ দলের কর্মী তাঁরা,—বা আদৌ কোন দলভুক্ত কিনা,—তা জানতে পারলাম না। এমনকি জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। একজন কেবল্ বললেন,—নকশাল বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,—যদিও তিনি তা নন।

তা যে যা থাকেন থাকুন,—আমাদের আপাততঃ তা নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের সঙ্গে যে এঁরা সবাই দেখা করতে এসেছেন,—জেলের মধ্যে যে এতগুলি মানুষের সাহচর্য পাচ্ছি,—দু'দণ্ড কথাবার্তা ব'লে সময়টা ভালভাবে কাটছে,—এইটেই তো বড় কথা। আর আছিই যখন কিছুদিন,—ধীরে ধীরে পরিচয়াদি তো হবেই,—ব্যস্ততা কী!

কিন্তু রাজনৈতিক লোক ব'লে নিজেদের পরিচয় না দিলেও—রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়েই অবশ্য তাঁদের যত ব্যাকুলতা।—ওই সম্বন্ধেই যত প্রশ্নাদি।...

বিশেষ—জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে—দেশের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে?—জনমানসে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে? এত কাণ্ডের প'রেও পশ্চিমবাংলার মানুষ কী নীরব দর্শকই হয়ে থাকবে? প্রতিবাদে গর্জে উঠবে না? প্রতিরোধে প্রস্তুত হবে না?—আর ওই অষ্টবামেরাই কি এখনও চুপ ক'রে বসে থাকবেন? সবাই এক জোট হবেন না লড়াইয়ের ময়দানে? এমনি অপঘাতের দিনেও? ইত্যাদি, ইত্যাদি।—প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্নের প্রস্রবনই যেন।...

তা প্রশ্ন ওঁদের অসংখ্য হলেও,—উত্তরের পুঁজি আমাদের অফুরন্ত নয়। প্রথম আক্রমণের শিকার আমরা,—আকস্মিকতার ঘোরে কিঞ্চিৎ হতচকিতও,—তাই একরকম চক্ষু কর্ণাদির সহযোগিতা ছাড়াই—আশার কল্পলোক মতনই গ'ড়ে তুলতে হচ্ছিল। তাছাড়া,

নানান দলের মানুষ এক সঙ্গে,—রয়ে সয়ে,—ভেবে চিন্তে,—একটু একটু করেই আঁকতে হচ্ছিল ছবিটা। আর তাতে ক'রে—একটু ক্লেশ মতনও যে অনুভব না করছিলাম—তা নয়।

তবে ওই ক্লেশের মাঝখানে একরকম পরিত্রাতা হিসেবেই একসময় আবির্ভূত হলেন শ্রীমান পঙ্কজ বন্দোপাধ্যায়, জেলের স্টোর কিপার।...

যথারীতি নমস্কারাদির পর—পঙ্কজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের কি কি জিনিষ দরকার বলুন? এ অধীনের ওপরই সে সব সরবরাহ করবার ভারতো,—তাই...

তা চাইতো আমাদের অনেক বস্তুই। একে তো প্রথম দিন। তারপর অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থাতেই আটক হয়েছি। দরকারী জিনিষপত্তরতো তেমন কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তাই অন্তত কয়েকটা জিনিষ তো সত্ত সত্ত না মিললেই নয়। কিন্তু—তার কি কিই বা ওই পঙ্কজবাবুর ভাঁড়ার থেকে মিলবে,—আর কোন্ কোন্ বস্তুর যোগান বাড়ী থেকে করাতে হবে,—পূর্বাহ্নে তার একটা হদিশ পাওয়া দরকার। তা মনের কথাটা ব্যক্তই করে ফেললাম।...

পঙ্কজবাবু কিন্তু তেমন সোজা সড়কে হাঁটলেন না,—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা দুই একটা কথা কোন মতে উচ্চারণ করলেন—তার মর্মার্থ ঠিক তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। মানে জেলেরই ষ্টোর তো,—চোর ছেঁচড়ের জায়গা, তার ওপর তেমন নজরও দেননা কর্তাব্যক্তিরা। তিনি তো ব'লে ব'লে হয়রান,—কিন্তু কান দিচ্ছে কোন মহাজন! ফলে ভাঁড়ারে থাকবার মত বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে—আমাদের মত ব্যক্তিদের তো আর কষ্ট দেখতে পারবেন না তিনি,—যেমন ক'রেই হোক—যোগাড় যন্তর ক'রেই দেবেন কিছু কিছু...

অশোককৃষ্ণ দত্ত মশাই এটর্নী মানুষ,—চট্ করে সময়মত ঠিক কাজের কথাটি পাড়তে পারেন। পাড়লেনও,—আমাদের কি কি প্রাপ্য পঙ্কজবাবু?

পঙ্কজবাবু এটর্নিতো দূরের কথা,—ও এলাকাতেও বোধ করি পা বাড়াননি কোনদিন,—কিন্তু জেলের ষ্টোর কিপার,—তাই অমন সরল প্রশ্নেরও ঘোরালো উত্তর দিলেন,—আগের চাইতে অনেক বেশী সুবিধে দেবার ব্যবস্থাই হয়েছে স্যার…

অশোকবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। জিজ্ঞাসা করলেন,—তা আগে কি কি সুবিধে ছিল পঙ্কজবাবু?

একটু বোধ হয় ভাবলেন ভদ্রলোক—একবার মাথাটা চুলকেও নিলেন,—তারপর অনায়াসে বললেন,—তা তো ঠিক জানিনা স্যার।

জানেন না?—আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না,—বললাম তাহলে অজান্তে কোন বাড়তি বস্তু চেয়ে তো আপনাকে বিপাকে ফেলতে পারি পঙ্কজবাবু! তার চাইতে আগে গিয়ে সব জেনে শুনে আসুন তো,—তারপর নির্ঝঞ্ঝাটে বলা যাবে সব একে একে…

তা এর পর চলেই যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক,—বোধ হয় সব জেনে শুনে আসতেই যাচ্ছিলেন,—কিন্তু অকস্মাৎ সুশীল ধাড়া মশাই বাধা দিলেন,—দাঁড়ান…

সুশীলদা সাবধানী মানুষ,—বিশেষ অভিজ্ঞও,—বোধ হয় শঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে—মাথা গরম মানুষ দুটো তো লোকটাকে নাহক্ ভাগালে,—কিন্তু শ্রীমান পঙ্কজ একবার অন্তর্ধান করলে আবার কখন—আবির্ভূত হবে—তার কি কোন ঠিক আছে! অথচ কিছু কিছু জিনিষ তো এখুনিই দরকার!—তাই ভদ্রলোককে দাঁড়াতে ব'লে তিনি দস্তুরমত 'লিষ্ট' লেখবার জন্য কাগজ কলম নিয়ে বসলেন,—মাথা পিছু একটি ক'রে বড় মগ, কাঁচের গেলাশ, ছোট একটা বড় একটা, জলের কুঁজো, তার ঢাকনি,—কাঁচের বড় প্লেট, বাটি ইত্যাদি,—আরও একটা ক'রে বিছানার চাদর, বালিশ, বালিশের ওয়াড়,—ঘরে ঘরে একটা ক'রে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি…

পঙ্কজবাবু লিষ্টের দিকে চোখ রেখে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে

বলতে,—বোধ কার তালিকাটাই আওড়াতে আওড়াতে নিদ্রা হলেন।···

তা ওই পঙ্কজবাবুকে দিয়েই বোধ করি—সরকারী সফরসূচি আরম্ভ হল।—কারণ—এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে জেল কর্তৃপক্ষরাই একেএকে আসতে লাগলেন সব।

এলেন শ্রীমান গোপাল মিশ্র। আটক ব্যক্তিদের কার কি চাই না চাই—এই সব বৃত্তান্ত নেওয়া আর সেগুলো কিনেকেটে যথাহস্তে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর কাজ। খাতা খুলে—আমাদের কার কি চাই—নামে নামে তার লিষ্ট লিখতে বসলেন ভদ্রলোক।···

আমরা উচ্চতম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী। জেলে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে আশিটাকার তুল্যমূল্য বস্তু কেনবার অধিকার আমাদের। ভাই—ধুতী, লুঙ্গী, টর্চ, গেঞ্জী, দাতের মাজন, সাবা ইত্যাদির অর্ডার দিতে লাগলাম সকলে। গোপাল মিশ্রও নিষ্ঠ সহকারে সব লিখেটিকে নিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। যাবার আগে অবশ্য সংবাদপত্রের চাহিদার কথাও জানতে চাইলেন।···

তা ওই আশি টাকার এককালীন অনুদান ছাড়াও দৈনিক দু'টাকা হারে একটা হাত খরচারও ব্যবস্থা আছে আমাদের জন্য তার থেকেই মাথা পিছু একখানা ক'রে কাগজের অর্ডার দেওয় হলো। একই সঙ্গে ছ'জন একই জায়গায় আছি,—তাই প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাগজের চাহিদা জানালাম। ফলে ছ'খানা আলাদা কাগজের আবাহনের ব্যবস্থাই হলো একসঙ্গে।

শ্রীমান গোপাল অদৃশ্য হতে না হতেই—ছোটখাটো এক পুলিশ বাহিনী মতনই দৃষ্টি গোচর হলো। লোকলস্কর সঙ্গে ক'রে এলেন—জেল সুপার শ্রী কে, এস, মোক্তান এবং জেলার শ্রী কম ব্যানার্জি।

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর—প্রথমেই ওঁরা গত রাত্রের দুঃখজনক ঘটনার জন্য মার্জনা চাইলেন এবং পূর্বাহ্নে ঠিক মত খবর না পাওয়

জন্যই—এবং ওই সময়ে অপরিহার্য কারণে ওঁদের কেউ জেলে না থাকবার জন্যই যে আমাদের অমন দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে অতক্ষণ,—সে কথাও জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্ভবপর সকল সুযোগ সুবিধের দিকে যে এখন থেকে ওঁদের সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি থাকবে—এ কথা বলতেও ভুললেন না।

সুপার মিঃ মোক্তান দার্জিলিংবাসী নেপালী। বেঁটে স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। বয়সও বেশী নয়। যুবা পুরুষই বলা চলে। পোষাকে ব্যবহারে বেশ অভিজাত গোছের। খাসা বাংলা বলেন ভদ্রলোক। জেলার শ্রী ব্যানার্জি তো খাঁটি বঙ্গ সন্তানই। গতরাত্রে তেমন নজর করিনি। এখন দেখলাম,—বেশ গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। এর বয়স আরও কম।…

তা ওঁরা দুজন এ জেলের একরকম সেই 'হর্তা কর্তা বিধাতা'। তাই—হোক স্পেশাল,—তবুও এক ওয়ার্ডে বেশীক্ষণ ব'সে থাকলে ওঁদের চলে না। আরও অনেক ওয়ার্ড আছে। তাছাড়া হরেক-রকম কাজকর্মও আছে। তাই—অমায়িক ব্যবহারে, বিনয়ী—কথাবার্তায় কিছুটা সময় কাটিয়ে—একসময় ওরা বিদায় নিলেন।

কিন্তু ওই যে বলেছি সরকারী সফরসূচী। তাই ওঁরা গেলেন তো ডাক্তারবাবুরা এলেন। এলেন—সি, এম, ও, অর্থাৎ চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ সামন্ত, ডাঃ মণ্ডল ওরফে ডঃ রয়, ডাঃ চ্যাটার্জী, আর তাঁদের কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ। এলো ওজন নেবার যন্ত্র,—প্রেসার মাপবার যন্ত্র ইত্যাদি।

সৌজন্যমূলক আলাপ আলোচনার পর,—একে একে আমাদের ওজন নেওয়া হলো। প্রেসার দেখা হলো। তা ও দুটোতেই সেই যাকে বলে শিরোপা পেলাম আমি। ওজনেও প্রথম, প্রেসারেও সর্বোচ্চ।…

তা হোক,—ওর জন্য কোন উদ্বেগ ছিল না আমার। জানা জিনিষই তো,—তাই নতুন করে আর একবার জানায় মনের দিক

থেকে কোন নতুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল না। বরঞ্চ অন্যান্য ভাল ভাল পরীক্ষাতেও যখন শীর্ষস্থানই মিলল দেখলাম—তখন একটু আত্মপ্রসাদ মতনই বোধ করলাম। ডাক্তার বাবুরাও তারিফ করলেন।

তারপর—আমাদের দুই একজনের জন্য কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তারবাবুরাও বিদায় নিলেন—একসময়ে।…

এর পরে অবশ্য আর কারো শুভাগমনের সময় ছিল না। যাকে বলে মধ্যাহ্ন—তা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নতুন ক'রে কারো আর ঠিক দেখা সাক্ষাত করতে আসবার সময় নয় তখন। আমাদেরও আর ওসব ব্যাপারে মন সায় দিচ্ছিল না। জঠরানল—ঠিক দাউ দাউ করে না হলেও—ধিকি ধিকি জ্বলতে সুরু করেছিল। তাছাড়া—এ গোরা ডিগ্রির পূর্ব অধিবাসী যুবক বন্ধুরা,—যাঁরা আজকের মত আমাদের আহারাদির তাবৎ ব্যবস্থা সম্পাদনের দায়-দায়িত্ব অনুগ্রহ ক'রে নিজেদের স্কন্ধে নিয়েছেন,—তাঁরাও থালা সাজিয়ে ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছেন। মুখে কিছু না বললেও চোখের ভাষায় একরকম তাগিদ জানাচ্ছিলেন কিছুক্ষণ ধরে।

তা কোন দোষ দেওয়া যায় না ভায়াদের। প্রায় সকলেই কম বয়সী জোয়ান জোয়ান ছেলে। ক্ষিদেটা এমনিতেই একটু তড়িঘড়ি পায়,—পাবার কথাও। তার ওপর বেলাও হয়েছে অনেকখানি,—পেটের মধ্যে তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তাছাড়া,—আমরা না হয় সত্ত সত্ত এসেছি,—তাই 'অত্তই উদ্বোধন দিবস' গোছের আনুষ্ঠানিক মন ও দিলদরিয়া মেজাজ নিয়ে একরকম সেই দরবার মতনই চালিয়ে চলেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু ওদের তো আদৌ সে রকম কোন ব্যাপার নয়। বছর পাঁচেক তো কাটলই,—তার ওপর আরও কতকাল কাটবে—তারও কোন স্থিরতা নেই। তাও—কোন সাজাপত্তরে যে এমন মেয়াদ খাটছেন সব,—তা নয়। এখনও সেই ইউ, টি,—'আনডার ট্রায়েল প্রিজনার',—মাঝে মধ্যে কোর্টে

যাচ্ছেন,—মিনিট কয়েকের জন্য মামলা উঠছে কি উঠছে না,—উকীল বাবুরা দুয়েকটা কথা বলছেন কি বলছেন না,—ব্যস্, সেদিনের মত সেই—'খেল খতম্',—আর সরকারী বেসরকারী—উভয়পক্ষেরই বেশ কিছু 'পয়সা হজম'। তারপর—কোর্টে মামলার জন্য নতুন ডেট্, আর দিনের শেষে সেই অতি পরিচিত জেলের 'গেট'। বাস্—এই-ই চলেছে আজ এতকাল ধরে। চলবেও। অতএব—ওই কোর্ট কাচারির কারবারের মত খাওয়া শোওয়াটাও অনেকটা রুটিন ওয়ার্ক গোছেরই দাঁড়িয়ে গেছে।...

ভায়াদের তাই আর বাড়তি কষ্ট না দিয়ে ভাল ছেলের মত হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলাম।...

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সবে শয্যায় দেহকাণ্ডটা এলিয়ে দিয়েছি,—গরাদের সামনে এক যুবক এসে দাঁড়ালেন। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন,—ফরসা রং, জ্বলজ্বলে দুটি চোখ,—চওড়া কপাল, অনেকটা টাক মতন মাথাটায় লম্বা লম্বা একরাশ কোঁকড়ানো চুল। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। পরনে পায়জামা,—গায়ে পাঞ্জাবী। সবটা মিলিয়ে—কবি শিল্পী গোছের চেহারা।...

ভেতরে ডেকে বসালাম তাঁকে। নিজে থেকেই নাম বললেন—প্রণব মুখার্জী।...

মার্জিত রুচি—প্রাণ খোলা যুবক। ধীরে ধীরে অনেক কথাই বললেন। নিজের কথা,—জেলের ভেতরকার কথা। জেলের বাইরে দুই একজন উভয়ের পরিচিত ব্যক্তির কথাও।...

কথায় কথায় রাজনীতির কথাও উঠল। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বেশ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন প্রণব বাবু। সি, পি, এম প্রমুখ বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা সম্বন্ধেও বেশ কয়েকটি কড়া কড়া কথা বললেন। আর ওই কথাগুলি প্রসঙ্গে তিনি এক ধারাবাহিক বিশ্লেষণও উপস্থিত করলেন। সে বিশ্লেষণ একেবারে যে বিতর্কাতীত, তা অবশ্য নয়,—কিন্তু অনেকখানি

রাজনৈতিক চেতনা ও এক যুক্তিবাদী মনের পরিচয় যে তাতে ছিল —তাতে কোন সন্দেহ নেই।···

কথার মাঝখানে অবশ্য একবার এক বিশ্রী ব্যাঘাত ঘটালে এক ব্যক্তি। একটা লোহার হাতুড়ী মতন বস্তু দিয়ে লক্ আপের রেলিং-গুলোর ওপর একে একে বিকট আওয়াজ ক'রে গেল।—

কী ব্যাপার? প্রণববাবুই ব্যাখ্যা করলেন,—গরাদটা বহাল তবিয়তে আছে কিনা—তাই আওয়াজ করে বুঝে গেলো···

কি আশ্চর্য! অমন একবার গরাদ ঠেঙ্গিয়েই বুঝে নেবে লোকটা যে কারিকুরি ঘটেনি কিছু ওতে? ঘটায় নি কেউ?···

প্রণববাবু বললেন,—না, না, সে সব কিছু নয়,—আসলে রুটিন ওয়ার্ক,—জেলের সব কিছুই ওই রুটিন মাফিকই চালাতে হয়। হোক অহেতুক, তবুও। না চালালে—আর কিছু না হোক,—ন্যস্ত দায়িত্ব ব্যক্তিটির চাকরী যায়।···

যাই হোক,—বিরক্তিকর সেই ক্ষণিক বাধাটাকে অতিক্রম ক'রে আবার আমরা আলোচনায় বেশ মেতে উঠেছি যখন,—আগেকার মত না হলেও নতুন আর একটি বাধা এসে উপস্থিত হলো। একটি শীর্ণকায় সলজ্জ যুবক এসে ঘরে ঢুকলেন। পরিচয় দিলেন—নাম মধুসূদন পাল,—হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। আপাততঃ বছর খানেক এই জেলেরই অধিবাসী। নক্সাল সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন। থাকেন—পাশের নতুন ওয়ার্ডে। বললেন,—আমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ নিয়েই এখানে এসেছেন এখন।···

আনন্দেরই কথা,—তাই আপ্যায়ন ক'রে মধুসূদনবাবুকে পাশে বসালাম।

প্রণববাবু ও মধুসূদনবাবু—উভয়েই উভয়ের পরিচিত। প্রীতি-ভাজনও। তাই দু'জনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আলাপ আলোচনায় মাতলেন।—আর তাতে ক'রে—দিবানিদ্রার ক্ষীণ আশাটুকুও অন্তর্হিত

হলো বটে,—কিন্তু এমন অপরিচিত জেলখানার ক্লান্ত কিছু সময় বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল।···

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য আমাদের আলোচনায় ছেদ টানতে হলো। আমাদের আস্তানা সংক্রান্ত কিছু রদবদলের তাগিদেই ওটা করতে হলো।···

আমরা ছ'জন এখানে এসে পৌছোবার আগে যাঁরা এখানকার অধিবাসী হয়েছিলেন,—তাঁরা এখানে থাকবার এমনিতে ঠিক অধিকারী নন। খালিই পড়েছিল জায়গাটা, আর ওঁরাও জেলে আছেন অনেককাল,—তাই কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বোধ করি বেশ একটা রেপোর্ট মতন গড়েও উঠেছে,—অতএব—অধিকতর আরামের মৌখিক আবেদনটি অলিখিতভাবে মঞ্জুরও হয়েছে। ফলে—দিব্যি সব ছিলেন এতদিন। খাটা খাটুনিও করেছেন প্রচুর আবাসস্থলটিকে সব দিক থেকে যুৎসই করতে। ফুল বাগানের যত্ন করেছেন, নতুন নতুন গাছও বসিয়েছেন,—ঝিঙে, কুমড়ো, প্রভৃতি লাগিয়েছেন,—শাকের ক্ষেত করেছেন। খেটেছেন অনেক। জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও রেখেছেন।···

তবুও—ওই যে বললাম—ওঁরা ঠিক অধিকারী নন, তাই গতরাত্রে আচমকা আমরা এসে পড়ায়,—ওঁরা কিছুটা বিপাকেই পড়েছিলেন,—জেল কর্তৃপক্ষও বিব্রত বোধ করেছিলেন,—আর তার ফলে—আমরা অত রাত অবধি কষ্ট পেয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত—নীচের পাঁচখানা সেলে আমাদের ছ'জনের বাকী রাতটুকুর জন্য ব্যবস্থা ক'রে—ওঁদের সব ওপরের ঘরে চালান ক'রে—কর্তৃপক্ষ কোন মতে মুখ রক্ষা করেছিলেন। অত রাতে এত সব করতে ওঁদের সকলেরই নিশ্চয়ই অনেক ধকল পোয়াতে হয়েছে। কিন্তু সে ওই রাতটুকুর জন্যই। আজ থেকে—নতুন ওয়ার্ডেই ওঁদের আস্তানা নির্দিষ্ট হয়েছে। সকাল থেকেই সেখানে যাবার কথা। তবু—আমাদের খাইয়ে দাইয়ে সব গোছগাছ ক'রে নিতে নিতে প্রায়

বিকেল গড়িয়ে গেল। আর ওঁরা ছেড়ে গেলেন তো,—আমাদের গুছিয়ে বসবার কাজ এখন।

আমি আর অশোককৃষ্ণ দত্ত মশাই দোতলায় থাকবার সিদ্ধান্ত নিলাম।...

নীচের তলার মত ওপরেও পাঁচখানা ঘর।—জেলের পরিভাষায় 'সেল্'। তবে তার মধ্যে চারখানি ঘরই বন্দীদের থাকবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির বিপরীত দিকের কোনে অবস্থিত বাকী ঘরটি খালি রাখা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়,—তার মেঝেতে রং চঙে মোজাইক। চার দেওয়ালের নীচের কিছু অংশও তাই। আর দরজার সামনা সামনি—মাঝ দেওয়ালে টাঙ্গানো নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি ছবি। 'নেতাজীর' মত মিলিটারী ইউনিফরম পরা নয়,—সাদা পাঞ্জাবীর ওপর শাল জড়ানো সাবেকী সুভাষচন্দ্রের ছবি। উনিশ শ' চল্লিশ সালের দোসরা জুলাই থেকে পাঁচই ডিসেম্বর পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র এই জেলেই বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন। তাই—ওই ঘরটি আজ আর নতুন কোন বন্দাকে কয়েদ করবার সেল নয়,—কোটি কোটি ভারতবাসীর নিকট পবিত্র এক তীর্থস্থল। সেই কারণেই একদা সেই মহাজনের দ্বারা পূর্ণ ঘরটি—আজ জনশূণ্য ক'রে অমন সুদৃশ্য করে রাখা হয়েছে। ঘরের মধ্যে বিশেষ ধরনের টিউব আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নেতাজীর ঘরে মাথা ঠেকিয়ে—তার পরের পাশাপাশি দুটি ঘরে আমি আর অশোকবাবু নিজের নিজের টুকিটাকি জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিতে লাগলাম। ভলেন্টিয়াররা নীচে থেকে খাট বিছানা নিয়ে এসে আমাদের শয্যা প্রস্তুত করতে লাগল।...

এমন সময় নীচে থেকে হঠাৎ সোল্লাস চীৎকার শুনে—কি ব্যাপার জানবার জন্য নীচে নেমে গেলাম। দেখলাম—উল্লাস করবার মত ব্যাপারই বটে!—নতুন দু'জন আসামীর আবির্ভাব ঘটেছে। সোস্যালিষ্ট পার্টির—এ রাজ্যের সভাপতি শ্রীবিমান মিত্র ও সম্পাদক

শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য—উভয়েই যুগপৎ সরকারী অতিথি হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ—আমরা ছিলাম ছয়,—এবার আট হলাম। এমন অকস্মাৎ দল বৃদ্ধিতে তাই একটু উচ্ছল হয়ে উঠেছেন সবাই।

কিন্তু—আনন্দের মাঝখানেই—অশোককৃষ্ণ দত্ত মশাই একটা গুরুতর প্রশ্ন তুললেন,—ঘর তো আর একটাই অবশিষ্ট রইল এখন,—এর পরে তবে কি হবে?

অর্থাৎ—প্রথম ব্যাচের পর যখন দ্বিতীয় ব্যাচও এলো,—তখন তৃতীয়, চতুর্থ,—এই ভাবেই তো চলতে থাকবে—একে একে। তখন স্থান সঙ্কুলান হবে কি উপায়ে? তাছাড়া,—অশোকবাবু আবার বললেন,—প্রফুল্ল দা (অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়) এলে তো তাঁর জন্য একটা বিশেষ ঘরেরই ব্যবস্থা করতে হবে।—কি জানি,—হয়তো নেতাজীর ঘরখানাই ছেড়ে দেবে কর্তৃপক্ষ!···

তা এসব সমস্যা সত্যিই ওই জেল কর্তৃপক্ষের। কাকে ওঁরা কোথায় রাখবেন না রাখবেন, এবং কি ভাবেই বা রাখবেন,—এ নিয়ে ওঁদেরই মাথা ঘামাবার কথা। আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এ ব্যাপারে। তবুও-সেই নেই কাজ তো খই ভাজ—গোছের ছটফটানিতেই যেন মেতে উঠলাম আমরা। আসলে বোধ হয়—আরও নতুন নতুন আসাটাই চাইছিলাম আমরা। চাইছিলাম—আমরা অনেক হই চই। চাইছিলাম,—আসুক সব দলে দলে,—কাতারে কাতারে,—জেলখানা উপচে পড়ুক,—স্থানাভাব ঘটুক,—গ্রেপ্তারকারী কর্তা ব্যক্তিরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হোক্ ··

কিন্তু—হা হতোস্মি!—তখন কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলাম যে—নবাগমন তো দূরের কথা ও পূর্বে আগত কোন বন্ধুর সঙ্গেই কিছুক্ষণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে! অথচ—সেই অঘটনই ঘটল।···

জেলারের কাছ থেকে হঠাৎ এক চিরকুট এলো,—শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত 'ওয়ান্টেড্ ইন্ দি অফিস'।···

আমরা ভাবলাম,—হয়তো কেউ দেখা সাক্ষাত করতে এসেছেন। নিতান্তই তালেবর কোন ব্যক্তি,—তাই যথাবিধি না বলতে পারেন নি কর্তৃপক্ষ। আবার ভাবলাম,—সেরকম কিছু হয়তো নয়,—নিছক আমরা কটি প্রাণীর প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যাপারেই ডেকেছেন।

অশোকবাবু নিজেও বোধকরি অমনিধারা ভাবলেন। বললেন,—কি জানি, হয়তো প্রফুল্লদাই দেখা করতে এসেছেন। হোন্ আজ বিরোধীদলে,—তবুও এককালের মুখ্যমন্ত্রী তো বটেন্,—তাঁকে একেবারে গেট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া তো তেমন সহজ নয়,—তাই···

এমনিতে তৈরী মতন হয়েই ছিলেন অশোকবাবু। তাড়িঘড়ি পত্রবাহকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বাদে—অশোকবাবু যখন ফিরলেন—তখন আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কি ব্যাপার!—মুখ গম্ভীর! থমথমে! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম! চলনে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব!—হঠাৎ হলো কি ওঁর!—কি হতে পারে!···

তা একটু বাদেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। অশোকবাবুই ক'রে দিলেন। সুশীলদা'র ঘরে আমাদের সকলকে ডেকে তিনি যা বললেন—তার মর্মার্থ খুব সরল। অশোকবাবুর 'রিলিজ্‌ড্ অর্ডার' এসেছে। অতএব—জিনিষপত্তর গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে এক্ষুনি তাঁকে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তা যান,—মুক্তির আদেশ যখন এসেছে,—তখন নিশ্চয়ই যাবেন। যেতেই হবে। এমনিতে এটা আনন্দের সংবাদও। বন্ধুর কারামুক্তিতে খুশী হবারই কথা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি,—একটু হতাশ মতনই বোধ করলাম খবরটা শুনে।—কোথায় দলটা ভারী হবে,—তা না, এরই মধ্যে কমে গেলেন একজন! তাছাড়া, অল্প সময়ের জন্য হলেও—দুর্যোগের দিনে সহযাত্রী হিসেবে [illegible]

পাশাপাশি,—হঠাৎ তাঁর এমন বিদায় সংবাদে মনটা একটু ভারাক্রান্তও হয়ে উঠল।....

অশোকবাবু নিজেও বোধ করি বিষন্ন বোধ করলেন। বোধ হয় কিছু বিব্রতও। তাঁর কথাবার্তায়, আচারে ব্যবহারে,—এমনকি চলে যাবার সময়কার কিঞ্চিৎ স্খলিত পদক্ষেপের মধ্যেও—মুক্তির আনন্দের চাইতে একটা বিড়ম্বিত ভাবই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। —আর তাঁর সেই বিড়ম্বিত সত্বাকেই বোধ করি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেবার জন্যই এক সময় ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—মনে হয় আপনাদেরও সব অর্ডার এসে যাবে একে একে—

ধীরে ধীরে সামনের বাঁক পেরোতেই অশোকবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন।···

তাঁর এই আকস্মিক মুক্তিলাভকে কেন্দ্র ক'রে কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলল। তারপর এক সময় সে সব থিতিয়ে গেল। যে যার ঘরকন্না নিয়ে আবার মেতে উঠলেন।—ওদিকে দিনের আলোও তখন নিভু নিভু হয়ে এসেছে।···

আমারতো প্রয়োজনীয় গোছগাছ সম্পূর্ণই ছিল। ভলেনটিয়াররাই ক'রে কম্মে দিয়েছে সব। আর করবারই বা তেমন কি ছিল! ঘরের এক পাশে লোহার পাতের খাটের ওপর এক শয্যা বিছোনো,—এক কোণে এক কাঠের টেবিল স্থাপন করা, আর তার অপরিচ্ছন্ন উলঙ্গ দেহের ওপর খবরের কাগজের কিঞ্চিৎ আবরণ চাপানো,—আর তার ওপর—দাড়ি কামানোর সাজ সরঞ্জাম, দন্ত ধাবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী,—আয়না, সাবান, কলম প্রভৃতি—কয়েকটা টুকিটাকি বস্তুর সংস্থাপন,—ব্যাস্, আসল গোছ-গাছ তো এতেই সম্পূর্ণ। তাছাড়া, খাবার জলের মেটে কলসী, জল খাবার গেলাস,—প্রভৃতি আরও দুয়েকটা ছোটখাটো বস্তুরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায় মশারী টাঙ্গাবার দড়ি-টড়িরও বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে কাপড় চোপড় রাখবার জন্য সুটকেস্ জাতীয় কিছু আনা

সম্ভব হয়নি। মানে—তাড়াহুড়োতে আনা হয়নি। তবে একটা নাইলনের ছোট থোলে ক'রে কিছু কাপড় জামা গেঞ্জী গতরাত্রে তুমিই জেল গেটে পৌঁছে দিয়েছিলে,—তা সব শুদ্ধ সেই থোলেটাকে যুৎসই মতন জায়গায় দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলিয়েও দেওয়া হয়েছে। অতএব—আপাততঃ এদিক থেকে আর কিছু করণীয় ছিল না।—তাই আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এসে দোতলার বারান্দায় একাকী পদচারণা শুরু করলাম।···

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। আমাদের বাগানটার তিন কোণে তিনটে জোরালো বাল্‌বের আলোয় সমস্ত জায়গাটা আলোময় হয়ে উঠেছে। বাঁ দিককার পাঁচিলের ওপাশে,—এবং জেলখানার বাইরের উঁচু পাঁচিলের এপাশে—কন্‌ডেম্‌ড সেলের সামনে সামনে কয়েকটা মারকারী বাতির রোশনাই ছড়িয়েছে। আমগাছগুলোর শাখায় শাখায় বকগুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে,—থেকে থেকে কোয়াক্ কোয়াক্ করে বিকট চীৎকারও করছে। ডানপাশের 'দড়ি-হাজত' থেকে মাঝে মধ্যে কলরব ভেসে আসছে। অন্যথায়—চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। অথচ—এক আধজন নয়,—চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় আড়াই হাজারের মত কয়েদী রয়েছে এই জেলখানায়। এদের খবরদারী করবার জন্য,—জেলের ভেতরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য আরও কয়েক-শ' মানুষও আছে। তথাপি—সন্ধ্যা হতে না হতেই সব কেমন অস্বাভাবিক শান্ত!—যেন একটা প্রাণহীন প্রেতপুরী!···

অথচ—এই জেলখানার ওই উঁচু পাঁচিলের পরপারে যে লোকালয়,—যে শহর,—সেখানে কি উদ্বেল জন-তরঙ্গ এখন! কী অসাধারণ কর্ম-ব্যস্ততা!—কত আলো!—কত হাসি!—কত সুখ-দুঃখ!—মান-অভিমান! কত ভালবাসা-বাসি! সত্যিই আশ্চর্য!—মাত্র ক'হাত ব্যবধানে কি বিস্তর বৈপরীত্য!···

সত্যিই,—ভাবলে কেমন যেন অবাক্ লাগে সব। মাত্র এক

দিনের ব্যবধানে জীবনে কত না পরিবর্তন আসে! গত পরশু দিনের সন্ধ্যার সেই আমি,—আর আজকের সন্ধ্যার এই আমির মধ্যে কত না পার্থক্য! সেদিন আমি ছিলাম স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ-গতি, গৃহগত প্রাণ, কর্মচঞ্চল এক সংসারী। আজ আমি নিতান্তই সীমিতগতি, পরমুখাপেক্ষী, কর্মহীন, এক নির্বাসিত। সামান্য কিছু দূরেই আমার গৃহ, আমার প্রিয়জন, আমার পরিজন। কিন্তু সামনের ওই প্রাচীরের বাধা অতিক্রম ক'রে আজ আর উপায় নেই সেই গৃহে যাবার,—প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার। ওপারের সে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এপারের আমার এ দীর্ঘশ্বাসের হয়ত মিলন ঘটছে দূস্তর বায়ুমণ্ডলে,—কিন্তু কারা প্রাচীরের অন্তরাল অপসারিত করে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের কোন উপায় নেই আজ!···

কিন্তু কেন?—কোন্ কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে আজকের এই কারা-জীবন? না, সদাশয় সরকারও ঠিক তেমন কোন অভিযোগ আনেন নি,—সে রকম অপবাদ দেন নি। তবে—কিছু না করলে কি হবে,—করতে তো পারতাম!—করার সম্ভাবনা তো ছিল!—অন্ততঃ ওঁদের বিবেচনায়। তাই ও সম্ভাবনাটাকেই সমূলে উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ—আগে-ভাগেই আশঙ্কার জড়টা মেরে রাখা। এই আর কি।···

শুনেছি,—ব্রিটিশের বানানো আইনে নাকি বলেছে,—হাজারো অপরাধী সাজা এড়িয়ে যেতে পারে—যাক; কিন্তু দেখো, একটি নির্দোষ মানুষও যেন শাস্তি না পায়। আরও শুনেছি,—মোটামুটি ব্রিটিশ আইন-কানুনের ভিত্তির ওপরেই নাকি আমাদের বিচার সৌধের অধিকাংশটাই গড়ে ওঠেছে।—হবেও বা। কারণ,—শুনেছি, অসংখ্য মানুষ অগণিত দুষ্কর্ম ক'রেও দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন,—অবাধ আনন্দে করে কম্মে খাচ্ছেন। শুধু তাই-ই নয়,—উপরন্তু মানাগুণী মহাজনও হয়ে উঠছেন। অধিকন্তু এও শুনেছি,—রামের বোঝা শ্যামের ঘাড়ে চাপার মত কাণ্ডকারখানা

ছাড়াও,—অনেক নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তি শুধুমাত্র কোন মহাজন বিশেষের নেকনজরে পড়ার গুণেই দুর্বহ শাস্তির ভারে জর্জ্জরিত জীবন যাপন করছেন।...

কিন্তু আমরা পড়ি কোন্ পর্যায়ে!—মহাজনদের পদাঙ্ক যে অনুসরণ করতে পারিনি,—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তো বন্দী জীবন। অন্য কারো বোঝা তার স্কন্ধদেশ থেকে কৌশলে স্খলিত হয়ে আমাদের স্কন্ধে এসে ভর করেছে,—ঠিক তেমনও তো নয় ব্যাপারটা। তবে!—তবে বোধ করি—ওই সেই কোন মহাজনের নেকনজরই এ বিড়ম্বনাটা ঘটিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এক নেকনজরেই বোধ হয় অপর নেক্‌নজরকে টেনেছে। আমরা নজর দিতে পারি,—এই ভেবে ওঁরা পূর্বাহ্নেই তড়িঘড়ি নজর দিয়ে ফেলেছেন। একেবারে নজর বন্দী করেছেন।—তা ওঁদের দিক থেকে ভালই করেছেন। তাবৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের যা করা উচিৎ,—যা তাঁরা সচরাচর করে থাকেন,—তাই-ই করেছেন।—তাই এমনিতে তেমন বিস্মিত হবার মত সত্যিই কিছু নেই এতে।...

কিন্তু—একে তো ঘর ছাড়া ভারাক্রান্ত হৃদয়,—তায় এমনিতেও নিতান্তই স্বল্পবুদ্ধি এবং মন্দমতি মানুষ,—তাই কেমন যেন সব অবাক অবাক লাগে। যেমন অবাক লাগে কারো কারো কথা শুনতে—যখন ওঁরা এমন ভাবে কথা বলেন যেন 'দেশ' নামক বস্তুটা স্বয়ং বিশ্ব-দেবতাই যথা বিহিত দলিল দস্তাবেজ ক'রে কেবলমাত্র ওঁদেরই দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছেন। এবং একেবারে সূতিকাগারে বসেই শুধু ওঁদেরই ললাটে স্বহস্তে দেশপ্রেমের চিরভাস্বর উল্কি এঁকে দিয়ে গেছেন। আর সেই বিধি-প্রদত্ত অক্ষয় কবচ কুণ্ডলের বলেই বোধ করি বলীয়ান হয়ে সূতিকাগার থেকে বাইরে বেরিয়েই ওঁরা গগন পবন বিদীর্ণ করে বলেছেন,—আমি আগন্তুক বটে,—জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুকও বটে,—কিন্তু তথাপি—খোল দ্বার,—বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।—তা সত্যি সত্যি ও বিধাতারই বার্তা

বহন করেই বোধ হয় ওঁরা এসেছেন।—তাই বোধ করি ওঁদের অমন প্রতিষ্ঠা।—অত জয়ধ্বনি।···

তা ওঁদের জয়ধ্বনি উঠুক। ওঁরা জয়ী হোন।—তাতে আপত্তি নেই,—আক্ষেপ নেই,—বিস্ময়ের ভাবটাও মনে মনে পোষণ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সত্যিই বিস্ময় জাগে তখন যখন ও জয়ধ্বনি মুখরিত পরিমণ্ডলের বাইরেকার তাবৎ মানুষগুলোকে চিহ্নিত করা হয়,—ওঁরাই করেন,—দেশদ্রোহী নরাধম রূপে,—শান্তির শত্রু রূপে,—জন-কল্যাণের কৃতান্তরূপে,—প্রগতির পরিপন্থী এক ঘৃণ্য পামর রূপে। শুধু বিস্ময়ই নয়,—মনের মধ্যে একটা ক্ষোভের ঘুর্ণি হাওয়াও যেন দুরন্তবেগে পাক খেতে থাকে তখন। 'ক্ষুধিত পাষাণের' পাগলা মেহের আলির মত চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়—'সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়'···

কিন্তু না,—সব ঝুট্ হলেও—ও মহাজনদের নজর—বৃত্তান্তটা মিথ্যে নয়। নজরে পড়লে, আর ঠিক মত নজরানা দিতে পারলে,—তো একেবারে হাতে হাতে ফল,—সেই যাকে বলে নগদ নারায়ণ। অন্যথায় সেই শনিশ্চরের সর্বনাশা দৃষ্টি। ফল—বন্ধন,—মৃত্যু-ভয়। অতএব, সাধু সাবধান!···

তা ও-অর্থে,—নিশ্চয়ই বেশ সাবধানেই গুটিগুটি ওপরে উঠে এসেছিলেন ভদ্রলোক, বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা,—তাই অকস্মাৎ বিমানবাবুকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু চমকেই উঠেছিলাম—আপনি?

হ্যাঁ, আমাকেই ঠেলেঠুলে ওপরে পাঠিয়ে দিলে সব। অগত্যা এই এখন থেকে আমিই আপনার প্রতিবেশী। মানিয়ে গনিয়ে নেবেন একটু আর কি···বিমানবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের সঙ্গেই কথাগুলো বললেন।

জানতুম নীচে থেকে ওপরে উঠে আসবেনই কেউ একজন। আসতেই হবে। কারণ ঘর পাঁচখানা, অথচ ওদিকে মানুষ ওঁরা

ছ'জন। তাই একজনকে ওপরেই আস্তানা পাততে হবে। তবে কোন্‌জন যে আসবেন দলছাড়া হয়ে, সেইটেই ঠিক জানা ছিলনা। তা শেষ পর্যন্ত বিমানবাবুই এলেন। ভালই হলো। আমার ঠিক পাশের ঘরেই উনি স্থিতি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার কাজে আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম বিমানবাবুকে।…

তিন

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। এইমাত্র জমাদার লক্‌ আপ্‌ করে গেল। এখন থেকে বাকী রাতটুকুর জন্যে যে যার ঘরে আটক থাকতে হবে।

জেলের নিয়ম অনুসারে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই শেষ লক্‌ আপ্‌ করার কথা। তাবৎ কয়েদীর বেলাতে করাও হয় তাই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেলকর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে বাড়তি সুবিধে দিতে পারেন, দেনও, 'লেট্‌ লকাপের' ব্যবস্থা করেন। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে করেছেন। দশটা পর্যন্ত গারদমুক্ত থাকবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। অবশ্য আমরা যে শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হয়েছি, সে শ্রেণীর বন্দীদের জন্য এমনিবিধ অনেক সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা জেল-আইনেই আছে। অনেক কাল থেকেই চলে আসছে সেসব। তবে শুনেছি—ইদানীং জেল-নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। অন্ততঃ, খাতায় কলমে কয়েদীদের জন্যে কিছু সুযোগ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাধীনতার পরিমাণটা একটু বেড়েছে। তাই বোধকরি এই গোরাডিগ্রীর চৌহদ্দিতেও কিছু নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। তা সে যেমনই হোক, বাড়তি সুযোগে বিড়ম্বনাটা নিশ্চিতই কিছুটা কমেছে। তার জন্য যথাযোগ্য সাধুবাদটা পৌঁছে দিতেও আমি প্রস্তুত।…

কিন্তু মনের ও—ভিজে ভিজে ভাবটা নিতান্তই যে তৎকালিক ব্যাপার,—তা কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুভব করলাম। দরদর ধারে শরীর থেকে যখন ঘাম ঝরতে আরম্ভ করল, আর কিসের না কিসের কুটকুট কামড়ে যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, তখন কিছুক্ষণ আগেকার সে উদার উদার মনটা প্যাঁচে কাটা ঘুড়ির মত কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

একেতো প্রচণ্ড গরম, তায় সামনের গরাদ ছাড়া বাতাস ঢোকবার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। বিপরীত দিকে ভেন্‌টিলেটার একটা আছে বটে তা সে আয়তনের দিক থেকে যতই উল্লেখযোগ্য হোক, উর্ধলোকে অবস্থিত সেই কিঞ্চিৎ মুক্তাঞ্চল থেকে কিঞ্চিৎ নয়ন গোচর আলো আসে বটে, কিন্তু বাতাসও যে কিছু আসে ওই সঙ্গে তা অনুভব করবার জন্য দীব্যদেহ প্রয়োজন, এ অধম নশ্বর শরীর একান্তই অক্ষম সে ব্যাপারে। তাছাড়া, যদিও বা কিছু বাতাস ঢোকে ভেতরে, তা সে যে পথেই হোক, তা মশারী নামক দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারে ব্যর্থ মাথা খুঁড়ে নিশ্চয়ই পালিয়ে যায়। এমনিতে নেটেরই মশারী, নতুনও, কিন্তু এমনই গঠন পরিপাট্য যে ও নামেই শুধু মশারী, আসলে যুগপৎ মশারও অরি আর বাতাসেরও শত্রু। তবে জেলখানার মশাতো, দস্তুরমত কন্‌ভিক্ট্‌ ক্যাটিগরির বোধ হয়, তাই অমন ঠাসবুনুনি নেটের জাল সত্ত্বেও দিব্যি দুয়েকজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে, মাঝে মধ্যে তাদের সুরভাজা শোনা যাচ্ছে। রক্তপান তো যথারীতি চলছেই।···

গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা হাতপাখা অবশ্য ধরিয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ক্ষুদ্রকায় তালপাতার পাখা একটা। কিন্তু তাতেও তেমন কিছু সুবিধে হচ্ছে না। একে তো বহুকাল ও-বস্তুর ব্যবহার করিনি। দরকারও তেমন হয়নি। লোড্‌সেডিংয়ের পাল্লায় পড়ে বর্তমানে দুই একখানা ঘরে রাখতে হয়েছে বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ নাড়লেই কেমন হাত ব্যথা করে, দু'দণ্ড পরে দুত্তোর বলে

ফেলে রেখে দিই। ঘর্মাক্ত দেহেও প্রতীক্ষা ক'রে থাকি, কখন আবার ইলেক্‌ট্রিসিটি আসবে, আলো জ্বলবে, পাখা চলবে, আবার স্বাভাবিক সুস্থজীবন ফিরে পাব, তার জন্যে। তবে হ্যাঁ ছেলে বয়সে দেশেঘরে তালপাখার ব্যবহার করেছি অনেক। করতে হয়েছে। জেলা সদর হলেও মফস্বল শহর, এমনিতে যেমনই হোক বিজলী-বাতির মুখ দেখা যায়নি বহুকাল যাবৎ। দোকানে বাজারে পেটরোম্যাক্স, আর ঘরে ঘরে লণ্ঠন, ল্যাম্প, প্রদীপ, এই-ই ছিল সেদিনে অন্ধকারের অপরিহার্য্য সাথী। আর কোর্ট-কাছারী, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো বাদ দিলে ওই তালপাখাই ছিল গ্রীষ্মের সময়ে একমাত্র সম্বল। তা ও কিবা দিন, কিবা রাত্রি। আর সেই পাখাগুলোও ছিল তখন বেশ বড় বড়, মানে একটা ঝটকায় বেশ খানিকটা হাওয়া খেলত। তার ওপর নানারকম রংএ রেখায় বেশ সুদৃশ্য করেও তোলা হতো পাখাগুলোকে। কখনও কখনও রঙ্‌চঙে অক্ষরে তাদের গায়ে লেখাও থাকত—'তালবৃক্ষে জন্ম তব, পাখা নাম ধর ; জীবের কল্যাণতরে ঘরে ঘরে ফের'। আবার কখনও থাকত 'এক পয়সায় কেনা পাখা, বাতাস যেন মধুমাখা'। তা কোন দিক দিয়েই অসত্য ছিলনা লেখাগুলো। হয়তো কিছু প্রচারধর্মী ছিল ওগুলো, খদ্দেরের মনোহরণের জন্যই বিশেষ ক'রে অমন সব মনোহারী কথা সাজানো হয়েছিল, কিন্তু আজকালকার মত মূলতঃ মিথ্যে কথারই ফুলঝুরি ছিলনা। কথায় কাজে মিল ছিল। সত্যিই, দামেও অস্বাভাবিক সস্তা ছিল, আর মধুমাখা বাতাস বিলিয়েই ঘরে ঘরে ফিরতো, তাপদগ্ধ জীবের কল্যাণের জন্যই হাতে হাতে ঘুরত। কিন্তু হায়রে, কবে কেটে গেছে সে ছেলেবেলার কাল! এখন এক পয়সায় বিকোবার মত সে তালপাখাও নেই, ওদিয়ে টেনে টেনে হাওয়া খাবার মত হাতও নেই, আর বিশ্রাম-কাতর বিছনায় শুয়ে শুয়ে অমন কর্মে মাতবার মত মনও নেই। আজ সবটা মিলিয়ে তাই ওতে বিড়ম্বনারই মাত্রা বৃদ্ধি হয় মাত্র।···

তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটাই তো বিরক্তিকর। এমন হাওয়া বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে তালাপাখা টেনেই বা মরতে হবে কেন এমন।···বেশ তো বাবা, শত্রু ভেবেছো, তালগোল বাধাতে পারি কিছু আশঙ্কা করেছো, শঙ্কাহীন হবার আশায় জেলে পুরেছো, নিশ্চিন্ত হয়েছো। কিন্তু তা সত্বেও ওই যে বিজলীবাতির ব্যবস্থা রেখেছো, ওর ওপর একটা পাখার মেহেরবাণীও তো করতে পারতে! বন্দী বেচারীরা তো তাতে ওরই মধ্যে একটু স্বস্তির স্বাদ পেতো, অন্ততঃ শান্তিতে ঘুমোতে পারত। আর আমাদের এ যৎসামান্য স্বস্তিতে ওঁদের তেমন অস্বস্তি জন্মাবারও তো কারণ ছিল না কিছু! আসলে সে সব কিছু নয়, সবই নিষ্ঠুর নির্যাতন, শক্তিমানের শত্রু নিপীড়নের সদম্ভ কাহিনী। আলোটা যে আছে সেও বোধকরি বন্দীদের সুবিধার্থে নয়, ওঁদেরই প্রয়োজনে। এতগুলি কয়েদী, কে কোথায় কি অঘটন ঘটিয়ে ফেলে তার তো ঠিক নেই। তাই সব আলোয় আলোয় ভাল ক'রে নজরের ওপর রাখা, লক্ আপে বন্দী করেও বাড়তি নজরবন্দী করে রাখা। আমাদের এখানে অবশ্য রাত্রে ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। বাইরে থেকে সেপাইরাই নিভিয়ে দেবে বলা মাত্র। তবে অন্যান্য ওয়ার্ডে তো শুনলাম সারা রাত ধরেই ওই বিজলী-বাতির রোশনাই, আলোর দিকে চোখ রেখে নাকি আলোয় আলোয় ঘুমের দেশে চলে যাবার ব্যবস্থা সেখানে। ভাগ্যিস্, তেমন ব্যবস্থাটা এ ওয়ার্ডে চালু নেই, এর ওপর সারা রাত্তির যদি আলোর ধকল সামলাতে হতো তাহলে তো আর দেখতে হতো না, সব দিক থেকে চিত্ত তাহলে একেবারেই সেই যাকে বলে চমৎকৃতই হতো।···

অথচ তোমার মনে পড়বে নিশ্চয়ই প্রিয়া—সেই দিল্লীর জেলের পরিবেশের কথা। সেই বাংলাদেশ সম্বন্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বনের দাবীতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লীতে আমরা যখন ক'দিন ধ'রে সত্যাগ্রহ ক'রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মতন নরনারী কারাবরণ

করেছিলাম, এবং একই দলে তোমার ও আমার চব্বিশঘণ্টার কারাদণ্ড দিয়েছিলেন জনৈক দিল্লীর হাকিম, মনে পড়ছে? আমার কিন্তু দিব্যি মনে পড়ছে সে জেলের সমস্ত ঘটনাই। বেশ মনে পড়ছে, আমাদের দিনে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্বে ছিলাম আমি ও মধ্যপ্রদেশের এম-পি শ্রীসেজোয়ালকর। তা ওই লীডার সুবাদেই বোধকরি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল স্পেশাল বা ভি, আই, পি ওয়ার্ড, যেখানে নাকি একেবারে এয়ার কনডিশাণ্ডেরই ব্যবস্থা। কথাটা শুনে অবধি আনন্দের আর অবধি ছিলনা, যাক্ বাবা, সিনেমা হলের দু'আড়াই ঘণ্টা নয়, জেলের সুবাদে এয়ারকণ্ডিশাণ্ড প্রকোষ্ঠে একেবারে চব্বিশটা ঘণ্টা কাটানো যাবে। কিন্তু মূলে সেই লীডারেরই ব্যাপার তো, তাই পশ্চিমবাংলার সত্যাগ্রহী বন্ধুরা তাঁদের সঙ্গেই রাখবার জন্যই জিদ্ ধরলেন, ফলে এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ঘরের শিঁকেটা ছিঁড়েও ছিঁড়ল না বরাতে। তা না হোক, কিন্তু যা জুটলো শেষ পর্যন্ত, সেও কিছু হেলাফেলার নয়। দিব্যি ঝকঝকে তকতকে প্রকাণ্ড হলঘর, অনেকগুলো বড় বড় দরজা জানলা, প্রচুর আলোবাতাস, তার ওপর মাথার ওপরে ঘূর্ণায়মান কয়েকটা বড় বড় বিজলী পাখা। এর ওপর হলটির লাগোয়া বাইরের করিডরটার ওপর সার সার আধুনিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন, আর শাওয়ার সমেত বাথরুম। আর সবই কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার ওপর ভেতরের উঠোনটার সেই ছোট্ট অথচ সুন্দর ফুলবাগানটার কথা তো আজও ভুলতে পারছি না।...

এ প্রসঙ্গে তোমার মনে পড়বে নিশ্চয়ই সেই মিঃ নাগরওয়ালার কথা। কিছুদিন আগে তো ওঁকে নিয়েই কত হৈ-চৈ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতীগান্ধীর কণ্ঠস্বরে কে নাকি টেলিফোনে টাকা চাইলেন। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মালহোত্রা নাকি সেই সুবাদে মিঃ নাগরওয়ালার হাতে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তুলে দেন। ভাব একবার, লাখ লাখ টাকার কি সহজ সরল সদ্গতি! যাই হোক, ওই নাগরওয়ালা

নাকি সেই টাকা যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন না, বামাল সমেত বেপাত্তা হলেন। আর তার ফলেই তাবৎ বিপত্তি, নাগরওয়ালা রহস্য কাহিনী। আর তোমার মনে পড়বে নিশ্চয়ই যে ওই সময়ে আমাদের সেই ওয়ার্ডেই, আমাদের পাশের একটি বড় খাঁচা সদৃশ সেলেই বন্দী হিসেবে ছিলেন—টকটকে গৌর বর্ণ প্রশান্ত মূর্তি এক অভিজাত দর্শন বৃদ্ধ, মিঃ নাগরওয়ালা। দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে তলে তলে ওরই মধ্যে অমন বিত্তসংক্রান্ত বিশ্বরূপ!···

তোমাদের আবাসস্থলটা স্বভাবতই জেলটার ফিমেল ওয়ার্ডে ছিল। স্বচক্ষে না দেখলেও তুমিই বলেছিলে সেখানেও অনেকটা এই ধরণেরই ব্যবস্থা ছিল। তার উপর তোমার কাছেই শুনেছি, অন্যান্য বন্দীনীরা নাচে গানে তোমাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। মোটের ওপর কোনদিক থেকেই স্বল্পকালের সে কারাবাস তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করেনি, শুনেছি।

কিন্তু সে তুলনায়—এই প্রেসিডেন্সী জেলের স্পেশাল ওয়ার্ড? খোদ গোরাডিগ্রী?—রাম কহ? এখানকার ওয়ার্ড-চত্বরে স্থান হয়তো অনেক বেশী, পুষ্পোদ্যানও বিস্তৃততর, বাসস্থলটাও দ্বিতল অট্টালিকা, ঘরে ঘরে কিছু আসবাব পত্রও,—কিন্তু তবুও এরই মধ্যে বুঝেছি সবটা মিলিয়ে এটা একটা বাসের অযোগ্য স্থানই।···

একে তো মান্ধাতার আমলের জেল, ঘর বাড়ী সব সেকেলে ধরণের।—তার ওপর কেন জানি সাধারণ যত্ন-আত্তির অভাবে এমনিতেও অভিভাবকহীনের মত যা দশা। চুনকাম, বালি ধরানো,—প্রয়োজনীয় টুকটাক মেরামতাদি যে অনেককাল নিষ্পন্ন হয়নি এ তল্লাটে তা তো সাদা চোখেই পরিদৃশ্যমান। তবে ওদিক থেকে সর্বাপেক্ষা দুরবস্থা বোধ করি জেল অফিসের। ইস্! কি নোংরা! কি বিশ্রী পরিবেশ! অথচ—দেখো, কালে ভদ্রে ডাকডোক পড়লে—কয়েদীরা আসে বটে এখানে কিছুক্ষণের জন্য,—কিন্তু নিত্য আসা যাওয়া তো করেন—জেলার সুপার প্রভৃতি দণ্ডমুণ্ডের কর্তারাই সব।

জেলের, আই, জি প্রায়ই আসেন, অন্ততঃ আসবার কথা। জেলমন্ত্রী নিশ্চয়ই আসেন মাঝে মধ্যে,—পুলিশের ছোট বড় কর্তারা তো আসেনই অনবরত, আসতেই হয় অমন নানা কাজে,—তার ওপর ওই 'ইন্‌টারভিউ' নামক ব্যবস্থার দৌলতে মাঝে মধ্যে আসেন দেশের অনেক নামী দামী মানুষও। তবুও—দেখো,—অ'ফস তো নয়,—যেন অব্যবহৃত একটা গুদোম ঘরই। কলিফেরানো হয়নি যে কতকাল—তার ঠিক নেই। জানালা দরজায় রং-ফং নেই, জানলাগুলোর ওপরকার তারের জাল ঝুলে কালিতে পরিপূর্ণ চেয়ার টেবিল সব নড়বড়ে, অপরিষ্কার। আর সবার ওপরে টেক্কা দিয়েছে ঘরের দেওয়ালগুলো। সারাগায়ে কাল কালির চিত্র বিচিত্র সব অদ্ভুত অদ্ভুত কি অগণিত দাগ। কি ? —না নিরক্ষর কয়েদীদের টিপসই-এর দাগ সব। বোঝ ব্যাপার! ওই টিপসইগুলো যে কি কারণে অমন দেওয়াল বন্দী ক'রে রাখা, —তা ঠিক ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার মত মহাজনের সাক্ষাৎ পাইনি এখনও। কিন্তু—সে যাই হোক, দেখতে কি বিচ্ছিরি দৃশ্য বলত ?

তবে ও-বিচ্ছিরি দৃশ্য কি কেবল অফিসে?—পাগল নাকি ? সত্যি কথা বলতে কি,—ও আর এমন কি ব্যাপার,—এখানকার স্যানিটারী ব্যবস্থার সঙ্গে একবারও মোলাকাৎ হয়েছে যার— অফিস কাছারী তো নেহাতই নস্যি তার কাছে। ইস্,—ভাবাই যায় না যেন!···

এত বড় জেল, নামেও প্রায় গগন ফাটে, তার যে সত্যিই এমন হাল, দেখ্‌ভাল না করলে তা কল্পনা করাও শক্ত। হাজার তিনেক বন্দী, তা কি অপর্যাপ্তই না জলের ব্যবস্থা। ও স্নানের জলই বল, আর পানীয় জলই বল, দুটোরই সমান অবস্থা। কাল বোশেখীর বর্ষণের মতই, এলো তো দেদার দেদার, নেই তো এক ফোঁটাও নেই। তার ওপর খোদ করপোরেশানের দান তো, যখন তখন, যেমন

তেমন ভাবে তো হবে না কিছু, ঠিক ঠিক সময়ে আসবে, ঘটিবাটি হাতে করে লাইনে দাঁড়াবে, শেষ সময়ের মধ্যে পৌঁছোতে পার যদি অকুস্থলে, পাবে কিঞ্চিৎ নিছক তৃষ্ণা নিবারণের মত। তাও দান-কর্মেরই ব্যাপার তো মোটামুটি, তাই নিয়মিতই মিলবে তা তো নয়। দাতার মর্জি মাফিকই ঘটবে ঘটনাটা, আজ আছে, কাল নেই, এই আছে, এই নেই। এ তো গেল পানীয় জলের সমাচার। আর স্নানের জল? কি যে বল তার ঠিক নেই! জেলেরই কয়েদী সব, না কি? নিতি নিতি অমন সাবান মেখে স্নানাদির বায়নাক্কা কেন বাপু? হ্যাঁ, এক আধদিন স্নানটান করবে বই কি, তাতে আর বাধাটা কি? তবে রোজই যদি অমন বেয়াড়া সখ চাপে, যাও বাবা, পুকুরে যাও, অঢেল জল আছে সেখানে, বাঁধানো ঘাটও আছে। তবে জলটা একটু নোংরা এই যা। তা জায়গাটা তো জেলই, এর মধ্যে নোংরা পুকুর না হয়ে কি তবে মানস সরোবর বিদ্যমান থাকবে?···অনেকটা এই ধরণের মন্তব্য শুনেছিলাম এক কেষ্ট বিষ্টু জমাদারেরই মুখে। আজই সকালে। অন্য ওয়ার্ডের একজন ছিটকে এসে পড়েছিল আমাদের এখানে স্নান সারবার মানসে। তা স্নান তো করতে দিলেই না লোকটাকে, উল্টে ধমক ধামক, আর ওই মন্তব্য। বোঝ ব্যাপার!

তবে আমাদের এ গোরাডিগ্রিতে কিন্তু ও-জলের সমস্যা নেই। ট্যাপ ওয়াটারই, তবে মোটা পাইপ, আর মোটা মোটা কলে কলকলিয়ে পড়েও দেদার জল। তার ওপর, প্রকাণ্ড এক বাঁধানো চৌবাচ্চায় টইটম্বুর করে ধরেও রাখা হয় জল। স্নান টান, কাচা কুচি, কিছুতেই অসুবিধে হয় না কিছু। এমন কি বাইরের লোকজন এলেও, আসেও অমন অবিরত দেখলাম, পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও আসে, কিন্তু জলাভাব দেখা দেবার কথা নয়। তাই জলের দিক থেকে আমাদের ভাগ্য অবশ্যই স্বতন্ত্র, নিঃসন্দেহে প্রসন্ন।···

কিন্তু ওই পর্যন্তই আলাদা বৃত্তান্ত, তার পরেই তো মোটামুটি সব একাকার। যেমন ল্যাট্রিন, তেমনি ড্রেন। শহর কলকাতাই, এলাকাটাও আলিপুর, তথাপি সার্ভিস ল্যাট্রিন, আর পাকা অথচ খোলামেলা ড্রেন। আর কি সুবাসেই না অহর্নিশি আমোদিত করছে চতুর্দিক ওই খোলা ড্রেন। এমনিতে ময়লা দুর্গন্ধ তো আছেই, তার ওপর তামাম জেলখানার তাবৎ ল্যাট্রিনের প্রসাদ পুষ্ট ওই ড্রেনগুলো রূপে গন্ধে সে এক অনির্বচনীয় বস্তুই। এর সঙ্গে আবার গঙ্গার বেনোজল কল্‌কল্‌ খল্‌খল্‌ ক'রে যখন ঢুকে পড়ে জেলের মধ্যে, যেমন আজ দুপুরে ঢুকেছিল, এবং ড্রেনগুলো ছাপিয়ে সাময়িকভাবে ভাসিয়ে দেয় চতুর্দ্দিক, যেমন দিয়েছিল আজ, তখন সে তো এক নারকীয় দৃশ্যই।···

এমন কি হাসপাতাল যে হাসপাতাল, অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার আয়োজন-অঙ্গন, তা সেখানেও ওই অস্বাস্থ্যকর কুৎসিৎ পরিবেশ। বাড়তির মধ্যে ওখানকার ড্রেনটা অনেক বেশী চওড়া, আর খুব গভীর। আর তার ফলে সেই চমৎকার দৃশ্যটা আরও জমকালো এখানে।···

এমনিতে জেলে ঢুকেই সদ্যসদ্য হাসপাতালে যাবার কারণ ছিল না কিছু। ঠিক হাসপাতালে যাইওনি বলতে গেলে। ওর সামনেকার জায়গাটা ঘিরেই যাবৎ কৌতূহল ছিল আমাদের। কারণ, ওখানেই নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেছিলেন কানাই দত্ত।···

অনেককাল আগেকার কথা অবশ্য। কাহিনীটা সেই অগ্নিযুগের। নরেন গোঁসাইও ছিলেন কানাইদত্তদের মত বিপ্লবীদের দলে। কিন্তু কেন ঠিক জানা যায়না, শেষকালে নাকি বিশ্বাসঘাতক বনেছিলেন, দলের তাবৎ গুপ্তকথা সব ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন পুলিশকে। ফলে ওই পরিণাম ওঁর। শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাইকে পিস্তলের গুলিতে খতম করেছিলেন তাঁরই সহ-বিপ্লবী চন্দননগরের কানাই দত্ত। আর কি আশ্চর্য! দু'জনেই তখন ছিলেন হাসপাতালে শয্যা পেতে।

নরেন গোঁসাই অবশ্য সত্যই রোগী ছিলেন, কিন্তু কানাই দত্ত রোগী সেজেছিলেন সহজে কাজ হাঁসিল করবার জন্য। আর ওই উদ্দেশ্যে নাকি পাকা কাঁটালের মধ্যে ক'রে পিস্তল আমদানি করেছিলেন বাইরে থেকে। তা ঠিক ঠিক কাম ফতেও করেছিলেন কানাই দত্ত। কিন্তু তার পূর্বে নরেন গোঁসাইও বুঝতে পেরেছিলেন সব, তাই প্রাণ ভয়ে হাসপাতালের বিছানা ছেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন, দৌড়তে শুরু করেছিলেন, কিন্তু না, বেশীদূর যেতে পারেন নি গোঁসাই, কানাইও ছুটেছিলেন উদ্যত পিস্তল নিয়ে পিছে পিছে, ব্যস, হাসপাতালের সামনে, রাস্তার ওপর, ওই প্রশস্ত ও গভীর ড্রেনটির পাশেই, রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছিলেন নরেন গোঁসাই। ফলে—বিচারে অবশ্য কানাই দত্তের ফাঁসি হয়েছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে··

তা এমন ঐতিহাসিক, অমন রক্ত-রাঙ্গা স্থানটা দেখবার লোভ সামলানো যায়? বিশেষ যখন জায়গাটা ঘটনাচক্রে বর্তমান বাসস্থলের বেশ কাছাকাছি? আর ওই ঐতিহাসিক স্থানটা দেখতে গিয়েই তো অমন প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশটা প্রত্যক্ষ ক'রে চমৎকৃত বোধ করলাম।···

তা ও-পয়প্রণালীর পরিপাট্য ছাড়াও পথ ও তার দু'পাশের অবস্থাও কিছু কম দ্রষ্টব্য নয়। নতুন কিছু তো দূরের কথা, ও টুকিটাকি মেরামতি-টেরামতিও যে কতকাল হয়নি, তার ঠিকুজি মেলানও কঠিন। চারিদিকে ভাঙ্গাচোরা, এবড়ো খেবড়ো প্রান্তর, আর ক্ষত-বিক্ষত সবুজ সবুজ পিচ্ছল পথ। বর্ষাতে জল জমে আছে বেশ কয়েক জায়গায়। আর আমাদের এ গোরা-ডিগ্রিতে আসবার পথটা আবার ওরই মধ্যে বোধ করি সব চাইতে সরেস। কাল রাতের অন্ধকারে যে পা দুটো অক্ষত নিয়েই এখানে এসে উঠেছিলাম তাতে ভাগ্যদেবতার নিশ্চয়ই অনেকখানি কার-সাজি ছিল। তার ওপর আবার আলোও ছিল না এ তল্লাটে।

তখন ভেবেছিলাম ঝড়ে জলেই হয়তো অমনটা হয়েছে, নইলে এতটা রাস্তা, তাও আবার গোরাডিগ্রির পথ, কখনও আলোহীন থাকতে পরে? তা-ও আবার জেলে? কিন্তু, হায় কপাল! দিনের আলোয় দেখলাম ও-সব কারবারই নেই কোথাও! সারি সারি কয়েকটা হোল্ডল জেগে আছে বটে, কিন্তু কারো বক্ষেই কোন বাল্ব নেই। সত্যিই, বলিহারি ব্যবস্থা সব!

তার ওপর ওই পথের পাশে ও-দিকটাতে আবার এক বিস্তৃত বসতিহীন প্রান্তর। কি হয় ওখানে? অতখানি জায়গায়? ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। কেবল দেখেছি কাছাকাছি একটা টিনের আটচালা। ওটা নাকি এক সময় একটা কারখানা ছিল। আজ আর কিছু হয়না এখানে, অনেকদিন থেকেই হয়না, তবে সরকারী ব্যাপার তো, তাই যন্ত্রপাতি, ঘর দোর, সব পূর্বমতই নাকি বহাল তবিয়তে রয়েছে। আর চোখে পড়েছে আরও কিছুটা দূরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা কাঁচের ঘরমতন বস্তু। শুনেছি ওটা নাকি মর্গ, কয়েদীদের মৃতদেহ—সংকার বা —অসংকার নিষ্পন্ন হবার আগে পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করে। এছাড়া, যতদূর চোখ গেছে শুধু খোলা মাঠ, ওই দূরের উঁচু জেল প্রাচীর পর্যন্ত। কি যে ঠিক আছে বা হয় ওই মাঠে জানিনা। তবে আজই সকালে কিন্তু চোখে পড়ল ছড়িয়ে ছিটিয়ে একপাল কয়েদী যেন কি সব কাজকর্ম করছে ওখানে, আর জনাকতক সেপাই বোধ করি ওদেরই খবরদারি করছে। শুনলাম—নিত্য নাকি অমন করে ওরা। তা যাই-ই করুক ওরা, কাজের কাজ যে বিশেষ কিছুই হয় না ওখানে তার প্রমাণ তো জাজ্বল্যমান। অমন ঝোপ জঙ্গল, অপরিষ্কার, অগম্যপ্রায় স্থান কি আর অতগুলো লোকের নিতি নিতি কিছু করার প্রমাণ? তবে জেলকর্তৃপক্ষের বা সরকারের কিছু হোক বা না হোক, ও জংলা জায়গার প্রসাদ কিন্তু আমরা এই গোরাডিগ্রির ক'টি অভাজন পর্য্যাপ্তই পাচ্ছি। একে ওই

নোংরা খোলা ড্রেন, তার ওপর নাকের ডগাতেই ওই যোজন বিস্তৃত জঙ্গলা জায়গা। ফলে ভোঁ ভোঁ সঙ্গীত পরিবেশন, আর অবিরাম রক্তপান, এক নাগাড়ে চলছেই সেই বিকেল থেকে। এমনকি এমন জাঁদরেল জেল মার্কা নেটের মশারীতেও সম্পূর্ণ অক্ষত থাকা যাচ্ছে না।

বোঝ ব্যাপার? বোঝ কেমন স্থলে বিছিয়েছি আমার শয্যা! কেমন পরিবেশে আমার নিদ্রাকর্ষণের প্রস্তুতি! তবু জানি,—নিদ্রা আসবে, দুদণ্ড আগে বা দুদণ্ড পরে। আজ না হোক কাল। নিদ্রা আসবে, কারণ তা স্বাভাবিক, তা অপরিহার্য। আর নিদ্রাদেবী তো বিস্মৃতিদাত্রী, শান্তিদাত্রী, তাই মুক্তিদাত্রীও।...

এই প্রেসিডেন্সী জেল বিভিন্ন বন্দীর এক বিচিত্র সমাবেশ। একে তো ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের সকল ভাষাভাষী সমস্ত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এখানে আছেন। বিভিন্ন মামলায় নানাভাবে জড়িত মানুষ যে সব। তার ওপর ভারতবর্ষের বাইরের মানুষও আছেন অনেক। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী আছেন। চীনা নাগরিক আছেন। আফ্রিকাবাসী নিগ্রো আছেন। আছেন জাপানী, ক্যানাডিয়ান, আমেরিকান এবং খোদ ব্রিটিশ বন্দীও। ফিমেল ওয়ার্ডেও শুনেছি ভারতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে আছেন কিছু বিদেশিনী বন্দিনীও। অর্থাৎ-কার্যতঃ কসমোপলিটন জেল বলতে যা বোঝায় এও অনেকটা তাই।

কিন্তু ওই যে দেশগত, ধর্মগত, ভাষাগত পার্থক্য বন্দী-বন্দিনীদের জেলের এই সীমিত প্রাঙ্গণে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্য সৃষ্টির ব্যাপারে হয়তো মূল্যবান এগুলো, পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞের বিশিষ্ট দৃষ্টিতে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণও, কিন্তু জেলের নিজস্ব পরিভাষায় তাবৎ

প্রাণীরই একই পরিচয়, সকলেই প্রিজনার। বিশুদ্ধ বাংলায় 'বন্দী'। চলতি বাংলায় কয়েদী। ব্যস, ওদিক থেকে তার বেশী কেউ কিছু নয়।··

তবে এই জেলের দৃষ্টিভঙ্গীতেই বন্দীদের অন্য আর একটা জাত-বিচার আছে। একটা শ্রেণীকরণ-পদ্ধতি আছে। আর ওই পদ্ধতি অনুসারেই তাবৎ বন্দীদের প্রথমেই ভাগ করা হয়—পলিটিক্যাল ও নন্ পলিটিক্যাল প্রিজনারে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বন্দীতে। যাঁরা কোন রাজনৈতিক দল-উপদলের সঙ্গে যুক্ত, নেতা বা নিছক কর্মীরূপে চিহ্নিত, এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কারণেই ধৃত বলে স্বীকৃত, তাঁরা তো সরকারী দৃষ্টিতেই রাজনৈতিক বন্দী কিন্তু সরকার হয়তো তেমন মর্য্যাদা দেননি, বরং বিপরীত কিছু করেছেন, উল্টো-পাল্টা নানরকম অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, তবুও কোন নির্দিষ্ট এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তার ধারক বাহক ব'লে প্রচারিত ব্যক্তিও রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা প্রাপ্ত হন জেলের মধ্যে। সুযোগ সুবিধেও পান সেই রকম। কিন্তু অরাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় এ ধরণের বিশেষ কোন গোলমাল নেই। নিছক ছিঁচকে চুরি ছিনতাই, পকেট মারা মদ চোলাই, গাঁজা-আফিঙের চোরা কিংবা কোন অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম, যেমন মাঝারি সাইজের ডাকাতি, ওয়াগন ভাঙ্গা কিংবা আরও একটু উঁচু স্তরের কীর্তি, এই যেমন ছুরি চালিয়ে কারো ভুঁড়ি ফাঁসানো, দা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাউকে পরলোকে পাঠানো, বা বোমার ঘায়ে বেমালুম কাউকে বোমে বিলীন করে দেওয়া, ইত্যাদি হরেকরকমের কর্মকাণ্ডের নায়ক-নায়িকারা সব অ-রাজনৈতিক বন্দী, নন্ পলিটিক্যাল প্রিজনার। তাছাড়া প্রথম রিপুর তাড়না জনিত কীর্ত্তিকলাপ আর নেই বল কোথায় দুনিয়ায়। তা সেই সুবাদেও আছেন বই কি এখানে কিছু নর-নারী আছেন ওই নন্ পলিটিক্যাল প্রিজনারদেরই দলে।

কিন্তু মজা কি জান প্রিয়া, যেমন সোজাসুজি তাবৎ বন্দীদের এই জাতবিচার ক'রে দিলাম, ঠিক তেমন জলবৎ তরলং নয় ব্যাপারটা আদপেই। অনেক ক্ষেত্রেই গুলিয়ে যায় সব। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই গুলিয়ে দেয় অমন। একে তো রাজনৈতিক বন্দীদের সুযোগ সুবিধে অনেক, তার ওপর বড় কথা ইজ্জৎ। বন্দী হলেও রাজবন্দী, বন্দীকুলে রাজা বিশেষ। তা এ-সুযোগ সুবিধের কথা থাক, চাইলেই যে সব মিলবে সকলের তা নয়, কিন্তু ওই ইজ্জতের জন্যই অনেকে ওই পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে চায়। সরকার ললাটে তেমন জয়টীকা দেন নি, জেলকর্তৃপক্ষও স্বীকার করছেন না, কিন্তু তাতে কি। তাঁরাই কি সব নাকি! সহবন্দীরা নেই! সেপাই শান্ত্রী নেই! তাদের চোখেও যদি একটু শ্রদ্ধার ভাব ফোটে! এ জেল-জীবনে তাই বা কম কিসে! তা ওই সুবাদে কৌতুকবহ সব দৃশ্য দেখা যায় সর্বদা। শোনা যায় মজার মজার কথা সব।...

আমাদের ওয়ার্ডের অন্যতম ভলানটিয়ার রামবালি যাদব। বেঁটে খাটো বেশ বয়স্ক মানুষ। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া না কোথায় যেন বাড়ী। জেলে এসেছে এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে বাসন চুরীর অপরাধে। কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম হ্যাঁরে রামবালী, জেল থেকে তোর ছুটি মিলবে কবে? সে বললে, যব আপলোগোকো ছুটি মিলেগা বাবুজী। কি রকম? আমাদের ছুটির সঙ্গে তোমার ছুটির কি সম্পর্ক বাপধন? কি ও নেহি বাবুজী? হাম সব তো একহি লড়াইকা ময়দানমে কন্ধে কাঁন্ধা মিলা কর লড়রহা বাবুজী! ওর কথা শুনে একটু রাগ মতনই হলো, বেটা ছিঁচকে চোর, গৃহস্থের থালাবাসন চুরী ক'রে জেলে এসেছে, আর বলে কিনা আমাদের কন্ধে কাঁন্ধামিলাকর লড়ছে! তা তার পরের কথায় তো আক্কেল একেবারে গুড়ুম হবার দাখিল! বাবুজী, হর

আদমী তো বরাবর হ্যায় তুনিয়ামে, না কিয়া? ইহ সমাজ গন্ধা হ্যায়, হরচীজ আমীর আদমী কো লিয়ে, গরীব 'কো কৈ দেখতা নেহি, গরীবকো কুছ মিলতা নেহি, উস্‌লিয়ে তো হাম চোরি করতা হু ̐! সমাজকো বদল্‌না চাতাহু ̐। আপভি তো ওহি চাতে হেঁ বাবুজী, না কিয়া?···শোন প্রিয়া—বাসন চোরের বচন শোনো! তবু তো বঙ্কিমের 'বিড়াল' পড়েনি বেটা। তা এহেন রামবালীকে নন্‌পলিটিক্যাল পর্য্যায়ে ফেলা কি চারটি খানেক কথা! তুমি বল!···

শ্রীমান গোলাপ সিং একজন লাইফার। অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী। তু'তুটো মানুষ খুনের অপরাধে সাজা ভোগ করছে এখন। এরও বাড়ী উত্তরপ্রদেশে। মাঝবয়সী মানুষ। দোহারা গড়ন। এমনিতে বেশ সরল, সর্বদা হাশি-খুশী। কথাবার্তায় ভাল মানুষ বলেও মনে হয়। তা তু'তুটো হত্যাকাণ্ডের এনায়ক গোলাপ সিংও কি আশ্চর্য্য তার কৃতকর্মের কেমন এক সুন্দর রাজনৈতিক ভাষ্য দেবার চেষ্টা করে! হাপনাকে কি বোলব মাষ্টারবাবু এ বড়লোক জাতটাই একের নম্বর হারামী আছে। টাকার পেট মোটা কুমীর শালারা, লেকিন গরীবের কোথা ভাববে না! আদমী ভুখা মরবে, তবু শালারা একটা পয়সাও ছাড়বে না! কোতো বোঝালাম, ভিখ্ মাঙ্‌লাম, তা হামার নিজের লিয়ে নয় মাষ্টারবাবু একটা বোড়ো গরীব পরিবারের জন্য, বাপটা ম'রে গেল, রোজগার বিলকুল বন্ধ, তুদিন পেটে দানাপানি নাই, হাপনাদের বাঙ্গালী পরিবারই, কিন্তু শালা শুনলেনা, আঁখ দেখালে, ফোনে পুলিশ ভি বোলাতে উঠল, তা দিলাম শালাকে 'রামনাম সত্ হ্যায়' শুনিয়ে। তা ওই একটাতেই কাম হাঁসিল হয়ে যেতো, ওই-ই শালা মালিক তো, কিন্তু বরাত মন্দ বেটা তুবের, শালা চামচা, মুনিবকে বাঁচাতে এসে ব্যস, বেটাকেও খতম ক'রে দিলাম। তারপর শালার ড্রয়ার থেকে সারা দিনের পেট্রল বেচা টাকা সব লিয়ে তুখী পরিবারটাকে

দিয়ে সোজা চলে গেলাম থানায়, সারেণ্ডার করলাম, পাকড়ো হামাকে দারোগাবাবু হামি খুনী হ্যায়··তবে তো আজ হামাকে এমন জেলে দেখছেন মাষ্টারজী, নেহি তো, হামি তো এমন ছিল না, গরীব আদমীর কোথা ভাবতুম বলেই তো এমন হাল হলো হামার··· এমন নবীন হুডের উত্তরপ্রদেশীয় সংস্করণকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করবে তুমি প্রিয়া ? পলিটিক্যাল ? না নন্‌পলিটিক্যাল ?

আমাদের ওয়ার্ডের ঠিক পাশেই 'ছাতা কামান'। অর্থাৎ ছাতার কারখানা। তা সেখানে কাজ করে আর এক লাইফার। নাম আব্দুল। হাওড়ার ছেলে। আমতার ওদিকে কোথায় যেন বাড়ী। ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্বামীকে সাবড়ে দিয়ে এখন এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বসবাস করছে। তা সেও কেমন কথায় কথায় সবাইকে কমরেড্ কমরেড্ বলে সম্বোধন করে। মাঝে মাঝে 'লাল সেলাম'ও জানায় কাউকে কাউকে। আমাদের কলতলায় প্রায় রোজই খাবার জল-টল নিতে আসে। দেখা হলে আমাকে অবশ্য আদাবই জানায়। কথায় কথায় একদিন একটু দুঃখপ্রকাশ গোছের করেছিলাম সারাজীবনটাই এমন বরবাদ ক'রে দিলি আব্দুল ? কেন অমন করলি ভাই ? তা ও কি বললে জান ? একটু চুপ করে থেকে বিনয়ের সঙ্গেই বললে—কিন্তু কোরবানি না দিলে কি কোন বড় কাজ হয় দাদা ? একটা কাঁটাকে তো উপড়ে ফেলেছি সমাজ থেকে, ব্যস আমার কাম ফতে। তাই দুঃখ কিছু নেই দাদা··· এর পরে কোন দলে ফেলব আব্দুলকে বল ? একটা খটকা মতন লাগেই তো এমন কথা শুনলে। কিন্তু জেল রেকর্ডে ওর বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগ ডেকয়টি এ্যাণ্ড মার্ডার। ও নিছক ননপলিটিক্যাল কনভিক্ট। জাষ্ট এ লাইফার।···

বংশীলাল নামে ছেলেটা আবার আর একরকমের প্রশ্ন তোলে। বংশীলাল বাঙালীর ছেলে। পদবীতে দত্ত। চীৎপুরের ওদিকে বাড়ী। কিন্তু কথায় কেমন হিন্দীর টান। সংসর্গ দোষেই বোধ হয় হয়েছে

অমন। কথাবার্তাও কেমন অশালীন। ওয়াগন ভাঙ্গার দায়ে জেলে আছে ক'বছর। একদিন কথায় কথায় বললে আপনারা বেকারই চেল্লাচ্ছেন কাকাবাবু, এশালা দেশের কেউ কুছু করতে পারবে না। তামাম দেশটা শালা গোল্লায় গেছে। বিলকুল সেই শিবের অসাধ্যি মেরে গেছে। এই আমার কেসটাই দেখুন না। যেদিন কাম কারবার ছিলনা, দোরে দোরে নোকরীর জন্য পাক মারছিলাম। ভদ্দর আদমীর মত বাঁচতে চাইছিলুম, কোন শালা দেখেনি। কত দিন যে শালা স্রেফ্ পানি ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি তা আর কি বলব কাকাবাবু। কিন্তু তামাসাটা দেখেন, যেই শালা মেহনৎ করে জানের রিক্স্ নিয়ে দু'পয়সা কামাতে শুরু করলাম অমনি সব শালার বুক জ্বলুনি স্টার্ট করল। ব্যস, চাদ্দিকে অমনি লেগে গেল গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর। শেষে শালা টিকটিকি লাগিয়ে দিলে পেছনে। তা ও টিকটিকি শালাদেরও তো মালকড়ির বখরা দিচ্ছিলাম। নইলে কি শালারা কাজ কাম করতে দিত একরোজও। তবে শালা একদম চুতিয়া তো, এমনিতেই শালাদের খালি খাই খাই, বেটাদের পেট তো নয় একেবারে প্যাসিফিক ওশান, অলওয়েজ বেশী মাল ঝাড়বার তাল, তার ওপর আবার লাগানি ভাগানি খেয়েছে তো বলতে লাগল ঔর দেও ঔর দেও, রাগের মাথায় শালাদের শুনিয়ে দিলাম একদিন, আহা মরে যাই চাঁদবদন আমার, আমি করব মেহনৎ, আর তুমি শালা মুফৎসে মাল লুটবে! কভি নেহি, ব্যস খেল খতম, শালারা এই জেলে ভেজে দিলে। তাই বলছিলাম কাকাবাবু, ফালতু কোশিস করছেন, হোবে না এশালা দেশের কিছু হোবে না, সব শালা হারামী টপ্ টু বেলবটম্…তা যেভাবেই কথাগুলো বলুক বংশীলাল, কথাগুলোর মধ্যে যে কিছু সত্য নেই, কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত নেই, চিন্তনীয় কিছু বিষয় নেই একেবারে, তা তো নয়। অন্ততঃ জাত ক্রিমিন্যালের দলে ওকে ফেলা খুব সহজ নয়।…

এদের মত আরও অনেকে আছে এ জেলে। কারো কারো কথাবার্তা আবার কম বেশী একেবারে শহীদ মিনার মার্কা। আর তার কতটুকু যে খাঁটি আর কি পরিমাণ যে ভেজাল তা ওপর ওপর দেখে আর দু'দণ্ডের আলাপে বুঝতে পারবার মত অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাজন আমি অন্ততঃ নই। তাই বলছিলাম বন্দীদের জাতবিচার তেমন নিছক সহজ সরল বস্তু নয়। তাই সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষকৃত শ্রেণীবিভাগটা মেনে চলাটাই এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্ঝঞ্ঝাট পন্থা।...

অ-রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে আবার একটা বাড়তি সমস্যাও আছে। এদের কার যে কি অপরাধ তা অনেক ক্ষেত্রেই বোঝবার কোন উপায় নেই। একে তো নিজের দোষ বড় কেউ স্বীকার করে না, সবাই একরকম গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা। কপাল দোষেই সাজা পাচ্ছে এমন। কোন কোন ক্ষেত্রে যে এমন হয় না, হতে পারে না, তা নয়। রামের দোষে শ্যামের সাজা হয়, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপে, হয় এসব, হতে পারে। আবার নিছক ফাঁসিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রেই ফেঁসে যায় অনেক নির্দোষ লোকও। এসব যে জানিনা তা নয়। কিন্তু এতগুলি জেলবাসী কয়েদীদের সবাই নিরপরাধ, নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্যে বেগার খাটছে এখন, এমন কথাটা তো আর সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ আশ্চর্য্য দেখ পি, সি, বা পোলিশ কাষ্টডি নয়, কোর্ট কাছারিও নয় যে সাজা এড়াবার জন্যে মিথ্যে বলবে। জেলেই আছে ওরা, আমরাও তো তথৈবচ, সেক্ষেত্রে সত্যের অমন অপলাপ কি কারণ! কেউ কেউ আবার বেশ কায়দা ক'রে জবাব দেয় কেস্ কানেকশান। অর্থাৎ ঘটনার প্রকৃত সঙ্ঘটক সে নয়, না, না, জ্ঞানগম্যিও বিশেষ কিছু নেই ঘটনা সম্বন্ধে, তবে মন্দভাগ্য তো, তাই ওই ঘটনার সূত্রেই এমন টান মেরে আচমকা এনে ফেলেছে এখানে।...

এইসব দেখেশুনে মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো?

মনে হয় অপরাধের প্রতি অতিবড় অপরাধীরও বোধ হয় একটা সহজাত অবজ্ঞা মতন ভাব থাকে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা না হোক, একটা লজ্জাবোধ থাকে। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে তাই বড় কেউ বলতে চায় না, বলতে পারে না, হ্যাঁ, দুষ্কর্মটা করেছিই তো! যদি কেউ বলে দৈবাৎ, বলতে বাধ্য হয়, তাহলেও ওই অপরাধ বোধটার দংশন থেকে আত্মরক্ষার জন্যই সে একটা রুচিসঙ্গত, সুন্দর, মহৎ কোন তত্ত্বের প্রলেপ মাখিয়ে তাকে জনসমক্ষে পরিবেশনযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়। তবে ব্যতিক্রম কি নেই? আছে। এই জনাব ইউসুফ আলি। এও বোধহয় লাইফার। কথাটা উঠতেই একরকম বুক বাজিয়েই বললে মিছা বলব না হুজুর, মানুষটা আমি একেবারে যাচ্ছেতা'ই। এমন খারাপ কাম নেই দুনিয়ায় যা আমি করিনি। কত কেচ্ছা আর শুনবেন হুজুর। তবে শালা টিকটিকির সাধ্য হয়নি কখনও আমাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পায়। শেষটায় হুজুর ফেঁসে গেলুম মাথা গরম করে। ক্রোধ চীজটা যে কত খারাপ তা বুঝলাম পরে, কিন্তু তখন তো হুজুর কেসটা আর আমার হাতে নেই, বেমালুম ফস্কে গেছে। কেনরে বাপু অমন মাথায় আগুন চড়াতে গেলি! তুই নিজে শালা এমন কোন্ পয়গম্বর ছিলিস্। মেয়েছেলে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি কি তুই নবাবের বেটা কম করেছিস্? তা তুই শালা পরের বিবিতে নজর দিবি, আর তোর ঘরকে কেউ হাত বাড়াবে না? খোদার দুনিয়ায় এমন কখনও হয়! তা হুজুর ওই যে বললাম মাথায় কেমন আগুন চড়ে গিইছিল চক্ষের সামনেই পড়ল তো দেশ্যটা, ব্যস, রামজান বেটাকে দিলাম একেবারে খতম ক'রে আমার ঘরের ভিতরেই। বিবিটাকেও দিতাম হাফসে, কিন্তু মাগী পাইলে বাঁচল···কেমন সহজ সরল স্বীকারোক্তি দেখ। তা এমন মানুষও আছে বই কি এক আধজন। তবে ওই যা বলেছি, এরা ব্যতিক্রম।

তবে এ জেলে নন্‌পলিটিক্যাল প্রিজনারের চাইতে হরেদরে

বোধকরি পলিটিক্যাল প্রিজনারের সংখ্যাই বেশী। কতগুলো ফাইল তো একেবারে মার্কা মারা। কংগ্রেস ফাইল, সি, পি, এম ফাইল, সি, পি, আই, এম, এল অর্থাৎ নকশাল ফাইল, এগুলো তো সর্বজন পরিচিত রাজনৈতিক বন্দীদের আবাসস্থল। কিন্তু ঠিক তেমন কোন দলের নামাঙ্কিত ফাইল নয়, বাসিন্দারা সবাই কিছু এক মতাবলম্বীও নয়, এমনকি তাবৎ বন্দী রাজনৈতিক বন্দীরাও নয়, এমন পাঁচ-মেশালী ফাইলও আছে কয়েকটা। তার ওপর আমাদের এ গোরা ডিগ্রি আপাততঃ নির্ভেজাল রাজনৈতিক ওয়ার্ড'ই। তবে এক অর্থে এ ও পাঁচ ফুলের সাজি। কারণ বিভিন্ন দলের মানুষ আমরা, মনান্তর না থাকলেও আমাদের মধ্যে মতান্তর আছে।

তা ও-মতান্তর নেই কোথায় বল? আমাদের দেশের রাজনীতি এক অর্থে প্রায় অনির্বচনীয় বস্তুই তো, না কি? মজা দেখ সবাই আমরা দেশের ভাল চাই, দেশের কল্যাণ চাই, তবু আমরা কত দলে বিভক্ত! অনেক সময় আমিই তোমাকে রহস্য করে বলেছি আকাশে কত তারা এ প্রশ্নের যদিও বা কেউ জবাব দিতে পারে, এদেশে কতগুলো রাজনৈতিক দল এ জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না। কারণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন কোন জ্ঞান না থাকলেও মোটামুটি মনে হয় তারা যত অগুনতিই হোক, সংখ্যাটি স্থির, নিত্যি নিত্যি বদলাচ্ছে না, কিন্তু রাজনৈতিক দলের বংশবৃদ্ধি রোধের তো কোন ব্যবস্থা নেই,তাই দিনে দিনে হরেক-রকম দল উপদল গজাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতের গর্ভেও কত ভ্রূণ যে বাইরের বাতাস আলো দেখবার জন্য আকুল-ব্যাকুল করছে তারও স্থিরতা নেই। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বেশ একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছে। কোথায় আকাশ ভরা তারা আর কোথায় দেশ ভরা এই দল-উপদল! কিসে আর কিসে! উপমাটা নিতান্তই কষ্টকল্পিত বই কি! তা বলেছি তো, রহস্যচ্ছলেই কথাটা তুলেছি। কিন্তু এটুকু তো মানবে দলের সংখ্যা সত্যিই বড় বেশী! আর সেই

মতান্তরের জন্যই তো মহা মহা মানুষেরা ভিড়েছেন অমন নানান দলে!

ওই মতান্তরের পথ বেয়ে যদি আসত কেবল ভিন্ন ভিন্ন দলগুলো তাহলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তা তো নয়। ও-মতান্তর একটা দলের মধ্যেও আবার নানারকম উপদল ও গোষ্ঠির সৃষ্টি করেছে। গ্রুপ, ফ্রন্ট, ফোরাম, লবি, মঞ্চ, প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর আমদানি হয়েছে। তা ও-বাইরের রাজনৈতিক চরিত্র এ জেলের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। এক একটা দলের নামেই ফাইল, কিন্তু ভিতরে কত দলাদলি, যদিও এমনিতে ওপর ওপর বেশ গলাগলি। আর ওই দলাদলির জন্যই আবার স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন ছাড়াও একই নামে বিভিন্ন ফাইল: এই ধর কংগ্রেসী ফাইল। সকলেই কংগ্রেসী বলে নিজেদের পরিচয় দেন। সকাল সন্ধ্যে দলগত শ্লোগান আওড়ান। প্রধানমন্ত্রীর জয়ধ্বনি দেন। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর 'কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও' ব'লে আওয়াজও তোলেন। পার্টি পতাকাও ঝুলিয়ে দিয়েছেন জানালা দিয়ে। তবুও ওঁদের ভিন্ন ভিন্ন ফাইল। বিভিন্ন দাদাদের প্রতি গোষ্ঠীগত আনুগত্যের দরুণই অমন দলের মধ্যে উপদলীয় ভাগ বাটোয়ারা। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ফাইল থেকে ও গোষ্ঠীবিতাড়ন প্রভৃতিও সংগঠিত হয়। তা আপাতদৃষ্টিতে যদিও দাদা-ঘটিত ব্যাপারই বটে, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানেন ওখানেও সেই মতান্তরের প্রশ্ন, লবির প্রতিদ্বন্দ্বীতা। তবে এদিক থেকে অধিকতর শোচনীয় অবস্থা শুনেছি নকশালদের। একটা চিহ্নিত বড় ফাইল আছে বটে কিন্তু সেখানেও শুনেছি মনে মনে এক একজন প্রায় এক একটি দ্বীপবাসী। ওঁদের নানা মত, তাই নানা উপদল। তবু তো ওঁরা একই ছাদের তলায় বাস করেন। কিন্তু আরও অনেক নকশাল নেতা ও কর্মী আছেন যাঁরা ও ফাইলেই থাকেন না, থাকতে চান না, অন্যান্য ফাইলে আরও অনেক রকমের

বন্দীদের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। তবে তাঁদের পরস্পারের মধ্যেও মতের পথের পার্থক্য নেহাৎ কম নয়। এমন কি একে অপরকে নকশাল বলেও মানতে চান না অনেক সময়। মোটের ওপরে এখানেও সেই মতান্তরেরই মহান রাজ্যপাঠ। এক সি, পি, এম ফাইলেই ঠিক এ জাতীয় চিত্রটা চোখে পড়ে না। ওঁদের মধ্যেও নিশ্চয়ই গোষ্ঠীবাদ-টাদ আছে, কিন্তু বহিরঙ্গে তেমন কিছু আপাততঃ পরিস্ফুট নয়। আর ওঁদের একটাই ফাইল, আছেনও বোধ হয় সাকুল্যে জনা বাটেক লোক। আর অন্যান্য দলের কর্মী যাঁরা এ জেলে আটক আছেন তাঁদের সংখ্যা বস্তুতঃ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র ফাইল টাইলের প্রশ্নও তাই ওঠে না।…

সব জেলের মত এ প্রেসিডেন্সী জেলেও তাবৎ বন্দীদের আবার আর একদিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ইউ, টি বা আণ্ডারট্রায়াল অর্থাৎ বিচারাধীন এবং কন্‌ভিক্ট অর্থাৎ বিচার সমাপ্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী বা মেয়াদী। ওই মেয়াদীদের নিয়ে এমনিতে কোন ঝামেলা নেই। কোর্ট কাছারি হয়েছে, যথারীতি বিচার পর্ব শেষ হয়েছে, যার যেমন অপরাধ তার তেমন সাজা হয়েছে। ঘটনাচক্রে লঘু-পাপে গুরুদণ্ড বা গুরুপাপে লঘুদণ্ড কিছু হয়েও থাকতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে। তা সে যেমনই হোক, মোদ্দা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিকারের সমস্যা ওই অসংখ্য ইউ, টি, বা বিচারাধীন বন্দীদের নিয়ে। রবিবারটা বাদ দিয়ে, কিংবা অবশ্য পালনীয় অন্য কোন ছুটির দিন ছাড় দিয়ে প্রতিদিনই সাত সকালে ফাইলে ফাইলে জেল-অফিসের লোক ছোটে নাম লেখা স্লিপ হাতে ক'রে, হেঁকে হেঁকে কাদের কাদের কোর্ট আছে পড়ে পড়ে শোনায়। তারপর দশটা সাড়ে দশটায় সার বেঁধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হাতকড়া পরেও বন্দীরা সব জেল গেটের বাইরে গিয়ে সেই কিম্ভূৎকিমাকার আলোবাতাসহীন পুলিশ ভ্যানে চেপে জন্তু জানোয়ারের মত গাদাগাদি করে কোর্টে যায় আর কম পক্ষে রাত

সাড়ে সাতটা আটটায় ওই ভ্যানে ক'রে অমনি ভাবে এসেই আবার বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে সব জেল গেটের ভেতর সেধোয়। কি? না দিন পড়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছরও ওই শুধু একটা সামনের দিন শোনবার জন্যই কত শত লোক অমন না নেয়ে না খেয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গোটা দিনটা অতিবাহিত করছে।...

সত্যিই প্রিয়া, সব দেখে শুনে কেমন তাজ্জব ব'নে যেতে হয়। এই আমাদের ভলান্টিয়ারের কথাই তোমায় শোনাই। লোকটার নাম রামেশ্বর রাজবংশী। কিন্তু সবাই পালোয়ান বলে ডাকে। দেশ বিহারের গয়া জেলায়। পালোয়ান এ জেলে আছে প্রায় এক সাল। কিন্তু এখনও ও সেই ইউ, টি। কি অপরাধ? না, কোন্ বাসনের দোকান থেকে নাকি দুটো এ্যালুমিনিয়ামের থালা উঠিয়ে নিয়ে ভেগেছিল ও। তা অমনটা ও করেছিল কিনা তা জানে ও আর ওর ভগবান। কিন্তু ধর যদি ওর অপরাধ প্রমাণিতই হয় তাহলে ওই দুটো থালার কল্যাণে কতই আর মেয়াদ হবে ওর? আমি আইনজ্ঞ নই, তবে কমন্‌সেন্সেই তো শুনেছি সব আইনের মর্মভূমি, তা অমন অপরাধে নিশ্চয়ই ওর মাস খানেকের বেশী মেয়াদ হতো না। কিন্তু বাকী মাস এগারো যে সে বাড়তি জেল ইতিমধ্যেই খেটে ফেলেছে তার কি হবে? তবুও তো ওর বিচার হয়নি এখনও, কেবল 'দিনের' পালাই চলছে, এতাবৎ কাল তাহলে সেই বাকী ভবিষ্যৎ জেলবাসের দিনগুলোও? সবই ফাও? তার-পর ধর এমনও তো হতে পারে শেষ পর্যন্ত ও অপরাধটা প্রমাণিতই হলো না, হাকিম বেকসুর খালাস দিলেন, তখন? এই এতদিনের মিথ্যে জেলবাসের খেসারৎটা তখন কে দেবে বল? আমি জানি কেউ কোন খেসারৎ দেবে না, দেবার কথাই উঠবে না, এমন যে একটা কথা হতে পারে তা-ও কেউ ভাববে না। সত্যিই তো, ইনভেস্টিগেশন তার

মাননীয় বিচারক যথাকালে যথাযোগ্য রায় দেন, সবই সময়-সাপেক্ষ, আইন মাফিক। কিন্তু মাঝে পড়ে পালোয়ানের মত মানুষরাই পড়ে বিপাকে, মারা পড়ে বেঘোরে। দেশে ঘরে ওর বৃদ্ধা মা আছে, স্ত্রী আছে, নাবালক পুত্র কন্যা আছে, আছে সীমাহীন দারিদ্র্য। কলকাতায় থেকে মুটে মজুরী ক'রে যা কিছু পেতো, তার থেকে যথাসম্ভব যা পাঠাতো, তাতেই কায়ক্লেশে ওর পরিবারের চলত। আজ একশাল কাল তাও বন্ধ। বেচারী জানতেও পারে না ওর বাড়ীর সব কেমন আছে। আছেই কিনা আদপে। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে তাদের কথা বলে, আর চোখের জল ফেলে।…বড় কষ্ট হয়। কিন্তু কি করব বল? কি করতে পারি আমি! এক অর্থে আমি তো ওর চাইতেও অসহায়! ওর তো তবু যেমনই হোক কেসের 'দিন' আছে, কিন্তু আমার সম্বল তো কেবল সেই প্রকৃতিদত্ত দিন যার পর প্রত্যহ রাত আসে।…

তা ও-পালোয়ানের মত দুরবস্থা এ জেলে অনেকেরই। দিনের পর দিন দিন পড়ছে, সারাদিনে কয়েক মিনিট কেসটা উঠছে কি না উঠছে, ব্যস, আবার দিন। লম্বা লম্বা ব্যবধানে দিন। এমনি চলছে তো চলছেই। পাঁচ বছর, ছ'বছর, সাতবছর। শুধু ওই দিন আর দিন। রাজবন্দীদের বেলাতেই বিশেষ করে অবস্থাটা এমন যারপর নাই ঘোরালো। কবে যে ফয়সালা হবে, আর কীভাবেই যে ফয়সালা হবে মামলাগুলোর, তা বোধকরি সর্বজ্ঞ সেই পরমাত্মা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু একটা জিনিষ যা সবাই দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখতে পায়, ভুক্ত-ভোগীরা অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সতত যা সত্য বলে উপলব্ধি করে, তা হলো বছরের পর বছর এই বিরতিহীন কারাবাস।

কিন্তু ওই মেয়াদী আর বিচারাধীন বন্দী ছাড়াও অন্য আর এক রকমের বন্দীও এখানে আছেন। তা ওঁরা আছেন বোধকরি কম বেশী আজ ভারতের সব জেলেই। ওঁরা হলেন মিসায় আটক, অর্থাৎ

বিনা বিচারে আটক বন্দী। তা হয়ে দরে অনেক মানুষই এজেলে ওই মিসা বন্দী। তা মিসারও যেমন দিনে দিনে রকমফের হচ্ছে, নিত্যনূতন বন্ধনী সূত্রগুলোকে নিশ্ছিদ্র করে পাকানো হচ্ছে, মিসা-বন্দীদেরও অন্নবিস্তর তেমনি প্রাসঙ্গিক প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে। আর লক্ষ্য করবার বিষয়, ও মিসার ক্ষেত্রে সেই রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক ভেদভাব কিছু নেই, পুরুষ নারীর প্রভেদও নেই, এ একেবারে সার্বজনীন ব্যবস্থা। মাথা গুনতিতে অবশ্য মিসায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীই অনেক বেশী। অথচ দেখো কর্তা-ব্যক্তিদের মুখে কতবার এই মিসা প্রসঙ্গে শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি, না, না, ও রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের জন্য এ মিসা নয়, কক্ষনো নয়। তা-ও কখনও হয়? এ তো শুধু সমাজবিরোধী গুণ্ডা বদমাসদের জন্য।...তা হবেও বা। অভাজন আমরা, হয়তো বা বৃথাই বিতর্ক তুলি। আসলে আমরা ভ্রান্তিতে ভুগি। সর্পকে রজ্জু ভেবে সমাদর দেখাই। অস্থানে সহানুভূতি পেশ ক'রে অমার্জনীয় অপরাধ করি। সে যাই হোক, ও মিসায় অনেকে কিন্তু অনেককাল ধরে আটক আছেন এখানে। তিন বছর চার বছরও আছেন কেউ কেউ। এমন কি ও শাসক কংগ্রেস নামাঙ্কিত ফাইলেও,—নিয়মিত প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রীর জয়ধ্বনি মুখরিত ফাইলেও—দু'তিন বছর মিসায় আটক রয়েছেন এমন বন্দীর সংখ্যাও অনেক। সত্যিই আশ্চর্য্য নয়, প্রিয়া?

সম্প্রতি এই মিসারই আবার এক মাসতুতো ভাই গোছের আইন হয়েছে। "কনজারভেশান অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ এ্যাণ্ড প্রিভেনশান অফ এন্টি স্মাগলিং এ্যাক্ট।" সংক্ষেপে কাফোপোষা। জেলের আরও সংক্ষিপ্ত পরিভাষায় 'কাপোষা'। তা ও-কাপোষাও এখানে অনেক আছেন। বড় বড় কোটিপতি রুই কাতলা থেকে শুরু করে সামান্য কয়েক হাজারী চুনোপুঁটি পর্যন্ত। মাড়োয়াড়ী, সিন্ধী, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান,—সে এক মহাভারতীয় মহামিলন ক্ষেত্র।

দু'তিন বছর থেকে শুরু ক'রে সবে মাত্র ক'দিন হলো জেলের অধিবাসী হয়ে আছেন সব। মাঝে মধ্যে নতুন নতুন আমদানীও হচ্ছে। তা ও-কাপোষাদেরও পাশাপাশি ছুটো বড় বড় ফাইল। বড়সড় এবং মাঝারি ব্যবসাদার ও বিত্তবানেরা বোধকরি প্রথম ফাইলে থাকেন। বাকি ঝড়তি পড়তিদের স্থান বোধহয় দ্বিতীয়টায়। বাইরে থেকে দেখলেও তাই মনে হয়। তবে কম বেশী বিত্তবান মানুষই তো সব, অনেক আরামে অভ্যস্ত তো, অনেক বিলাস ব্যসনে রপ্ত তো, এখানে এসে এই জেলের প্রায় সাধারণ কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট কষ্টক্লিষ্ট জীবনের জন্য ওঁরা হাহুতাশ করেন। তাছাড়া, স্মাগ্‌লার বলে জেলের অনেকেই, বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীরা যে ওঁদের খারাপ নজরে দেখেন, ভাবে ভঙ্গীতেও হেয়জ্ঞান করেন, এটাও ওঁদের মনোকষ্ট বাড়ায়। কিন্তু অবস্থার সঙ্গে অনেকখানি মানিয়ে নিয়েছেন ওঁরা। নিতে পেরেছেন। আর এখানে থেকেও যতটা সম্ভব তার চাইতেও বোধকরি বেশী আনন্দ ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। বিজলী পাখা, হিটার, ট্রানজিস্‌টার, রেকর্ড প্লেয়ার, সবই আছে ওঁদের ফাইলে। বাড়ী থেকে সকাল সন্ধ্যে ভারে ভারে খাবার দাবার আসছে, এন্‌তার ফলফুলুরি আসছে, টিন টিন কেক বিস্কুট, মাখন আসছে। শুনেছি আসছে আরও অনেক চোষ্য লেহ্য পেয় বস্তুও—জেলে যা একেবারেই নিষিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রাতদিন তাস দাবা চলছে। এন্‌তার ইনটার ভিউয়েরও বন্দোবস্ত হয়েছে। আর এ সবই হচ্ছে শুনেছি ওঁদের বিত্তের দৌলতেই। চিত্তে যাঁর যাই থাক, ওঁদের বিত্তে যারপর নাই আসক্তি আছে দেখছি অনেকেরই। মাছির মত সর্বদাই ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ করে অনেকে তাই ওঁদের কাছে। আর ওই কাপোষাদের দৌলতেই যে সাধারণ কয়েদীরাও অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করছেন, অনেক বাড়তি সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন, এমন কথাও অনেকে বলছেন। অর্থাৎ ওঁরা কড়ি দিয়ে জেলের মধ্যেও যা সব কিনেছেন, কিনছেন, নিঃখরচায় বাকী বন্দীদেরও তার

কিছুটা জুটে যাচ্ছে। জেল প্রশাসন তো আর প্রকাশ্যে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার করতে পারেন না, তাই।

আর এ জেলে আছেন কিছু অধুনা বে-আইনী ঘোষিত সংস্থার কর্মীরাও। তা এ বে-আইন সংস্থাগুলির মধ্যে সি. পি, আই, এম, এল, ও অবশ্য আছেন। ওঁদের তো ডজন খানেক দল-উপদলের ওপর সরকার ব্যান লাগিয়েছেন। তা ওঁরা তো অনেকে পাঁচ ছয় বছর ধরেই এ জেলে আছেন। ওই ব্যান্-কারণে তাই কোন ইতর বিশেষ হয়নি তাঁদের। এ সূত্রে নতুন আমদানি হয়েছেন কিছু আর, এস, এস, কর্মী এবং আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী। এই আনন্দমার্গের লোকদের নিয়ে বেশ কৌতূহল এ জেলে। ইদানীং অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে তো এঁদের নামে। কাগজে, পোডয়োয়, নানান্ রকম খবর বেরুচ্ছে। মড়ার খুলি-টুলিওয়ালা ছবি-টবিও প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এঁদের চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে কিন্তু অনেকেরই তাক লেগে যাচ্ছে। খাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেশমী গেরুয়া বসন, দাড়ি গোঁফ সমন্বিত সৌম্যদর্শন হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, কণ্ঠে সুন্দর সুন্দর ভজন গান। চলনে বলনেও বেশ বিনয়ী, সংযত, মার্জিত, ভদ্র। বয়সও কারো তেমন বেশী নয়। যুবকই বলা চলে সকলকে। কথাবার্তায় মনে হয় বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। তবে এমনিতে তো বোঝবার উপায় নেই কিছু, তাবৎ সকলেই তো কোন না কোন 'আনন্দ', আর সন্ন্যাসী মাফিক দেশ ঘরের পাতা-টাতার পরিচয়ও কেউ দেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ওঁদের দলে কিছু অ-ভারতীয়ও আছেন। যেমন অস্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ান,—এসব আছেন। এমনকি শ্বেতকায়া পিঙ্গলচক্ষু এক বিদেশিনীও আছেন ওঁদের দলে। ঠিক কোন্ দেশী বলতে পারব না, কিন্তু দেখলে মার্কিনী মহিলা ব'লে মনে হয়। বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলা ফিমেল ওয়ার্ডেই বন্দিনী জীবন যাপন করেন। বাকী আনন্দমার্গীরা অবশ্য থাকেন সেলে। সরকারী হিসেবে ভয়ঙ্কর মানুষ তো সব!

কিন্তু প্রিয়া, এতকাহন ব্যাখ্যানের পরেও কিন্তু এ জেল-কাহিনীর কিঞ্চিৎ বাকি থাকে। অনুচ্চারিত থাকে তাদের কথা যারা বন্দী বন্দীনি বটে, কিন্তু কেন যে অমন তা তেমন উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকি—জেলেই যে আটক, তাও সব সময় বুঝতে পারে না।···

আগে জানতাম না। কেউ বলেও নি কাথাটা। সেদিন বিকেলে এক চক্কর ঘুরতে গিয়েই জানতে পারলাম ব্যাপারটা। সামনের রাস্তা ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক'জন ভেতর দিয়ে ওয়ার্ডে ফিরছি, একটা একতলাকার ফাইলের সামনে যেতেই থমকে দাঁড়াতে হলো। একটা অর্ধ উলঙ্গ ব্যক্তি অসম্ভব রকম কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে তারস্বরে গান ধরেছে,—বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেহি? ব্যস, একটা লাইনই সে ঘুরে ফিরে অমন গাইছে। কিন্তু সে-ও কিছু নয়। অন্ততঃ জনা পনের বিশ লোক, অমনি ছেঁড়া ময়লা পোষাক সব, মূল গায়েনের সঙ্গে নেচে দুয়ারকি করছে,- সঙ্গম হোগা কি নেহি? প্রথমটায় ভাবলাম—কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হলেও সাধারণ হুল্লোড়বাজিই হয়তো। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন খটকা লাগল। আমাদের অমন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অকস্মাৎ ওরা সবাই এসে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যেই যেন হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সেই নাচ গান শুরু করলে,—বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেহি? আর কোমরে মাথায় হাত দিয়ে বন্ বন্ করে সে কি উদ্দাম নৃত্য! হঠাৎ কোথা থেকে একটা সিপাই এসে আমার পাশে দাঁড়াল, হুজুর, ইহ লোগ পাগল হ্যায়। আমি তো অবাক—পাগল? হাঁ, জী, ইয়ে জেলমে দোশো পাগলভি রতা হ্যায়।···বোঝ অবস্থা। তা সেদিন সুপার সাহেবের কাছেই জানতে পারলাম সব। পাগল পাগলিনী মিলে—সবশুদ্ধ নাকি শ' আড়াই মতন আছে এ জেলে।

পাঁচ

আজ পনেরোই আগষ্ট। স্বাধীনতা দিবস।···

বিগত উনিশ শ' সাতচল্লিশের এমনি এক পনেরোই আগষ্টই ব্রিটিশ শাসন—শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ভারতবর্ষ। পৌনে দুইশত বৎসরের বন্দী রক্তাক্ত সূর্যের অস্তাস্তে অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষায় প্রোজ্জ্বল, সীমাহীন উদ্দীপনায় ভাস্বর, এক মুক্ত নবীন সূর্য উদিত হয়েছিল ভারত-ভাগ্যাকাশের পূর্ব দিগন্তে। আসমুদ্র হিমাচল স্বভাবতই সেদিন এক অভূতপূর্ব পুলকে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। তাবৎ মানুষের মনে প্রাণে এক নবীন উৎসাহ, এক অভিনব অনুপ্রেরণা এবং এক অনভ্যস্ত আত্মপ্রত্যয়ের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল! সবাই সমস্বরে দেশমাতৃকার বন্দনা গেয়েছিল বন্দেমাতরম্! জয়হিন্দ! জয়ভারত···

কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন সেদিনের সেই পনেরোই আগষ্ট, সেই স্বাধীনতা দিবস, অবিমিশ্র আনন্দের দিন ছিল না। ছিল না গ্লানিহীন, নির্দ্বন্দ্ববিবেক অকৃত্রিম আত্মপ্রসাদের দিন। ছিল না দেশ জুড়ে নিতান্তই এক উৎসবমুখর আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডল। সেদিন উৎসবের আলোকমালার পাশে পাশে জমাট অন্ধকারও ছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসও ছিল। অনেক বহ্ন্যুৎসবের, অনেক রক্তপাতের রক্তিমাভা ও ফুটে ফুটে উঠেছিল সেদিন স্বাধীন ভারতের আকাশে। দেশ বিভাগের অপঘাতের দ্বারদেশ দিয়ে সেদিন অনেক ক্ষয়ক্ষতি, অনেক দুঃখ, অনেক লজ্জা, অনেক ব্যর্থতার গ্লানিও এসে পৌছেছিল। আমরা অনেকেই সেদিন আদর্শ বিহ্বল, আশ্রয়চ্যুত, আর্ত, বঞ্চিত, সর্বহারা।

তথাপি অতি বড় দুঃখের মাঝেও আমরা সেদিন সোৎসাহে সোচ্চারে বন্দনা করেছিলাম সেই নবোদিত স্বাধীনতা সূর্যকে। ভগ্নবুকে নতুন উদ্দীপনার উদ্বোধন ব্রত নিয়েছিলাম।…

তারপর সুখে দুঃখে, আশা নিরাশায়, দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে, আলোয় আঁধারে এক এক ক'রে আঠাশটা বছর কেটে গেছে। ঘুরে ফিরে আজ আবার সামনে এসেছে সেই পনেরোই আগষ্ট। সেই স্বাধীনতা দিবস।

স্বাধীনতা দিবস, কিন্তু আমার স্বাধীনতা নেই। আমি মিসায় বন্দী।…

মাঝে মাঝে সত্যিই বিস্ময় বোধ করি নিজের অবস্থা ভেবে। দস্যু তস্কর নই, কোন কুকর্মের নায়ক-উপনায়ক নই, সমাজবিরোধী ব'লেও চিহ্নিত নই কোন মহলে, কোন অপরাধে অভিযুক্তও নই। নিতান্তই সংসারগত প্রাণ এক নিরীহ ভদ্রসন্তান। পেশাগত এক শিক্ষক মাত্র। সবাই জানেন সে কথা। কর্তা-ব্যক্তিরাও সকলে অবহিত এ সম্বন্ধে। তাঁদের বচনে আচরণে এতাবৎকাল প্রকাশও পেয়েছে সে কথা। তবে হ্যাঁ, রাজনীতির সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে আমার। আর ওই সুবাদে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও আমি যুক্ত। তা দলটির জন্মলগ্ন থেকেই অমন যুক্ত। আর দল বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত যখন, তখন দলের মতাদর্শ প্রচার করি সুযোগমত, মাঝে মধ্যে দলকে জনপ্রিয় করবার সাধ্যমত চেষ্টা করি। তা এমন কর্ম কি দুষ্কর্মের পর্যায়ভুক্ত প্রিয়া? আর ওই দল করবার অপরাধেই কি বন্দীজীবন যাপনে বাধ্য হতে হবে আমাকে? সত্যিই, এসব ভাবলে কেমন অবাক লাগে। দেশে যখন মতাদর্শের স্বাধীনতা আছে, অনেকগুলো দল আছে, দলীয় রাজনীতি আছে, এ সবের বৈধতাও সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে, এই ভাবেই নির্বাচন হচ্ছে, দলগুলো সরকারী সূত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রতীক পাচ্ছে, আইনসভায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত

ক'রে পাঠাচ্ছে, নির্বাচিত দলীয় সদস্যদের সংখ্যাগত শক্তির ভিত্তিতে দলীয় সরকার গঠিত হচ্ছে, সংবিধান সম্মতভাবেই এ সব চলছে, তখন একটা দলের সঙ্গে যুক্ত—মাত্র এই অপরাধেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্বাসিত হতে হবে একজন নাগরিককে? বিশেষ দলটাও যখন বৈধ? স্বীকৃত? সর্বভারতীয় দল হিসাবে সরকার কর্তৃক মর্যাদা-প্রাপ্ত? কি জানি প্রিয়া, দেখে শুনে কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি সংবিধানগত শব্দ নিয়ে খটকা বাঁধে, ভাল ক'রে যেন সব বুঝতে পারিনা।...

মাঝে মাঝে এপ্রসঙ্গে সরকারের উচ্ছেদের কথা শুনি। ইদানীং কথাটা বড্ড বেশী প্রচারিত হচ্ছে। তা ও-উচ্ছেদ শব্দটা এ প্রসঙ্গে আমার মনঃপূত নয়, সত্যি বলতে কি ঠিক বোধগম্যও নয়। উচ্ছেদ শব্দটার মধ্যে বলপ্রয়োগের প্রশ্ন আছে, জবরদস্তির স্পর্শ আছে। ও-শব্দটার সঙ্গে তাই স্বভাবতই সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক থাকবার কথা নয়। কথাটা তাই আমার বিবেচনায় এ প্রসঙ্গে অস্থানেই প্রযোজ্য,—শব্দের অপব্যবহারের একটি নিদর্শন মাত্র। তবে হ্যাঁ, একাধিক দল যখন আছে,—দলীয় রাজনীতি আছে,—সাধারণ নির্বাচন আছে, তখন সব দলই তো চাইবে অধিকতর জনসমর্থন লাভ ক'রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে। প্রতিটি দলই তো সুযোগ খুঁজবে নিজ নিজ ধ্যানধারণা অনুসারে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সংগঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? অপরাধটা কোথায়? পার্টি পলিটিক্স থাকবে, আর পাওয়ার পলিটিক্স থাকবে না,—এমন শশক-শৃঙ্গ দেখতে চাইবেন কোন্ মহাজন? তা-ও কখনও হয়! বরঞ্চ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, ও-পলিটিক্স আর পাওয়ার পলিটিক্স অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত বস্তু। বোধকরি একই চিত্রের এপিঠ ওপিঠ। একটু চোখ কান খোলা রেখে চললেই জিনিষটা মালুম পাওয়া যাবে। কিন্তু আসল সমস্যা এখানে নয়, প্রকৃত প্রশ্নও

এটা নয়। আসল সমস্যা হলো—প্রথমতঃ ওই পাওয়ার পলিটিক্সের পক্ষাপক্ষ নিয়ে, অধিকারগত ভেদাভেদের প্রশ্ন নিয়ে; দ্বিতীয়তঃ, রূপরেখা নিয়ে, রীতিনীতি নিয়ে।

তা প্রথমটির ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ভাবখানা এই,—আমি ও-সব করব, প্রয়োজন হলে প্রয়োজনের অতিরিক্তও করব, দরকারে ছল, বল, কৌশল, সবরকম জালই পাতব। কিন্তু তাই বলে তুমি? উঁহু, কক্ষনো না। তুমি কিছু করেছ কি সর্বনাশ হবে। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, হিমালয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, ভারত মহাসাগরে জলোচ্ছাস জাগবে। তাই বলছি, সাধু সাবধান, অনর্থ বাঁধিয়ো না। তা এমন ভাবের ওপর প্রভাব ফেলবে কোন্ যুক্তি বল? তাই ও নিয়ে কোন আলেচনা না করাই ভাল। কিন্তু ও দ্বিতীয় ব্যাপারটিতে আমার নিজস্ব কোন দুশ্চিন্তা নেই। তুমি জানো, আমি চিরদিন শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। যে পথ গণতান্ত্রিক, যে পথ সংবিধানমত, শান্তিপূর্ণ, আমি সেই পথেরই আত্মপ্রত্যয়সমন্বিত পথিক। জোর জুলুম, ঘৃণা, হিংসা,—এ সব আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই আমার ওই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীতার পথটাও সহজ সরল, জনগণের স্নেহ সিক্ত আশীর্বাদপুত এক প্রশস্ত রাজপথ। কোন গুপ্ত পথে, পিচ্ছিল পথে সশঙ্ক পদচারণায় আমি বিশ্বাসী নই, অভ্যস্তও নই। আর যে দলের সঙ্গে আমি যুক্ত, আমার জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে সেও আমার পূর্ববর্ণিত পথেরই এক নিষ্ঠাবান পথিক। এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলে আমি অন্ততঃ ও দলভুক্ত থাকতাম না। কারণ, এতাবৎকাল আমার রাজনৈতিক জীবনের জমার ঘরে তো কেবল শূন্য, শুধু লোকসান, তাই তালেবর ব্যক্তিদের মত বিবেকটাকে বাক্সবন্দী ক'রে পাটোয়ারী মিথ্যাচারে মাতবার কোন ইতিবৃত্ত থাকবার কথা নয় তার মধ্যে। মনে মুখে এক থাকবারই চেষ্টা করেছি আমি চিরকাল

সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, তুমি জানো। তাছাড়া, দলের মানুষ হয়েও, দেশকে দলের অনেক ঊর্ধে স্থান দিয়েছি আমি চিরকাল। আর ওই দেশের মুখ চেয়েই যে কখনও কখনও দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণও করেছি আমি, তাও তোমার অজানা নয়। সে যাই হোক, তবুও আজ পনেরোই আগষ্ট, আমাদের স্বাধীনতা দিবস। জেলে থাকলেও—এ দিনটিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বাগত জানাতে হবে, যথাসম্ভব মর্যাদা দিতে হবে। কারণ আমি আজ বন্দী বটে, কিন্তু আমার দেশজননী তো বন্ধনমুক্ত। তিনি স্বাধীন। আর এই পনেরোই আগষ্টই তো তাঁর বন্ধনমুক্তির দিন। তাই এ দিনটি তো সর্বত্রই, সর্ব অবস্থাতেই, আমাদের সকলের কাছেই একটি স্মরণীয় দিন বরণীয় দিন।

তা এই পনেরোই আগষ্টকে কেন্দ্র ক'রে ক'দিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল। নানারকম জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্যাইল থেকে প্রতিনিধিরা এই গোরা ডিগ্রিতে এসে মিলছিলেন। বিশেষ ক'রে আমাদের উপস্থিতিতেই জেলের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে একটাই কর্মসূচী গ্রহণ করবার কথাই সকলে ভাবছিলেন। সেই রকম বক্তব্যই রাখছিলেন সকলে। কিন্তু ওই সর্বজনসম্মত একটি অনুষ্ঠানসূচি বানানো কি চারটি খানেক কথা! বিশেষ ক'রে এই স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে! তবেই তো হয়েছে। একে তো 'নানা মুণির নানা মত' তার ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক রকম কেষ্ট বিষ্টুদেরই মাথাগুলো এক জায়গায় মিলেছে। সেক্ষেত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে মতের গরমিল হবে না!—সাধারণ একটা বস্তু নিয়েই অসাধারণ তাত্ত্বিক আলোচনা উঠবে না! পাগল নাকি! তাহ'লে আর দলীয় রাজনীতি নামক বস্তুটার বাহাদুরিটা আর রইল কোথায়! কিন্তু ইহ বাহ্য, আসলে বিতর্কটা পাকল মূল ব্যাপারটা নিয়েই। স্বাধীনতা দিবসটাকে নিয়েই প্রশ্ন উঠল। তা এক অর্থে

অস্বাভাবিকও নয় কিছু। এমন কিছু কিছু দলের মানুষ তো এখানে আছেনই যাঁরা এ স্বাধীনতাকে আমাদের মত এমন সাদা চোখে দেখেন না। তাঁদের তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ থেকে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তার ওপর অনেকেই অনেক কাল ধ'রে হয় বিনা বিচারে না হয় বিচারাধীন বন্দীরূপে এ জেলে আটক আছেন। মন মেজাজ তাঁদের তাই সঙ্গত কারণেই অনেকটা তিক্ত, তিরিক্ষি। স্বাধীনতা দিবসকে স্বাগত জানাতে, ওই সংক্রান্ত কোন উৎসবাদিতে মানতে এমনিতেই তাই তাঁদের বাধো বাধো ঠেকে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক কালের এই 'ইণ্টারনাল এমার্জেন্সী' ও তার আনুষঙ্গিক ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দৃষ্টিতে আজ আসন্ন পনেরই আগষ্ট দিনটির এক নতুনতর তাৎপর্য, তাঁদের সযত্নে লালিত বিশিষ্ট তত্ত্বটির অনুকূলে সন্দেহাতীত বস্তুস্থিতি। অতএব ও-গোড়াতেই গলদ, স্বাধীনতা দিবসটাই শব্দের অপপ্রয়োগ। ব্যস, বেঁধে গেল তুলকালাম কাণ্ড! অবশ্য সংযত সহনীয় ভাবেই। সবাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তো!...

আমরা ক'জন শুরু থেকেই সতর্ক ছিলাম। না, না, ওসব চলবে না, কিছুতেই না। স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসই। ও-ব্যাপারে কোন আপোষ নেই। দিনটাকে মানবো, আর দিনটার ঐতিহাসিকতাকে মানবো না, ঐতিহ্যকে স্বীকার করবো না,—এ কেমন কথা! আর তাই-ই যদি বা মনোগত বাসনা হয় তাহলে ও-পনেরোই আগষ্ট নিয়ে অমন টানাটানি কেন! বর্ষপঞ্জীতে কি আর ও-ছাড়া তারিখ নেই! যে কোন একটা দিন বেছে নিলেই তো হয়—দিনগত পাপক্ষয়ের চিত্রটা তুলে ধরবার জন্য, ভেতরকার তাবৎ দুঃখ ক্ষোভ প্রকাশ করবার জন্য! না, না, ও পনেরোই আগষ্ট দিনটা পালন করতে গেলে স্বাধীনতা দিবসটাকে স্মরণ করেই তাবৎ কার্যক্রম বানাতে হবে; ওই পটভূমিকাতেই সমুদায় বক্তব্য রাখতে হবে।...

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে আমার মতামত তো তুমি জানো। এ স্বাধীনতা আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, অনেক বিষয়ে হতাশ করেছে, সত্য। সত্য বটে আমার পুণ্য জন্মস্থান আজ আমার কাছে বিদেশ হয়ে গেছে। সেখানে ক্ষণিকের জন্য প্রবেশ করতেও আজ আমার পাসপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয়। যে গৃহে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমি প্রথম এই পৃথিবীর আলো বাতাস দেখেছিলাম, যে গৃহে আমার মা তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সে গৃহ আজ এক অজানা অচেনা মানুষের আবাস স্থল। আমার সঙ্গে আজ আর তার কোন সম্পর্ক নেই। গৃহ থাকতেও আজ আমি গৃহহীন। আর এ সব দুর্ভাগ্যের সূত্রপাতই তো সেই উনিশশ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টে, সেই স্বাধীনতা আসবার দিনটিতেই। তাছাড়া, তুমি জানো, এই স্বাধীনতার সৌজন্যেই একদিন আমার দেশপূজ্য পিতা নিজের অতবড় বাড়ী থাকতেও, সারাজীবন অতখানি মান প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েও,—এই খণ্ডিত পশ্চিম-বাংলায় একটি সংকীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে বিশেষ ক'রে বোধকরি সন্তানদের নিরাশ্রয় দুরবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে একদিন আমাদের মায়া কাটিয়ে পরলোকে প্রস্থান করেছিলেন। প্রিয়া, স্বাধীনতার সে মর্মান্তিক উপহারের কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি। তার সে দুঃসহ স্মৃতিভার হয়তো আজীবনই আমাকে বহন করতে হবে। তাই অনেক কষ্টেই বলেছিলাম—এ স্বাধীনতা আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। তবু তুমি জানো, আমি শুরু থেকেই এ স্বাধীনতার সোচ্চার সমর্থক। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'—ব'লে সেদিন যাঁরা গগন পবন বিদীর্ণ করেছেন, 'ভুলো মৎ, ভুলো মৎ, সোরগোল তুলে সবাইকে মাতিয়ে বেড়িয়েছেন, কোনদিন আমি ওঁদের দলে ছিলাম না। শুধু তাই-ই নয়, আমি অকুতোভয়ে ওঁদের বিরোধিতা করেছি। কিন্তু মজা দেখো, সেই ঝুটা আজাদীওয়ালাদের অনেকে কেমন তাল বুঝে দু'হাতে

তেল নিয়ে ওই আজাদীরই পায়ে যৎপরোনাস্তি মালিশ ক'রে কেমন তালেবর ব'নে গেছেন! আজাদীবৃক্ষের ফল কেমন গাছেরও খাচ্ছেন, তলারও কুড়োচ্ছেন! এমন কি রাষ্ট্রপতাকাটাকেও যাঁরা মানতেন না, তাঁরা অনেকেই আজ নিজেদের দেশের ও জাতীয় পতাকারও সর্বময় অছি ভেবেই কেমন মাতব্বরি করছেন! কেমন সকলের মাথার ওপরে সেই যাকে বলে লাঠি ঘোরাচ্ছেন! আর আমরা? থাক্ সে কথা। তবু স্বাধীনতা আমায় কি দিয়েছে, দেশের কাছ থেকে কি আমি পেয়েছি,—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, একে তেমন গুরুত্ব দিই নি কোনদিন। মা যদি আমার প্রত্যাশা পূরণ না করেন, না করতে পারেন, তবুও তো তিনি আমার মা। তাঁর প্রতি আমার ভালবাসার, আমার শ্রদ্ধার, আমার ভক্তিতে ঘাঁটতি ঘটবে কেন! প্রণতিতে আন্তরিকতার অভাব হবে কেন। তাই এ জেলেই থাকি, আর যেখানেই থাকি, যেভাবেই থাকি, —আমার দেশজননী সততই আদরনীয়া, পূজনীয়া আমার কাছে। আর তাঁর শৃঙ্খল-মোচনের দিন এই পনেরোই আগষ্টও তাই আমার কাছে একটি অবশ্য স্মরণীয় দিন, অবশ্য পালনীয় দিন।...

তা শেষ পর্যন্ত আমাদের কথাই রইল। স্থির হলো—স্বাধীনতা দিবসকে অন্য কোন দিবসে রূপান্তরিত করা হবে না। আরও স্থির হলো, সম্মিলিত অনুষ্ঠানটিকে একটি অনাড়ম্বর ছিমছাম অনুষ্ঠানে পরিণত করা হবে, কার্যসূচিও হবে সংক্ষিপ্ত। একটা সর্বজনসম্মত প্রস্তাব পাঠ করা হবে, সভাপতি স্বয়ংই পড়বেন সেটা, আর ওই সভাপতিই ওই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যা হোক দু'চার কথা বলবেন। ব্যস্, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গে সঙ্গে। তবে ওই প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু আবার একদফা বিতর্কের বান ডেকে গেল। দু'দুটো খসড়া পেশ করা হলো কর্তা-ব্যক্তিদের সামনে। তা ও-দুটোকে কেন্দ্র করেই সমান কোলাহল। এর একটা লাইন থাকে তো দুটো লাইন বাদ যায়। ওর কিছুটা গ্রহণীয় হয় তো

অনেকটাই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন, সংকোচন, সংবর্দ্ধন, সংশোধন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সর্বসম্মত বস্তু দাঁড়ালো। তবে তাতে স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহাসিকতার স্বীকৃতি থাকলেও, শতশত শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণ থাকলেও, দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সমালোচনাও রইল। তা তাকে আর বাদ দেওয়ানো যাবে কি করে বল? কেউ রাজী হবে কেন? বছরের পর বছর বিনা বিচারে জেল খাটছেন যাঁরা, কিংবা বিচারের নামে পাঁচ বছর ছ'বছর ধ'রে কেবল কোর্ট আর জেল খাটাই সার হচ্ছে যাঁদের, প্রায় প্রতিদিন একটা করে নতুন অর্ডিন্যান্সের আর নিত্য নূতন সংবিধান সংশোধনের খড়্গ ঝুলছে যাঁদের মাথার ওপর, জেলে ব'সে ব'সেই যাঁরা শুনছেন পিতৃমাতৃ বিয়োগের সংবাদ, প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যুর করুণ কাহিনী, এখানে বসেই অসহায়ের মত কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন যাঁরা সংসার ভেসে যাবার খবর পেয়ে, যারা উপলব্ধি করছেন—এত ত্যাগ, এত দুঃখবরণ, এত আত্মবলিদান, তবুও নতুন উষার স্বর্ণদ্বার তো কৈ খুলছে না। তা তাঁদের দিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রশস্তি রচনা কি সহজ কর্ম প্রিয়া? কারো জয়ধ্বনি তাঁদের কণ্ঠে ও লেখনীতে আমদানী করার প্রয়াস কি অধিকতর বিড়ম্বনা সৃষ্টির নামান্তর নয়? অনেক ভেবে চিন্তে তাই প্রস্তাবের অমন দু'চার কথায় সায় দিতে হলো।···

তা এ-সব তো গেল ওই সম্মিলিত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্বের কাহিনী। কিন্তু ও-ছাড়া আমাদের নিজস্ব এক কর্মসূচিও ছিল। কতিপয় জনসঙ্ঘ, সংগঠন কংগ্রেস ও আর, এস, এসের কর্মী এ জেলে আটক আছেন। তাঁরাই উদ্যোক্তা হয়ে এই স্বতন্ত্র কর্মসূচি বানিয়েছিলেন। তা আজ সকাল থেকেই সেই সব অনুষ্ঠান চলেছে একের পর এক।

প্রথমেই বন্দেমাতরম্, জয়হিন্দ্ ধ্বনির মধ্যে আমাদের এই

গোরাডিগ্রীতে আমরা জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলাম। তারপর নেতাজীর ঘরে গিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দেওয়া হলো, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলো। এরপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম এই ওয়ার্ড থেকে। সার বেঁধে ছোটখাটো একটা প্রশেসান মতই করলাম আমরা। সকলের আগে আগে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে একটি তরুণবন্ধু চললেন। কণ্ঠে তখন আমাদের সকলেরই বিরতিবিহীন বন্দে-মাতরম্, জয়হিন্দ্ ধ্বনি।...

প্রথমেই আমরা গিয়ে থামলাম ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ প্রস্তর-মূর্তির সামনে। ওই মূর্তির পেছনেই ঋষি অরবিন্দের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। জেলের ভাষায় সেল্। এক সময় ওই সেলেই সেদিনের মহাবিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন। ওই সেলে ব'সেই একদিন ওই কক্ষের মধ্যেই তিনি ভগবান বাসুদেবের দর্শন লাভ করেছিলেন। তা প্রথমেই আমরা ওই পুণ্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম। অরবিন্দের জয়ধ্বনি দিলাম। পুষ্পাঞ্জলি দিলাম প্রথমে ভগবান বাসুদেবের প্রতিকৃতিতে। পুষ্পাঞ্জলি দিলাম একে একে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতেও। তারপর বাইরে এসে সশ্রদ্ধ পুষ্প মালিকা ঢুলিয়ে দিলাম শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতেও। এখানে দাঁড়িয়ে তরুণ বন্ধুরা অরবিন্দের উদ্দেশ্যে রচিত একখানা বন্দনা গানও গাইলেন। তা ও—সময়ে ওখানে আমরা ক'টি প্রাণীই যে ছিলাম, তা নয়। ও—জেলের অনেক বন্দী. মায় মেয়াদী অপরাধীরা পর্যন্ত তখন ওখানে নিষ্ঠার সঙ্গে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছিলেন। আর জানো ও জমায়েতে আমাকে দু'চার কথা বলবার জন্যও অনেকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি কিছু বলিনি। বলতে রাজী হইনি। না প্রিয়া, বন্দীর কণ্ঠে বন্দনা গান ফোটাবার ক্লান্তিকর চেষ্টা আমি করিনি।...

ও অরবিন্দ অনুষ্ঠানের পরে আমরা দল বেঁধে গেছি জেল গেটের

দিকে। ঠিক ওই জেল ফটকের সামনা সামনি পুষ্পোদ্যানের ভেতরে রয়েছেন দেশ গৌরব নেতাজী সুভাষ। শ্বেত প্রস্তরের আবক্ষ মূর্তিরূপে তিনি বিরাজ করছেন। তা তাঁর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম জানালাম। তাঁর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিলাম। জয়ধ্বনি দিলাম, নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ। সোচ্চারে দেশ বন্দনা করলাম—জয় হিন্দ্...

তারপর ওখান থেকে আবার আমরা ফিরে গিয়েছি সেই অরবিন্দ-প্রকোষ্ঠের দিকে,—কাছাকাছি একটা ঘাসে ঢাকা পথ ধ'রে গিয়ে পৌঁছেছি জেলের সেই বধ্যভূমিতে, ফাঁসির মঞ্চের পাশটিতে। পৌঁছেছি ওখানে—স্বাধীনতা দিবসের প্রণাম জানাতে সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের যাঁরা একদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য ওখানে হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করেছেন। প্রথমেই ফাঁসির মঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছি আমরা একে একে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি ওই মঞ্চের ওপরে। এক তরুণ বন্ধু হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেছেন এবং আমরা সবাই ওই ফাঁসির মঞ্চ ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি—

পাষাণ প্রাচীর ভাঙবি যারা, আয়রে তোরা আয়রে আয়,
মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, বৃথাই কেন ভাবিস তাই।
অগ্নি শিখা জ্বালবি যারা, আঁধার রাতের বুক চিরে,
আসুক না ঝড় প্রলয় প্রখর, তাতে আবার ভয় কিরে।
সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য পথে চলাই চাই।...

ধীরে ধীরে ও-গান এক সময় শেষ হয়েছে। কিন্তু তার আবেশটা থেকেছে অনেকক্ষন ধ'রে। এমনকি ও-মঞ্চস্থল পরিত্যাগ ক'রে যখন আবার আমরা ফিরছি আমাদের এই গোরাডিগ্রীতে, তখনও আমার মনে ওই গানেরই কয়েক কলি গুঞ্জরিত হচ্ছিল—

সত্যটাকে বিশ্বমাঝে করবি যদি উদ্ঘাটন,

অটল হয়ে আপন কাজে করতে হবে কঠিনপণ।...

অমৃতেরই পুত্র তোরা, মৃত্যু বৃথাই ভয় দেখায়।...

কিন্তু প্রিয়া,—গোরাডিগ্রীতে ঢোকবার পরেই অকস্মাৎ একটা শক্ মতনই খেলাম। বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে গেল!...

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লাল কেল্লার র‍্যামপার্ট থেকে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে তখন বলছেন,—আমাদের জাতীয় পতাকা প্রসঙ্গেই বলছেন,—সরকার বিরোধী দলগুলির কাছে—এ পতাকার কোন মূল্য নেই, এ একটা রঙ্গীন কাপড়ের টুকরো মাত্র।...বিশ্বাস কর প্রিয়া, আকাশ বাণী মারফৎ ওই কথাগুলো শুনে আমার এতক্ষণকার উঁচু সুরে বাঁধা মনোবীণার তারগুলো এক নিষ্ঠুর আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। গোটা বিরোধী দল সম্বন্ধে একী মমতাহীন মন্তব্য! প্রধানমন্ত্রীর একী অশোভন অপপ্রচার! জাতীয় পতাকা কেবল রঙ্গীন কাপড়ের টুকরো আমাদের কাছে? সত্যি প্রিয়া, আমি যারপর নাই মর্মাহত হয়েছিলাম অমন মন্তব্যে। আজ অবশ্য আরও একবার এমনি মর্মাহত, বিমূঢ় বোধ করেছিলাম। তখন সবে বিছানা থেকে উঠেছি, প্রভাতী রেডিওর কটি কথা অকস্মাৎ কানে গেল,—'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিহত।' বিশ্বাস কর, প্রথমে আমি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। এও কখনও হয়! এও সম্ভব! বাংলাদেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতার প্রাণ-বায়ু নির্গত হবে এমনি ভাবে! বাংলাদেশের মাটিতেই! তা কখনও হতে পারে!—অসম্ভব। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এমনি মর্মাহত বোধ করবারই তো পালা প্রিয়া। রেডিও তো এমন নিদারুণ মিথ্যা সংবাদ পরিবশন করে না! করতে পারে না! তবে আর এক্ষেত্রে তো ও সংবাদ পরিবেশনেরও প্রশ্ন নেই। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণই তো রীলে ক'রে শোনানো হচ্ছে। তবে? না, না, প্রিয়া, ও-তবের আর

সরাসরি কেউ জবাব দেবেন, না···দেন না কেউ কোনদিন। মাঝে পড়ে মর্মাহত হওয়াই সার শুধু মন্দভাগ্যদের !···

যাই হোক, আমাদের ওই স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের আরও কিছু বাকী ছিল তখনও। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনবার পর আবার আমরা তাতেই ব্রতী হলাম। দোতলার বারান্দায় নেতাজীর ঘরের সামনেই আসর বসল আমাদের। তরুণ বন্ধুরা একের পর এক অনেকগুলো দেশাত্মবোধ গান গাইলেন। কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক কবিতা প্রবন্ধাদিও পাঠ করা হলো। একটি ছেলে সুন্দর আবৃত্তি করলে—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'··· সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসর ভাঙ্গলো। আমাদের নিজস্ব কর্মসূচী সমাপ্ত হলো।

বিকেল তিনটেয় সেই সাধারণ অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল। আমরা যথা সময়েই গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু সাধারণতঃ এই সব সভা-টভাতে যেমন হয়—গড়াতে গড়াতে সাড়ে তিনটে নাগাদ একটু চোখে ঠেকবার মত জমায়েত হলো। সভাও আরম্ভ হলো তখন। অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। ক্ষিতিশ বাবু আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। দল-টলও করেন না। একেবারে সর্বোদয়ী মানুষ। তা তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। আগে থাকতে ঠিকও ছিল তাই। প্রথমেই একটা গান হলো। কিছু নকশাল বন্ধুরাই গাইলেন। 'শহীদ তোমায় ভুলিনি মোরা, ভুলবে না সংগ্রামের এ জনতা। ভুলবে না রক্তে রাঙ্গা এ নিশান। ভুলবে না মুক্তির ত্রাতা।' তারপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটি পাঠ করলেন, আর ওই প্রস্তাবের প্রসঙ্গক্রমেই সামান্য কিছু বক্তব্য রাখলেন। ব্যস, অনুষ্ঠান শেষ। যে যার মত ফাইলে ফাইলে আবার ফিরে চললেন সবাই। আমরাও যথাসময়ে ফিরে এলাম আমাদের ওয়ার্ডে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আর কিছু তো করণীয় ছিল না ওর পরে। তবে এসব তো গেল আমাদের কথা। ওই যারা বিরোধীদলের মানুষ, তাদের কথা। কিন্তু কংগ্রেসী ফাইলগুলোতেও যে কিছু হয়নি এ দিন, তা

নয়। জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়েছে, রং বেরঙের কাগজের শিকলী টাঙ্গানো হয়েছে,—দেখেছি। মাইকে সারাদিন দেশাত্ম-বোধক গান বাজানো হয়েছে,—শুনেছি। আর শুনেছি—বাইরে থেকে দু'চারজন যুব ছাত্র নেতাও এসেছেন ওঁদের ছেলেদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখতে, শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজীর গলায় মালা দিতে। তবে এসব শুধু শোনা কথা, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের সুযোগ তো পাইনি কিছু!

সারাদিন যাইহোক তবু নানা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে কেটেছে। এখন আর কিছু করনীয় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ার টেনে নিয়ে একাকী তাই বসে আছি ওপরের বারান্দায়। আমার কক্ষটির সামনে। জেলের পাঁচিলের ওপাশ থেকে লাউড স্পীকারে ভেসে আসছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'ও আমার দেশের মাটি—তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'—দূরে দূরে আলোকমালা শোভিতা কলকাতার কিয়দংশ দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে। কল্পনার চোখে দেখছি,—স্বাধীনতার উৎসব চলছে সর্বত্র। নানাসাজে সেজেছে মহানগরী। আলোর মালা গলায় পরেছে শহীদ মিনার। লাল নীল সবুজ,—নানা রঙের রকমারি আলো জ্বলছে রাইটার্স বিল্ডিংসএ, বিধানসভা ভবনে, আরও কত শত হর্ম্যরাজিতে। কল্পনা করছি ঘরে ঘরে আজ কত উচ্ছল উৎসব। কত অনাবিল আনন্দ। কিন্তু আমার নিজের বাড়ীতে? সেখানে আজ শুধু অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের এক কোণে নিরালায় ব'সে ব'সে তুমি কেবল আমার কথা ভাবছ আর ভাবছ, থেকে থেকে তোমার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কল্পনায় এসব দেখছি, আর ভাবছি। ভাবছি নানান কথা।…

কেন জানি নতুন ক'রে ভাবছি,—আজ এ পনেরোই আগষ্ট কি সত্যই স্বাধীনতা দিবস। যদি তাই হয়, তাহলে আমার স্বাধীনতা নেই কেন? কারারুদ্ধ স্বামীর জন্য এই স্বাধীনতা দিবসেই তোমার

চোখে দশধারা নামছে কেন? দেশ আমাদের স্বাধীন, অথচ দেশের মানুষ পরাধীন, এ আবার কেমনতর স্বাধীনতা গো? ভেবে ভেবে আর কুল পাচ্ছি না যেন! একটা ভাবনাই যেন অমন শতটা নতুন ভাবনা টেনে আনছে। ভাবছি একেবারে গোড়ার কথাটাই। স্বাধীনতা কি কেবল ক্ষমতার হস্তান্তর? শুধুই হাতের বদল? রঙের বদল? শিরোভূষণের পরিবর্তন? কোহিনুর লাঞ্ছিত স্বর্ণমুকুট পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী কোন ইংরেজ দুহিতার বদলে অবগুণ্ঠনবতী অনুজ্জ্বল গৌরবর্ণা কোন ভারতকন্যার করধৃত শাসনদণ্ডই কি স্বাধীনতার পরিপূর্ণ প্রতীক? তাবৎ ইতিকথা? সত্যিই প্রিয়া, এমন নিস্তব্ধ অন্ধকারভরা জেলখানায় বসে বসে এখন এইরকম নানান কথাই ভাবছি। আর যতই এসব ভাবছি, কেন জানি ততই মনে হচ্ছে, তুমি প্রিয়া, আমার চাইতেও অনেক দুঃখী, কারণ, তুমি আমার চাইতেও অনেক অসহায়, অনেক বেশী পরাধীন।

আমি জেলে আছি সত্য, তবুও এখানে এই চার দেওয়ালের মধ্যে আমার স্বাধীনতা আছে। যেমন খুসী চলতে পারি, যা খুসী বলতে পারি, যা মন চায় লিখতে পারি, সহবন্দীদের পড়ে পড়ে তা শোনাতেও পারি, মওকা পেলে গলা ছেড়ে চুটিয়ে সমালোচনা করতে পারি সরকারের সভামাঝে। কিন্তু তুমি? তুমি তা পার না। তুমি বন্দীনী নও, এমনিতে মুক্তই, কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, তোমার কণ্ঠ, তোমার কলম, আজ সব প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তোমার চরণ, চলন,— সবেতেই আজ ওঁদের অদৃশ্য শৃঙ্খল। এমনিতে ওপর ওপর ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু বারেকের তরেও বেতালা পা ফেলেছো কি, মালুম পাবে ও কেমন বাঁধন! টন্‌টন্‌ করে উঠবে শুধু পা দুটোই নয়, একেবারে আপাদমস্তক। আর এ দুরবস্থা যে শুধু তোমার একলার, তা নয়। কোটি কোটি ভারতবাসীরই আজ অমনধারা অবস্থা। না, না, কোটি কোটি কেন, তাবৎ মানুষেরই আজ এই দুর্দশা এদেশে। এমন কি যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভেবে

সকলের মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তিনিও মনে মনে ভয়ে আধমরা হয়ে থাকেন এই ভাবনা ভেবে—না জানি কে আবার অজান্তে তারই মাথার ওপর একেবারে ক্ষুরধার আস্ত তরোয়ালই ঘোরাচ্ছে কিনা একটা। মোদ্দা, কেউ-ই আজ স্বাধীন নেই এদেশে, কেউ-ই আজ সুখে নেই, নিশ্চিন্তে নেই।

বলতে পার—অন্তত: একজন তো নিশ্চিন্তে আছেন, সুখে আছেন। সকলকে যিনি এমন ভয় দেখিয়েছেন, স্বয়ং তিনি তো নির্ভয়। কিন্তু এমন ভাবনা নিতান্তই ভাবালু কল্পনামাত্র। তা-ও কখনও হয়? সবাইকে যিনি ভয় পাওয়াবেন, তিনি নিজে কি কখনও ভয়শূণ্য হতে পারেন? সকলের নিদ্রা হরেছেন যিনি, তাঁর কি সুনিদ্রা হয় কখনও? হতে পারে? আর আসল বৃত্তান্তটাই তো ওই একের উদ্বেগ থেকেই উদ্ভূত। নিজে ভয়ের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলেই তো অমন ভয়ের রাজ্যপাট বিস্তৃত করেছেন দেশময়!···

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? শুরুটা কোত্থেকে এ সর্বনাশের? আততায়ী কেউ হানা দিয়েছে কোন সীমান্তে? যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেউ এ দেশের বিরুদ্ধে? কিংবা কোন গৃহযুদ্ধই বেঁধে গেছে নাকি দেশজুড়ে? সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে কেউ? কোন দল?—না, না, তেমন কোন ঘটনাই নয়। না, না, সে সব কিছু নয়। আশ্চর্য তো সেই সত্য কাহিনীটাই। কি? না—এলাহবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি রায় দিলেন, নির্বাচন খারিজ। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন অবৈধ, তাই বাতিল। আইন অনুসারেই বাতিল, নির্বাচনের নিয়মেই নির্বাচন নিয়ম-বিরুদ্ধ। তা নির্বাচনই যখন বাতিল, তখন সংসদের সদস্যপদও বাতিল, আর ওটি বাতিল হলে প্রধানমন্ত্রীর পদও পরমায়ুহীন। সহজ সরল অঙ্ক, একেবারে দুয়ে দুয়ে চারের মত। তাই সরল ভাষায় বলেও উঠলেন অনেকে,—এবার তাহলে দয়া করে নেমে দাঁড়ান দেবী,

প্রধানমন্ত্রীর আসনটা শূন্য করে সরে আসুন শুদ্ধচিত্তে। আইনের সর্বোচ্চ অছি হয়ে আইনের মর্যাদা রক্ষা করুন—কিন্তু সহজবুদ্ধি সাধারণ লোকের অমন সরল কথায় সাড়া দেন কি অসাধারণেরা? ক্ষমতা কি ছাড়ুন বললেই ছাড়েন সবাই? তবেই হয়েছে। বরঞ্চ শিথিল মুষ্ঠি দুটোকে আরও কঠিন কঠোর করে তাবৎ ক্ষমতা করতলগত 'করার জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। আইনের অন্তর্জালি ঘটে—ঘটুক। সংবিধানের শবচ্ছেদ হয়—হোক। গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস ওঠে—উঠুক। তাবৎ মূল্যবোধ ভেসে যায়—যাক, দেশের লোকের চোখের জলে দেশ ডুবে যায়—যাক, তবুও ক্ষমতা থাক,—নিঃশর্ত ও নির্ভেজাল ক্ষমতা। তাই-ই হয়েছে। তাই চলেছে। ফলে—জেলে জেলে অবরুদ্ধ আমরাই অসংখ্য বন্দী শুধু নই, ভারতের সবাই আজ স্বাধীনতাহীন। পরিচিত জেলগুলোর সীমিত অঙ্গনই নয়, তামাম হিন্দুস্থানই আজ জেলখানা, কয়েদখানা। নিজগৃহে আজ সব পরবাসী। তাই দুঃখ করোনা প্রিয়া, চোখের জল ফেলোনা এই স্বাধীনতা দিবসে তোমার স্বামী কারারুদ্ধ বলে। তুমি, আমি, আমরা সবাই—আজ সমভাবে বন্দী, সহবন্দী।···জানি, তুমি এতে সান্ত্বনা পাবে না, চোখের জল মুছবে না। বরঞ্চ প্রশ্ন করবে, কবে? কখন এ অন্ধকার কাটবে গো? কবে স্বাধীনতা-সূর্য সত্যিই উঠবে গো? কোন্ লগ্নে? উত্তরে সঠিক কিছু বলতে পারব না। সামনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে চোখেও তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপর কেমন জ্বালামতনও তো বোধ করছি চোখ দুটোতে···

ছয়

ক'দিন ধরেই কথাটা ভাবছি। আসন্ন অমঙ্গলের কি পূর্বাহ্ণেই ছায়াসঞ্চার ঘটে! অর্থাৎ—যে আপদ এখনও আসেনি, আসবার

কথা নয়, আসাটার এমনিতে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণও নেই, তাই একেবারে অপ্রত্যাশিতও, অথচ অবস্থাবিপাকে যা অনতি-বিলম্বে ঘটতে চলেছে, ঘটবে,—অজান্তেই কি তার প্রভাব পড়ে নির্দিষ্ট মানুষটির মনের ওপরে! তার আচরণে অকারণ এক আগন্তুক আড়ষ্টতা জড়ায়! তার তাবৎ অনুভূতির রাজ্যেও কি এক কালোছায়া দুলতে থাকে সর্বক্ষণ! কি জানি।' যুক্তিগ্রাহ্য কোন স্থির সিদ্ধান্তে ঠিক উপনীত হতে পারছি না। কিন্তু অমন একটা কিছু না মেনে নিলে নিজের আচরণই নিজের কাছে কেমন খাপছাড়া, কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়! সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন দুর্বোধ্য ঠেকে।

সত্য কথা বলতে কি, এ পাষাণ কারার প্রকোষ্ঠে বসে দিনের পর দিন অজস্র চিন্তার মধ্যে বিশেষ করে যে একটি চিন্তাই আমার মনকে ভারাক্রান্ত করেছে—সে চিন্তা আমার কারামুক্তির চিন্তা। কানদুটো আমার বিশেষ করে সর্বদা সজাগ থেকেছে যে একটি শুভ শুভ সংবাদ শোনবার জন্য, সে আমার বন্ধনমুক্তির সংবাদ। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ প্রিয়া, সেই পরম লগন সত্যিই যখন এসে উপস্থিত হলো, উপস্থিত হলো আমার মুক্তি-মুহূর্ত, জেল ফটকের সামনে গিয়ে যখন বাইরে প্রতীক্ষমানা তোমার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা দেখলাম, দেখলাম রুণু অজিতকেও, আমার চোখের সামনে যখন কারাগারের লৌহ কপাটটা একটু একটু করে খুলে গেলো আমার বন্ধনদশার অন্তিমকাল ঘোষণা করে, বাইরে পা বাড়াতে বাড়াতে পেছনে যখন নিয়মমাফিক উচ্চারিত হতে শুনলাম,—খালাস, সত্যিই – আচমকা একটা আনন্দের বন্যাই বয়ে গেল বটে মনের মধ্যে। কিন্তু কেন জানি সেই আনন্দের সহজ স্বাভাবিক ঢল নামাটা মনকে মুহূর্ত কয়েক কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আবার কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে যেতে লাগল। সদ্য কারামুক্ত আমি, দীর্ঘদিন পরে অতি পরিচিত কলকাতার মুক্ত রাজপথ ধরে

গাড়ীতে করে নিজের সুখের নীড়ে ফিরছি, পাশে তুমি, রুণুরা, সবাই আপনার জন, প্রিয়জন, মনের মধ্যে তবুও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অস্বাচ্ছন্দ্য! কথাবার্তায় কেমন যেন এক অনভ্যস্ত আড়ষ্টতা!···

আমি লক্ষ্য করেছি,—তুমি থেকে থেকে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলে। আমার অস্বাভাবিকতা নিশ্চয়ই তোমার চোখে ধরা পড়েছিল,—তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল। তবু লক্ষ্য করেছি, তোমার মুখের হাসি তাতে ম্লান হয়নি, তোমার ললাট-দেশে চিন্তার বলিরেখা ফুটে ওঠে নি। হয়তো মনে মনে আমার অমনতর ব্যবহারের একটা মনোমত ব্যাখ্যা তুমি খাড়া করতে পেরেছিলে। তোমার মত রুণুও বোধহয় সব লক্ষ্য করেছিল, সেও বোধহয় প্রাসঙ্গিক কার্য-কারণ সূত্র হিসেবে কিছু একটা ভেবে নিয়েছিল, তাই বোধ করি অমন রসিকতা ক'রে বলেছিল,--ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন—কত বাড়ীঘর দোর, কত লোকজন, আলো, ট্রাম-বাস! অনেক—দিন তো দেখেন নি এ সব!···

তা সত্যিই অনেকদিন ওসব দেখিনি। প্রাসাদ নগরী কলকাতা, আলোকমালা শোভিতা প্রাণ-চঞ্চলা কর্মব্যস্ত কলকাতা, —সত্যিই অনেকদিন দেখিনি। তবুও আমার সে আনমনা ভাবটার সঙ্গে কিন্তু ও-নগরদর্শনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আসলে আমিও নিজেকে বুঝতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। আপ্রাণ চেষ্টাও করছিলাম স্বাভাবিক হতে, সহজ হতে, স্বচ্ছন্দ হতে। চাইছিলাম সাহচর্য্যের আনন্দ দিতে, আনন্দ পেতে। কিন্তু কেন জানি প্রিয়া, তাও পারছিলাম না। থেকে থেকে কেন জানি ওরই মধ্যে আমার মুক্তি পরোয়ানা,—সরকারী রিলিজ্ অর্ডারটার কথা মনে পড়ছিল। বুকপকেটে হাত দিয়ে দিয়ে দেখছিলাম—বস্তুটা আছে তো ঠিক স্বস্থানে! বহাল তবিয়তে! না, সব ঠিক আছে দেখে ওরই মধ্যে একটু স্বস্তি বোধ করছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ভাবো প্রিয়া! আমি কারাগার থেকে মুক্ত, স্বাধীন গৃহযাত্রী নাগরিক, তবুও পকেটে সেই রিলিজ অর্ডারের অস্তিত্বটাই ক্ষণে ক্ষণে আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে! শান্তি দিচ্ছে! নিরুদ্বিগ্ন করছে! আশ্চর্য্য নয়?

তারপর আমাদের সে সংক্ষিপ্ত যাত্রা-পথ যথাসময়ে শেষ হলো, গাড়ীটা গিয়ে বাড়ীর দরজায় থামল। কিছুক্ষণের 'মধ্যেই সেই অতিপরিচিত, অতিপ্রিয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অনেকদিন বাদে স্যাণ্ডো, জলিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, উন্মত্ত আদরে আদরে আমাকে অস্থির করে তুলল,—আমিও ওদের আদর করলাম। একটু একটু ক'রে অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে সোফায় বসে তোমাদের সঙ্গে এতক্ষণে গল্পে-সল্পে মেতে উঠলাম। কিন্তু কী ভাগ্য দেখো প্রিয়া, বলা নেই কওয়া নেই, এতটুকু আভাস ইঙ্গিত পর্যন্তও নেই, ফস্ ক'রে হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেল। শুধু সেই একটা ঘরের নয়, কেবল আমাদের ফ্ল্যাটেরই নয়, সকলের বাড়ীর সব ঘরের, তামাম অঞ্চলটারই সকল আলো নিভে গেল। অর্থাৎ নিষ্প্রদীপের আধুনিকতম সংস্করণ—সেই লোড্ সেডিং চালু হলো।

তা কলকাতায় বাস করি যখন, এ জিনিষ তো আমাদের অপরিচিত নয়, ভাগ্যগুণে অনভ্যস্তও নই এতে। কিন্তু কি বলব প্রিয়া, ওই আকস্মিক নিষ্প্রদীপ যেন অকস্মাৎ এক নির্মম কশাঘাতই করল আমার সবে সুস্থ হয়ে ওঠা মনটার ওপরে। আচমকা একটা তীব্র শক্ মতনই যেন খেলাম। বোধহয় নানাবিধ কারণের এক যৌগিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই অমনটা হলো। একে তো অক্ষমতা প্রসূত জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া এমন আচমকা অন্ধকার আমার চিরদিনই অসহ্য। তায় ভয়ানক ভ্যাপসা গরমে অকস্মাৎ ও-লোড্‌শেডিংয়ের কল্যাণে সঙ্গে সঙ্গে পাখাগুলোও তো কর্তব্যচ্যুত হলো এবং দরবিগলিত দেহে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে

প্রারব্ধ কথাবার্তার রেশ টানার মত ভয়ঙ্কর রকমের মরীয়া মন যে আমার অন্ততঃ তখন ছিল না সে সম্বন্ধে আমি এরকম সচেতনই ছিলাম। তার ওপর জেলে বসে সংবাদপত্র পড়তাম, আকাশবাণী শুনতাম, জানতে পারতাম—স্বাধীনতার দীর্ঘ আঠাশ বছরে যা হয়নি, 'জরুরী অবস্থার' আড়াই মাস কালের মধ্যে তা সব সুসম্পন্ন হয়েছে, তাবৎ ক্ষেত্রে রেকর্ড প্রডাকশান্ ঘটেছে, মায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারেও সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপনা সম্ভব হয়েছে। আকাশবাণীতে অভয়বাণী শুনেছি,—না, না, ও লোড্-শেডিং জাতীয় অনর্থ আর নয়। বরঞ্চ বাড়তি বিদ্যুৎ নিয়ে কতখানি অর্থ ও পরমার্থ অর্জন করা যায় তারই চিন্তায় নাকি মশগুল পশ্চিম বাংলার কর্তা ব্যক্তিরা। কিন্তু হা হতোস্মি! আমার গৃহপ্রত্যাগমণের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই লোড্‌শেডিং! একী সত্যিই লোড্‌শেডিং, না আমাদের লাক্ শেডিং! মিথ্যে বলব না প্রিয়া, ঘরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত একটা আসন্ন অমঙ্গলের একরাশ ঘন অন্ধকার যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনের মধ্যেও আসন বিস্তৃত ক'রে বসল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য আবার যথাবিধি আলো জ্বলল, পাখা চলল, কথার মালার ছিন্নসূত্রটা আবার আমরা জোড়া দিতে সচেষ্ট হলাম, কিন্তু তুমি জানো,—আকস্মিক আঘাতে আহত সে মুডকে আমরা কেউ-ই আর সে আগেকার মত সজীব ও সাবলীল ক'রে তুলতে পারলাম না।

পরের দিন থেকে অবশ্য অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। বাড়ীতে, বাসে ট্রামে, কলেজে, —সর্বত্রই সেই আগেকার আমি-কে যেন আমি আবার ফিরে পেলাম। ভাবলাম, আসলে অনেকদিন জেলবাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বোধকরি প্রথম দিন অমন বাধো বাধো ঠেকেছিল সব, অজান্তেই একটা আড়ষ্টতায় খানিকটা অভিভূত মতন হয়েছিলাম, অমন আনমনা ধরণের হয়েছিলাম। অন্য কিছু নয়। অন্ততঃ কোন ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত ঘটিত ব্যাপার-

ট্যাপার তো নয় কিছুতেই। আর তা-ও কখনও হয়!···

কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখো, ঠিক ছয়দিনের মাথাতেই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো যাতে ক'রে সেই অমঙ্গলের ছায়াপাত সংক্রান্ত সন্দেহের কালো পর্দাটাই আবার মানসচক্ষের সামনে আপনা থেকেই দুলতে আরম্ভ করল। হাজার যুক্তি তর্ক দিয়েও তাকে ঠিক অপসারিত করতে পারলাম না। আজও পারছি না।

সেদিন রবিবার। আমার কলেজ বন্ধ। তোমারও স্কুলের ছুটি। অন্য কোন দরকারী কাজকর্মও ছিল না কিছু। তাই আগের দিন রাত্রে তুমি আর আমি ঠিক করেছিলাম—রবিবারটা অনেকদিন বাদে একসঙ্গে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ ক'রে উপভোগ করব। কিন্তু সেই যে গান আছে না—"অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী আছে মহারাজা নল। রাজ্যভ্রষ্ট হলো, দময়ন্তী হারাল, গ্রহদোষে কাল কাটায়।"—তা ওই অদৃষ্টের লিখনের জন্যই বোধ করি সেদিনের সব প্রোগ্রাম অকস্মাতই কেমন ভেস্তে গেল। সকাল থেকেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তোমার অবস্থাও তথৈবচ। ভীষণ সর্দি কাসি, জ্বর-জ্বর ভাব। ফলে—দু'জনেরই প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থা। তবু লক্ষ্য করলাম,—আমার অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও তুমি নিজের অসুস্থতাকে আদৌ আমল দিলে না, আমার জন্যই বিচলিত হয়ে ডাক্তার-বদ্যি ডাকাডাকি শুরু করে দিলে, ওষুধপত্তর আনিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে খাওয়াতে লাগলে, আর আমার ওই আকস্মিক অসুস্থতার জন্য বারবার নিজের অদৃষ্টকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে লাগলে। কিন্তু তখনও তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবতে পারনি—কয়েক ঘণ্টা বাদে অদৃষ্টের পরিহাস কি অভিনব এক পরিচ্ছেদই না সৃষ্টি করতে চলেছে সেদিন! আমার তো কল্পনাতেও স্থান পায়নি সে কথা। কিন্তু কি মন্দভাগ্য দেখো, সত্যিই তা ঘটল। একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে অঘটনটি ঘটল। তাও ঘটলো ঠিক মধ্যরাত্রিতে। ঘটলো তখন যখন সকল সাধারণ ভদ্র নাগরিকের

মত আমরাও শয্যাশ্রয়ী, নিদ্রায় অচেতন।

বাইরের ঘরের ইলেকট্রিক বেলটা বারবার জোরে জোরে বাজতে থাকায় চট্ ক'রে একসময় ঘুমটা আমাদের ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, কথাটাও—কানে এল কয়েকবার। অত রাত্রে না জানি কি সাংঘাতিক টেলিগ্রাম এলো ভেবে হন্তদন্ত হয়ে আমিই ছুটছিলাম বাইরে, কিন্তু তুমি আমার অসুস্থতার কথা ভেবেই বোধ করি আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই দরজা খুলে বাইরে গেলে এবং কিছুক্ষণ বাদে সত্যিই একটা খোলা টেলিগ্রাম হাতে ফিরে এলে। কিন্তু তখন তোমার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম, কি ব্যাপার! কি আছে ও—টেলিগ্রামে! তোমার সমস্ত মুখমণ্ডল থেকে শেষ রক্তবিন্দুটুকুও যেন কেউ নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছে! তোমার ছুচোখে জল ছল্‌ছল্ করছে। তোমার ঠোঁটছুটো, সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে! কিন্তু কেন! তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম,—কৈ, কোন দুঃসংবাদ তো নেই তাতে! আসানসোল থেকে দলের এক কর্মী আমার মুক্তি সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছে, আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে, এই মাত্র তো বিষয়বস্তু। তবে!···

তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জানা গেল ব্যাপারটা। অনেক কষ্টে কান্না সামালাতে সামলাতে তুমিই বললে, ওরা আবার তোমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। বিশ্বাস কর প্রিয়া, কথাটা তুমিই বললে, অমন ভাবে বললে, তবুও কেমন জানি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না, 'আবার ধরে নিয়ে যাবে! কিন্তু কেন! কি আশ্চর্য্য! সবে তো ছ'দিন আগে মুক্তি পেয়েছি, এরই মধ্যে অজান্তে আবার কি পাপ ক'রে বসলাম! না, না, সে কি ক'রে সম্ভব! যাই হোক, মধ্যরাত্রিতে দুয়ারে অমন অতিথি দাঁড় করিয়ে রেখে অতশত ভাবতে গেলে চলে না। চালাতে দেবার জন্যও ওঁরা আসেন নি অমন। তাই নিজেই গেলাম তখন ভাল

ক'রে সব বার্তা নিতে। তুমিও সঙ্গ নিলে। ভাবলে বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই বুঝি শঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারবে আমাকে। কিন্তু হায় প্রিয়া, তা তো হবার নয়! শেষ পর্যন্ত তুমি বোঝাতে চাইলে—আমি অসুস্থ, সারাদিনে জলবিন্দুটুকুও স্পর্শ করিনি, অন্ততঃ রাত্তিরটুকু আমাকে ঘুমোতে দিয়ে ভোরবেলা না হয় নিয়ে যাবেন··· কিন্তু দেখলে তো প্রিয়া, তাতেও ওঁরা রাজী হলেন না!. দেখলে তো, কেমন অতি বিনয়ের সঙ্গে, সহানুভূতিসূচক শব্দাবলীর সঙ্গে, কেমন নিতান্তই ওপরওয়ালার নির্দেশ মানার দোহাই পেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওরা তোমার ও অনুরোধটুকুও নাকচ ক'রে দিলেন!···

তা এর পরে আর ওঁদের মুখোমুখি অমন সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার অর্থ হয় না কিছু। ওঁরা ওঁদের করণীয় করতে এসেছেন, আমাকেও আমার কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যত অসুস্থই থাক আমার শরীর, বিনিদ্র রাত কাটাবার জন্য শারীরিক অবস্থার আরও যত অবনতির সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, যত খারাপই থাক তোমার শরীর, আর উভয়ের আধিব্যধিকে কেন্দ্র ক'রে উভয়ের মনে যত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাই থাক, তবুও আহ্বান যখন এসেছে, তখন তো আমাকে যেতেই হবে। আমি যে সংবিধানসম্মত রাজনীতির শরীক, আইনের রাজত্বে বিশ্বাসী শান্তিপ্রিয় নাগরিক, তাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকর্তাদের অনায়াস লব্ধ সহজ শীকারও তো বটে। তাড়াতাড়ি কিছু অত্যাবশ্যক জিনিষপত্তর সঙ্গে নিয়ে তাই তোমার অশ্রুসিক্ত অঙ্গনের ওপর দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমাদের ফ্ল্যাট থেকে। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচের তলা পর্যন্ত নেমে এলে সাশ্রুনেত্রে আমাকে বিদায় দিতে।···

কিন্তু তার পরের অভিজ্ঞতাটা তো আরও অপ্রত্যাশিত, আরও চমকপ্রদ। এখনও মাঝে মাঝে মানসচক্ষে আমার সে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে প্রিয়া, যে মুহূর্তে বাইরের

দরজাটা খুলে আমি রাস্তার ওপর সবে এক পা দিয়েছি, প্রায় এক-ডজন উদ্যত রাইফেল সেপাই অর্দ্ধবৃত্তাকারে আমার দিকে এগিয়ে এলো। সত্যিকথা বলতে কি—ওদের অমন ভাবে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমটায় তো আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম,—এ আবার কি! আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র-টন্ত্র নাকি! তোমারও নিশ্চয়ই অমনই একটা কিছু মনে হয়েছিল ওই রকম লোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখে, তাই বিদ্যুৎগতিতে পেছন থেকে সামনে এসে আমাকে আড়াল মতন ক'রে দাঁড়িয়েছিলে। কিন্তু না, পরমুহূর্তেই বোঝা গেল—সেরকম কিছু না, নিতান্তই 'নাইট্ রেডের' নিয়মমাফিক ব্যবস্থা মাত্র। গাড়ীতে ওঠবার মুহূর্তে ওরাই আবার সেলাম ঠুকে সম্মান জানালে। তা জানাক, কিন্তু চিন্তাটাকে ঠিক পরিহার করতে পারলাম না। বরঞ্চ আমার গাড়ীটার পেছনে পেছনে অন্য গাড়ীতে ওদের অস্তিত্ব অনুভব করা ছাড়াও যখন রাস্তার ওপর অনেকটা দূর পর্যন্ত আরও অনেক অপেক্ষমান বন্দুকধারী পুলিশ ও তাদের সেলাম বাজানো দেখতে দেখতে লর্ড সিন্‌হা রোডের দিকে চলতে লাগলাম তখন চিন্তাটা ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল।

মশা মারতে কামান দাগার কথাটা তো সর্বজন বিদিত। কিন্তু এতো দেখছি তার চাইতেও অনেক বাড়া। আমি যে আদৌ একজন বিপজ্জনক মানুষ, একটা ভয়ঙ্কর ধরণের কোন জীব,—এ কথা তো আমার অতিবড় শত্রুর মুখেও কোনদিন শুনিনি! বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিপরীত করুণা মিশ্রিত মন্তব্যই তো শুনেছি বারবার। তার ওপর আবার আমি এমন একজন রাজনৈতিক কর্মী যাকে সেই কাক মুখেও কেউ গ্রেপ্তার করতে আসবার সংবাদ পাঠালে সাত তাড়াতাড়ি সুটকেস-টুটকেস গুছিয়ে বসে থাকে এইভেবে পাছে গ্রেপ্তারকারী মহাজনদের এসে কার্য্যসমাধা করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে যায়। এ অবস্থায় তুমি বল,—বিশেষ ক'রে আমার জন্যই অতগুলি রাইফেলের সে রাত্রির সে সমাবেশ নিতান্তই তোমার মনে

এক বিভীষিকা সৃষ্টি ও আমার হৃদকম্প সৃষ্টির আয়োজনে মাতবার এক উৎকট উল্লাস বইতো কিছু নয়! সত্যিই, এ সবের কোন মানে হয়!···

তোমার কাছে কিছু গোপন করব না, যতক্ষণ না লর্ড সিন্‌হা রোডের সেই বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকেছিল গাড়ীটা ততক্ষণ বুকের ধুকপুকুনিটা আমার সে রাত্রে কিন্তু থামেনি একেবারে। ওখানে ঢুকে ওরই মধ্যে তবুও একটু স্বস্তি বোধ করলাম,—যাক্ বাবা, নির্দোষ গ্রেপ্তারী ব্যাপার তা হলে! অন্য কিছু নয়! তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে যখন লম্বা টেবিলের ওপরে চাদর বিছিয়ে পাশাপাশি নিদ্রা আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টায় রত সুশীলদা, স্বরাজদা, বিমানবাবু ও অশোক-বাবুকে দেখলাম, তখন তো দুঃখের মধ্যেও একটা আনন্দ মতনই বোধ করলাম। যাক, একা নই তাহ'লে! একেবারে সেই গোটা গ্যাংটাকেই পুনরায় পাকড়াও করার প্রোগ্রাম! সেদিক থেকে তবুও মন্দের ভাল!···

সামান্য কিছুক্ষণ ওই গ্রেপ্তার সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ লঘু আলোচনার অন্তেই কিন্তু আমার সারাটা মন জুড়ে তোমার কথাটাই বারবার আলোড়িত হতে লাগল। আর ওই আলোড়নের মধ্যেই আকস্মিক ভাবে আর একটা কথাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল।···তুমি তো জান প্রিয়া, পোষ্ট-অফিসেই হোক, রেলষ্টেশনেই হোক, ও এয়ার-লাইন্স, ষ্টিমার সার্ভিস, যেখানেই হোক, যৎকিঞ্চিৎ কোন নিজস্ব মাল খালাস করতে গেলেও নির্দিষ্ট সময়মাফিক যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর দেখাতে হয়, সইসাবুদ করতে হয়, দরকার মতন সাক্ষী-টাক্ষীরও ব্যবস্থা দেখতে হয়। সর্বোপরি কর্তাদের মর্জির ওপরেও নির্ভর করতে হয়। আমাদের দেশেই এসবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো, সামান্য মালের জন্য যা প্রয়োজন হয়,—একটা জলজ্যান্ত মানুষকে ঘর থেকে তুলে আনবার জন্য—কিন্তু সে সবের আদৌ কোন দরকার দেখা

দেয় না। হোক রজনী যে কোন প্রহরের,—থাক ব্যক্তিটি অসুস্থ শয্যাশায়ী,—অঝোরে চোখের জল ফেলুক গৃহস্থ প্রিয়জনেরা,—কোন বাধা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই,—কোন কারণ দর্শাবারও প্রয়োজন নেই, দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে কেবল আদেশ দিলেই হলো—'মামানুসর'। ব্যস, গুটি গুটি চল চরণ, কর মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ। যেথা খুসী,—যেমন ভাবে খুসী,—নিয়ে চলুন ওঁরা।...

তা শেষ পর্যন্ত অবশ্য আবার আমাদের নিয়ে চললেন ওঁরা সেই পরিচিত প্রেসিডেন্সী জেলেই। কিন্তু তার আগে অবশ্য সেই লর্ড সিন্‌হা রোডের প্রকোষ্ঠে এক রকম ব'সে ব'সেই বাকী রাতটা কেটেছে, তারপর যথানিয়মে সকাল হয়েছে, বড় সাহেব এসেছেন, যথারীতি আপ্যায়ণাদির পর এক প্রস্থ ডিটেনশান অর্ডারের কাগজ পত্তর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর ওই 'ফারদার ডিটেনশান্ অর্ডারের' বয়ান দেখে ওই গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির মধ্যেও মনে মনে একচোট না হেসে পারিনি। তুমি তো জান, মাত্র ছ' দিন আগের রিলিজ অর্ডারের বয়ানে ছিল যে আমাকে আটকে রাখবার যথেষ্ট কারণ কিছু না থাকাতেই সরকার আমার ওই কারামুক্তির আদেশ দিচ্ছেন। অথচ ছ'দিন পরেই—বাড়ী আর কলেজ ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় স্থানে না গেলেও, রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পাদস্পর্শ না করলেও, সেই সরকারই আবার নয়া আটক নির্দেশ-নামার বয়ানে লিখছেন—"I have considered and am satisfied that his detention is necessary for effectively dealing with the Emergency proclaimed under clause (I) of article 352 of the constitution." বোঝ প্রিয়া, পরিস্থিতিটা কেমন জটিল! ভাব প্রিয়া,—ভাগ্যটা কত মন্দ।...

যাইহোক, সেই নয়া গ্রেপ্তারের রাত থেকে এই জেলে আবার এসে অবধি সেই গোরাডিগ্রির ঠিক আগেকার প্রকোষ্ঠটিতে ব'সে

ব'সে ওই একটা কথাই আমি বিশেষ করে ভাবছি,—আসন্ন অমঙ্গল কি অজান্তে ছায়া ফেলে মনের ওপরে! চলনে বলনে কি তার প্রভাব পড়ে! কারামুক্তির সে দিনটির সে অপ্রত্যাশিত আড়ষ্টতা, মানসিক বিষণ্ণতা,—সবই কি সেই মাত্র ছ'দিন পরেকার পূর্বনির্ধারিত দুর্ঘটনারই পূর্বাহ্ণিক প্রতিফলন! না অন্য কিছু! বিশ্বাস কর,—সেদিন থেকে মাঝে মাঝে ওই কথাই ভাবছি, আর ভাবছি। কিন্তু কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না কিছুতেই।...

সাত

প্রথম বারের গ্রেপ্তারের সময় জেলে পাঠাবার পূর্বমুহূর্তে কর্তারা যে ডিটেনশান অর্ডারখানা আমাদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে বড় ক'রে হাতে লেখা একটি ইংরেজী অক্ষর ছিল—'এম্'। কিন্তু এবার যে কাগজপত্তর পেলাম,—তাতে লেখা আছে দুটি অক্ষর, 'ই', 'এম' (E.M.)। অর্থাৎ—প্রথমবার আমরা আটক ছিলাম মিসায়, এবার হলাম 'এমারজেন্সী মিসায়'। এমনিতে দুটোই অবশ্য এক রকম তুল্যমূল্য,—উভয়ক্ষেত্রেই বস্তুতঃ সেই 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।' তবে সাধারণ মিসাতে আটক ব্যক্তিকে কয়েকদিনের মধ্যে একটা 'চার্জসীট' জাতীয় বস্তু দেবার ব্যাপার আছে, আর ওই প্রদত্ত চার্জসিটের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দীর বক্তব্য শোনবার এবং বিচার করবার জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতিসহ একটি বোর্ড আছে, এমনকি ও বোর্ডের বাইরেও সাধারণ কোর্ট কাছারী করবার সুযোগ আছে। কিন্তু এমারজেন্সী মিসা সেদিক দিয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ, নির্ভেজাল এবং নিরালম্ব এক বস্তু। চার্জসীট-ফিটের কারবার নেই, কোর্ট কাছারির এক্তিয়ার নেই,—এখানে সকলই তাঁরই ইচ্ছা।

সংবাদপত্রে পড়েছি,—এক্ষেত্রেও নাকি একটা বোর্ড মতন বস্তু—মা'নে একটা রিভিউ কমিটি গোছের জিনিষ আছে, চারমাসের মাথায় মাথায় তাঁরা নাকি বিচারেও বসেন। ভালমন্দ যা হোক একটা কিছু করেন। তবে যে বেচারীদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তাঁরা অমন বসেন,—তাদের কিন্তু কোনই ভূমিকা নেই ও-কর্মকাণ্ডে। অনেকটা যেন সেই অদৃষ্টের মত ব্যাপার। কে বা কারা ললাটে লিখলেন,—কি লিখলেন,—আর কেনই বা লিখলেন, কিছুই জানা নেই,—জানবার উপায়ও নেই, অথচ ফল ভোগ ক'রে মর তুমি ওই ললাট লিখনের জন্যই। এক্ষেত্রেও অনেকটা ওই রকম। ঠিক কারা বিচারে বসছেন, কবে বসছেন, আর কি অপরাধেরই বা বিচার করছেন ওঁরা, কিছুই জানা গেল না, জানানো হলো না, অথচ রায়-দানটা ঠিক এসে গেল হাতে,—হয় 'ডিটেন্‌শান কনটিনিউড্', না হয় 'মিসা রিভোক্‌ড্'—অর্থাৎ রিলিজ্‌ড্। তা ওই দ্বিতীয় রায়দানের নমুনাটা অবশ্য এখনও আমার চোখে পড়েনি। সকলেরই দেখছি—সেই কনটিনিউয়েশানেরই কারবার।

তবে এতে কোন বিস্ময়বোধ নেই আমার,—অভিযোগতো নেই-ই। কিন্তু কেন জানি,—এ প্রসঙ্গে অনেকদিন আগে দেখা 'সীতা' নাটকের একটা সংলাপ মনে পড়ে। চেষ্টা করলে তুমিও মনে করতে পারবে তা। কারণ, ও-নাটক দেখবার পর অনেকদিন পর্যন্ত জায়গা মতন আমরা উভয়েই সে সংলাপের পুনরাবৃত্তি করেছি। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে দৃশ্যটা। ব্রাহ্মণোচিত যাগযজ্ঞ তপস্যাদি কর্মরত অন্তজ শম্বুককে অযোধ্যায় অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী ক'রে রাজা রাম যখন তাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শোনাচ্ছেন,—তখন শম্বুক বিনীতভাবে রাজার উদ্দেশ্যে সবিস্ময়ে এবং সখেদে বলেছিলেন,—অপরাধী জানিলনা কি দোষ তাহার,—বিচার হইয়া গেল!…

তা ও-সাধারণ মিসা আর এমারজেন্সী মিসার তুলনামূলক ভাল-

মন্দের বিচার আইন-বিশারদ ও আইনসভার সদস্যদের এক্তিয়ার। আমি সাধারণ মানুষ, আমি ওর মধ্যে অহেতুক প্রবেশ করতে চাইনে। যেদিন সাধারণ মিসায় আটক ছিলাম, চার্জসীট পেয়েছিলাম, সেদিনও বোর্ডের দ্বারস্থ হইনি, নিজ বক্তব্য পেশ করিনি। বোর্ড নিজে থেকেই নিয়মমাফিক নব্বই দিন পূর্ণ হবার পূর্বে বিচারে বসেছিলেন এবং আমাকে আটক রাখবার যুক্তি সঙ্গত তেমন কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে আমার মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি মুক্ত হয়েছিলাম। আবার ঠিক ছ'দিনের মাথায় কি জানি কি কারণে কর্তারা আমাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন,—নতুন ক'রে এমার্জেন্সী মিসায় আটক করেছেন। সেবারের মত এবারও আমি ওই যাঁরা ধরেছেন ছাড়বার দায় দায়িত্বও তাঁদেরই ওপর ন্যস্ত ক'রে নির্বিকার হয়ে বসে আছি। ও নয়া মিসার কোন অভিনবত্ব নিয়ে তাই আমার এমনিতে তেমন কোন মাথাব্যথা সত্যিই ছিল না। আমার মনের ভাব অনেকটা এই রকমই,—যদি খাঁড়া আর হাঁড়ি কাঠের ওপর দখল থাকে তাহলে কেউ নিজের পাঁঠা লেজে কাটলেও কাটাতে পারেন। তাছাড়া—এমনিতে পূর্বাপর কোন পার্থক্যও তো বোধ করবার অবকাশ পাইনি। ঠাঁট বাট সব একরকমই ছিল তো।

কিন্তু শক্ খেলাম ইন্টারভিউয়ের সময়ে। এ এমার্জেন্সী মিসার মাহাত্ম্যটা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম তখন। আগে সপ্তাহে একদিন ক'রে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা ছিল। যে কোন পাঁচজন আত্মীয় স্বজনের দেখা করবার পারমিট ছিল। তা ও-সরকারীভাবে ঘোষিত পাঁচ সংখ্যাটা কোন দিন দ্বিগুণ হলেও কেউ আপত্তি তুলতেন না। বেশ সৌজন্যমূলক সহৃদয় আচরণই দেখাতেন এ ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষ ও এস, বি,র প্রতিনিধিরা। কিন্তু এবার ওদিন জেল অফিসে গিয়েই জানলাম,—'তেহিনো দিবসাগতা।' না, না, আগেকার মত তেমনটি আর হবে না এখন থেকে। আগেকার মত সে সপ্তাহে

সপ্তাহে আর নয়, সরকারের স্পেশাল সার্কুলার,—এবার থেকে মাসে মাত্র একদিন। আর পূর্বেকার মত সে পঞ্চজনার ব্যবস্থা নয়,—এখন থেকে মাত্র দু'জনের প্রবেশাধিকার। তাও 'স্ট্রিক্ট্লী ফ্যামিলী মেম্বারস' হওয়া চাই। তা ও-স্ট্রীক্টলী ফ্যামিলী মেম্বারস কথাটা নিয়েও একটা বাড়তি বিড়ম্বনাই বোধ করলাম। সরাসরি জানতে চাইলাম,—কথাটার তাৎপর্য্য কি?—তা সবই জানালেন ডেপুটি জেলার মিঃ বিশ্বাস। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আর স্রেফ পুত্র-কন্যা নিয়েই ফ্যামিলী। এর বাইরে আর যে যেমনই থাকুন না কেন যেখানে,—ও ফ্যামিলির আওতায় কেউ পড়বেন না,—এই-ই সরকারের নির্দেশনামা। আমি তো সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম—ফ্যামিলীর অমন ব্যাপ্তর্থ শুনে।—বলেন কি ভদ্রলোক!

অন্যদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম,—কিন্তু আমার ভাই বোন, দাদা বৌদি, ভাইপো ভাইঝি, এরাও আমার পরিবারের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়! ওরা কেউ প্রাণ চাইলেও আসতে পারবে না আমাকে দুদণ্ড চোখের দেখাও দেখতে! আর বিশেষ ক'রে এই কারণেই পারবে না যে তারা কেউ আমার ফ্যামিলীর আওতায় পড়ে না! আর একথা বলছেন অন্য কেউ নয়,—আমাদেরই সরকার! সত্যি প্রিয়া, যদি স্বচক্ষে সে সময় ওই সরকারী সার্কুলার না দেখতাম,—কোন পাগলের প্রলাপ বলে ও-কথা আমি উড়িয়ে দিতাম। যাইহোক,—উপস্থিত কর্তব্যক্তিদের সঙ্গে ও-সব নিয়ে তর্ক করার কোন অর্থ ছিল না। ওঁরা কি করবেন এ সম্বন্ধে! ওঁদের তাই এ ব্যাপারে কিছু বলিও নি। কিন্তু একটা কথা ওঁদের বলেছিলাম তখন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—ও সার্কুলারের সঙ্গে যাদের আসল সম্পর্ক—সেই আমরা কটি বন্দী অভাজন, আর সাক্ষাৎপ্রার্থী আমাদের সেই মন্দ ভাগ্য আত্মীয়স্বজন, তাদের কেন জানানো হলো না ও-সার্কুলারের মর্মকথা? কেন কেবল ড্রয়ারে

বন্দী ক'রে রেখে ওর অমন সদগতির কথা ভাবা হলো? কেন আমাদের ঠিক ইণ্টারভিউয়ের মুহূর্তেই ওই অজ্ঞাত সার্কুলারের সৌজন্যে এমনভাবে অপ্রস্তুত করা হলো?—তুমুল তর্ক তুললাম। চেঁচামেচি করলাম। কিন্তু নিরর্থক প্রিয়া, সবই নিরর্থক,—ওঁরা প্রায় সর্বদাই—সেই 'কানে দিয়েছি তুলো, বোলো বাবা বোলো যথা খুসী বোলো।'...

তা ওঁদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা চালাবার সময় নেই তখন। তোমরা সব জেল গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছ,—দরজা খোলবার প্রতীক্ষা করছ। অফিস থেকে বেরিয়ে তাই তোমাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু তোমার মনে পড়বে নিশ্চয়ই প্রিয়া, যে প্রথমটায় আমি তোমাদের সামনে কোন কথা বলতে পারিনি। কেমন ক'রে হঠাৎ বলব বল—আমার কল্যাণ কামনায় সতত ব্যাকুলা মাসীমাকে, স্নেহময় ছোটদাকে, ছোট বৌদিকে,—আপনারা অনর্থক পণ্ডশ্রম করেছেন এই জেল ফটক পর্যন্ত এসে,—ভেতরে প্রবেশাধিকার পাবেন না আপনারা? আর কেবল আজই নয়, কোনদিনই আর এ জেল ফটক খুলবে না আপনাদের জন্য, কারণ সরকার স্থির করেছেন,—আপনারা আমার কেউ নন! কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, তোমরা যা ক'রে হোক আগেই জেনে গিয়েছিলে সব। তাই আমাকে সেদিন চরম লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলে। ওঁরা সব বাইরে থেকেই আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আপনা থেকেই ম্লানমুখে বিদায় নিয়েছিলেন।

কেবল তুমিই স্বাধিকারে ভেতরে এসেছিলে, নির্দিষ্ট সময় ধ'রে কথাবার্তা বলেছিলে,—আমাকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছিলে,—সব সহ্য করবার মত শক্ত থাকতে বলেছিলে। যদিও নিজে তুমি, মাঝে মাঝেই আমি লক্ষ্য করেছি, রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলে। তারপর ইণ্টারভিউয়ের সীমিত সময় পার হয়ে গেলে পায়ে পায়ে আবার সেই উন্মুক্ত জেল ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে

বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ে বলেছিলে,—মাসে মাত্র একবার তোমাকে দেখতে পেলে—আমি কি ক'রে থাকব বল? কেমন করে বাঁচব?—বল না গো?—কোন উত্তর দিইনি তোমার সে কথার। কি উত্তরই বা আমি তখন দিতে পারতাম বল? কেবল তোমার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে আশীর্বাদ করেছিলাম। তোমাকে সহ্য-শক্তি দেবার জন্য ভগবানের কাছে অভিভূত আর্তি জানিয়েছিলাম। তারপর তুমি বাইরে চলে চলে গেলে—যতক্ষণ দেখা যায়—জেল ফটকের গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ধীরে ধীরে অপসৃয়মান তোমার রোদন-কাতর মুখখানা দেখেছিলাম।···

কিন্তু প্রিয়া,—একদিক দিয়ে আমাদের ভাগ্য তো তবু মন্দের ভাল এ ব্যাপারে। সর্বপ্রথম তোমার ইন্টারভিউয়ের আবেদনপত্রই মর্যাদা পেলো,—এবং যেমন ভাবেই হোক—এক ঘণ্টা ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হতে পারল। কিন্তু ও-নয়া সার্কুলারের দৌলতে আমার সহ-বন্দীদের অনেকের যা অবস্থা দাঁড়ালো—সে তো আর কহতব্য নয়! ওই সরকার প্রদত্ত ফ্যামিলীর সংজ্ঞাটাই সর্বনাশ ঘটালে। তা ধীরে ধীরে ধীরে জানা গেল সব। কর্তা-ব্যক্তিরাই জানালেন।

ক্ষিতীশবাবুর ফ্যামিলী আছে,—সরকারী মতেও আছে, কারণ স্ত্রী আছেন, কন্যাও আছেন। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের আবেদন পত্রে তাঁদের কারও স্বাক্ষর ছিল না। অতএব তা বাতিল। সুশীলদার কেস তো একেবারে শিবেরও অসাধ্য! দাদার বয়স পয়ষট্টি, এ বয়সেও পিতামাতা বর্তমান থাকার জন্যে যতবড় সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয়—তা তাঁর নেই। তারওপর আজীবন অকৃতদার,—তাই স্ত্রীতো চিরদিনই অবর্তমান। আর ওই কারণেই পুত্র কন্যার প্রশ্নও অবান্তর। অতএব—দাদার 'নো ইন্টারভিউ'। স্বরাজবাবু বিমানবাবুর অবস্থা তো একেবারে নিখুঁত একরকম।

উভয়েই অকৃতদার,—অতএব পুত্র কন্যাহীনও। উভয়েরই গর্ভধারিণী আছেন বটে,—তবে তাঁরা অতিবৃদ্ধা,—তাই ও-ইন্টারভিউ ঘটিত আসা যাওয়ার ধকল সইতে উভয়েই সমভাবে অসমর্থা। তাছাড়া পূর্বাহ্নে এ সবের আঁচ না পাওয়ায়—স্বভাবতঃই আবেদনপত্রে তাঁদের স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তাও কেউ অনুভব করেন নি। সুতরাং ওদের ইন্টারভিউও 'নট্ গ্রাণ্টেড্।' এক অশোকবাবুই ওদিক থেকে পুরোপুরি ভাগ্যবান,—কারণ তাঁর সরকার নির্দিষ্ট অখণ্ড পরিবারই বর্তমান।···

একবার বোঝ প্রিয়া—কর্তাদের বোধ শক্তির বহরটা! এদেশটা যে ইউরোপ নয়, আমেরিকা নয়,—সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ নামে খ্যাত হলেও সনাতন বঙ্গভূমিরই অঙ্গ-বিশেষ, এবং এখানকার বাঙ্গালী পরিবারে যে কেবল ওই পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ছাড়াও আরও অনেকে থাকেন,—অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই থাকেন,—অন্ততঃ থাকতে পারেন,—এ হুঁশটাও বঙ্গজন-ভাগ্যনিয়ন্তাদের নেই! আশ্চর্য নয়!—তবে আমি আবার আশাবাদী মানুষ,—কালমেঘের চাইতেও তার রুপোলী পাড়ের দিকেই নজরটা বেশীতো সর্বদা,—তাই ও-পরিবারের সরকারী সংজ্ঞার মধ্যেও অনেকটা স্বদেশ-চিন্তার সংস্পর্শ পেলাম। না, না, তেমন নয়,—কর্তারা যে দেশগাঁয়ের কোন খবরই রাখেন না,—তা নয়। ওই তো দিব্যি পিতা মাতাকে মান্যতা দিয়েছেন! বিয়ে শাদী করা, এমনকি সন্তানের চাঁদ মুখ দেখা, তাদেবর ছেলেমেয়েদেরও ছেটে কেটে বাদ দেননি! না, না,—একেবারে পাশ্চাত্য পরিবারের আদলে পুরোপুরি বদল হয়নি ওদের ধারণার!—এ মাটির মায়া কিছুটা আছে বইকি এখনও জড়িয়ে! তাই বা কম কি বল?....

কিন্তু যেমনই হোক,—ও-ফ্যামিলীর ফ্যাকড়ায় ফাসতে গেলে আমাদের চলেনা। আমাদের মত বন্দীর জীবনে ও-ইন্টারভিউয়ের অনেক দাম। অনেক দাম আমাদের কল্যাণ-চিন্তা কাতর আত্মীয়

স্বজন প্রিয়জনদের কাছেও। তাই অমন মনগড়া অতি ক্ষুদ্র এক গণ্ডী টানা,—নিতান্তই মালিকের মর্জি সাপেক্ষ এমন এক যুক্তিহীন হৃদয়হীন মাসিক বন্দোবস্ত নির্বিবাদে যো হুকুম্—গোছের মন নিয়ে ঠিক মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ চোখের ওপর যখন দেখছি—কারণে অকারণে কত রকমেরই কত ইণ্টারভিউয়েরই ব্যবস্থা হচ্ছে কত জনের। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তো প্রায় মিছিল ক'রেই দর্শনার্থীরা আসছেন আর যাচ্ছেন। আবার যার ইণ্টারভিউ হবার কথা জালে, তিনি কিসের জাল বিস্তার ক'রে কে জানে—দিব্যি অফিসের মধ্যে টেবিল চেয়ারে জাঁকিয়ে ব'সে কর্তাব্যক্তিদের নয়ন সন্মুখেই আসর সরগরম ক'রে রাখেন দিনের পর দিন! তা এসব হয় হোক,—আমরা কোন আপত্তি তুলিনি কোনদিন। তোলবার কথা ভাবিওনি কোনদিন। ও তামাম হিন্দুস্থান জুড়েই বাইরে যা চলছে প্রতিনিয়ত,—এ জেলের মধ্যে তার কিঞ্চিৎ প্রতিফলনও ঘটবে না কুত্রাপি, এমন উদ্ভট কথা ভাবতে বসব কোন্ বুদ্ধিতে? তাছাড়া ভেবেছি,—আহা, বন্দীই তো সব, এইভাবে যদি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পায়, আনন্দ পায়,—পাক্ না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,—ও-সব পিচ্ছিল পথে পদচারণা করতে পারব না ব'লেই কি আমরা ক'টি অভাজন এমনিভাবে প'ড়ে প'ড়ে মার খাব?—এ কেমন কথা!...

অথচ—ওদিকে দেখো—কর্তাদের মুখে সতত কথার ফুলঝুরি,—জেলে আটকেছি বটে,—তবে সুখে রেখেছি,—শান্তিতে রেখেছি, পান থেকে চুন খসতেও দিইনি কখনও। যত রকমের সুযোগ সুবিধে সম্ভব—সবই দেওয়া হচ্ছে,—স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দেখভাল্ও করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত,—আর আরামের তো ঢালাও ব্যবস্থাই।—তা ভালই তো, কর্তারা আমাদের ভাল রেখেছেন,—ভাল কথা। প্রয়োজন হ'লে আমি অন্ততঃ লিখিতভাবেও সাধুবাদ জানাতে প্রস্তুত আছি ও-সবের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—অকারণে পুনরায় গ্রেপ্তারের পর ও-ইণ্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে এমন আকস্মিক পরিবর্তন সাধনও কি

আমাদের আরাম ও আনন্দ বর্ধনেরই কারণ? কিন্তু কই,—আমরা তো তেমন উপলব্ধি করছি না! অমন উপলব্ধি করবার কোন হেতুও তো খুঁজে পাচ্ছি না। তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিমত আমরা সাব্যস্ত করলাম,—লিখিতভাবে এ-অবিচারের প্রতিবাদ করব। করলামও।

ফল তো তুমি নিজেই দেখছ প্রিয়া। সদাশয় সরকার আবার সেই আগেকার মত সপ্তাহে সপ্তাহে ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করেছেন। 'ফ্যামিলী মেম্বারস্' এর সঙ্গে 'রিলেটিভস্' শব্দটাও যোগ করেছেন। তবে সরকার তো,—সার্কুলারের খোল নলচে সব পাল্টে দিলে একেবারে মর্যাদা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনা তো,—তাই ও মাথাগুনতির সংখ্যাটা আর পাল্টাননি। সার্কুলার মত সেখানে সেই দুই-ই রেখেছেন। তা রাখুন,—কার্যতঃ তাতে আমাদের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই,—কারণ তুমি জানো,- দুয়েকজন বাড়তি কেউ কখনও এসে গেলেও—কেউ আপত্তি করেন না। না জেল কর্তৃপক্ষ, না এস, বি, র ভদ্রলোকেরা। মোদ্দা—সেই পূর্ব ব্যবস্থাটাই এক রকম চালু হয়েছে আবার। তা এর জন্য সরকারকে ধন্যবাদ দেব নিশ্চয়ই। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এসব বিষয়ে আমাদের বলতে হবে কেন! লিখিতভ্যবে প্রতিবাদ পত্র পাঠাতে হবে কেন!— সরকার নিজে থেকে কেন বুঝবেন না এসব! কেন বুঝবেন না সরকার যে—কারণেই হোক অকারণেই হোক—যাদের তাঁরা এই পাষাণকারায় বন্দী ক'রে রেখেছেন,—যাদের চোখের সামনে এক সুউচ্চ প্রাচীরের অবরোধ তুলে বহির্বিশ্বের তাবৎ দৃশ্যকে অবলুপ্ত করে দিয়েছেন,—সেই সব বন্দীরাও মানুষ!—তাদেরও বাড়ী আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, প্রিয়জন আছে। আছে তারা—যারা এই বন্দীদের কথা অহর্নিশি ভাবে, এদের বিয়োগ ব্যথায় যার পর নাই কাতর হয়,—সপ্তাহে কিছুক্ষণের জন্য একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও অনেকখানি সান্ত্বনা পায়! কেন বোঝেন না

সরকার—যে কারাবাসের দুঃসহ দিনগুলোর মধ্যে এক একটা ইন্টারভিউয়ের সাময়িক ভাবে উন্মুক্ত দ্বার পথ দিয়ে আত্মীয় পরিজনের বিষন্ন মুখচ্ছবিও কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ বয়ে আনে বন্দীর জীবনে! জন-প্রতিনিধি পরিচালিত সরকার—জনগণের আশা আকাঙ্খা, দুঃখ বেদনার প্রতি এমন উদাসীন হতে পারেন কেমন ক'রে! তড়িঘড়ি এমন সার্কুলার তাঁরা কেন বানান যার সঙ্গে মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে নিজেরাই আর বনিবনা করতে পারেন না বলে বাতিল করেন! আসল দুঃখ, প্রকৃত ক্ষোভের কারণটা তো প্রিয়া সেইখানেই।...

আট

ভোজন আর শয়ন,—দিনে রাতে বস্তুতঃ এই দুটোই বড় কাজ। কাজের মত কাজ। বাকী সব ছুটকো ছাটকা,—নিতান্তই সাময়িক। একটু আধটু হয়তো পড়াশুনা করি। কোনদিন হয়তো কিছু লিখতে বসি। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল লাগেনা,—মেজাজ থাকে না। একটু পরেই তাই পাত্তাড়ি গোটাই। সকাল বিকেল কেউ কেউ আসেন দেখা করতে। কিছুসময়—এটা সেটা নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। তারপরেই কেমন তালকাটে। জেলের নির্দিষ্ট সাধারণ সময়-সূচিও অতিক্রান্ত হয়। আগন্তুকেরাও ফিরে যান যে যাঁর ফাইলে। সারাদিনে সত্যিই তাই তেমন কোন কাজকর্ম নেই। দিনের বেশীর ভাগ সময় বাধ্য হয়ে তাই ওপরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকি। চারদিক দেখি। দেখি আর ভাবি।...

প্রথম প্রথম অবশ্য এমনটা ছিল না। তখন নিয়মিত বেশ কিছু কাজ ছিল। দিন রাতের অনেকটা সময়ও কেটে যেত তাতে। সময়টা ভালও কাটত একদিক থেকে।...

তুমি নিশ্চয়ই অবাক হবে আমার কাজের কথাটা শুনে। তা তোমায় দোষ দেবোনা তাতে। কাজ বলতে সাধারণে যা বোঝে সচরাচর,—সে রকম কাজের কাজী যে আমি নই কোনদিন,—তা তোমার চাইতে বেশী আর কে জানবে বল? কিন্তু না প্রিয়া,—আমি সে কাজের কথা বলছি না। সে তো করেন সুশীলদা, ক্ষিতিশবাবু, অশোকবাবু, স্বরাজবাবু,—এঁরা। বেড্‌টি থেকে আরম্ভ ক'রে—ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার,—ও সবই ওঁরা সামলান। আগেও যেমন সামলাতেন, এখনও তাই। সুশীলদাকে তো আবার এসবের শিরোমণি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এক বিমানবাবু প্রথম প্রথম আমার গোত্তরই ছিলেন,—তা বর্তমানে দেখছি—তিনিও সাত সকালে—ব'সে ব'সে টোষ্টে মাখন লাগাচ্ছেন প্রতিদিন। আর আহার্য্য পরিবেশনের দায় দায়িত্ব তো দীনেশদার,—তা সে কিবা দিন আর কিবা রাত্রি।…

তার ওপর আবার জেলগেটে যাবার সমস্যা আছে। মানে জেলারের কাছে যাওয়া, সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এটা পাচ্ছি না, ওটা পাচ্ছি না—বলা। এটা হলো না, ওটা হলো না বলে অনুযোগ তোলা।…এতবার বলা হলো,—তবুও কি মশাই—সিঁড়ির আলো সেই নিভে আছে তো নিভেই আছে? উঠতে নামতে কি পড়ে মরব নাকি আমরা? শ্বাপদ তো-নই মশাই যে রাতের বেলা চোখ জ্বলবে? কি আশ্চর্য! আর—কত ক'রে বললাম সেদিন,—মশাই, মশার চোটে বসতে খেতে পাচ্ছি না,—বিকেল হতে না হতেই প্রাণান্তকর অবস্থা,—রোজ পো-টাক ক'রে রক্ত খোয়া যাচ্ছে প্রতিজনের,—যা হোক একটা কিছু বিলি ব্যবস্থা করুন,—একটু ডিডিটি-মিডিটি ছিটোনোর ব্যবস্থা করুন!—তা না, বকে মরছি তো বকেই মরছি,—ভ্রুক্ষেপও নেই আপনাদের!—এসব কি মশাই? তার ওপর—আপনাদের ওই মণিবাবু।—ও! সার্থক নাম বটে মশাই! মণি ব'লে মণি,—একেবারে সাপের মাথার মণি,—অনেক-

কপাল জোর না থাকলে কি দেখা পাবার যো আছে!—মশাই, দু'হপ্তার ওপর হয়ে গেল—মাল পত্তরের অর্ডার দিয়েছি,—এমন দুষ্প্রাপ্য মালও নয় কিছু যে ঘোরাঘুরি করতে হবে পাঁচ জায়গায়,—টুকিটাকি জিনিষ,—যে কোন দোকানেই মেলে,—কিন্তু তবুও নো পাত্তা ভদ্রলোকের! অথচ—এদিকে আমাদের দুরবস্থাটা দেখুন!—তেল নেই,—তাই রুখো চান করছি।—সাবান নেই,—স্রেফ গামছা ঘ'সে ঘ'সেই শরীর সাফ করছি; পেষ্ট ফুরিয়েছে, তাই টিউবের পেট চিরে ভেতরের আশেপাশে লেগে থাকা পেষ্টের ছিটেফোঁটার ওপর ব্রাস বুলিয়ে বুলিয়ে দাঁত মাজা সারছি। কিন্তু এমন আতান্তরে পড়তে হচ্ছে কেন বলুন তো মশাই? দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার তো নয় কিছু,—হক্কের পাওনা,—আজকের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন।—ও মণি ফনী বুঝিনা আমরা,—মোদ্দা জিনিষগুলো আমাদের এক্ষুনি চাই—বাস্।...

তা এমনি সাত সতের বখেড়া সামলাবার নামই জেলগেটে যাওয়া। আর প্রায় প্রত্যহই এ জাতীয় কোন না কোন সমস্যা দেখা দেয়। অথচ আইন মাফিক সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি করা আছে। জেল কোডে পরিষ্কার ক'রে লেখাও আছে সব। আর সব জিনিষ দেখ্‌ভাল্ করবার আলাদা আলাদা লোকও আছেন। কিন্তু কার্যত সেই—কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে মশাই—ভাব। রাম দেয় শ্যামের দোষ, শ্যাম দেয় রামের। আবার যথাকালে—ও-রাম শ্যাম—উভয়েই নো পাত্তা। তাই মরতে মরণ আমাদেরই কাউকে ছুটতে হয় থেকে থেকে ওই জেল গেটে। একেবারে চুড়োতে গিয়েই চড়তে হয়। জেলার সুপারের কাছেই জানাতে হয় সব। আর গোরাডিগ্রীর বন্দীরা তো,—নেতালোক সব,—তাই তাঁরাও যখন তখন হাসিমুখে সব শোনেন,—চা কফি দিয়ে আপ্যায়ন করেন,—যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন অভাব অভিযোগ মেটাতে। তা এ জেল গেটে যাওয়ার দায় দায়িত্বও নিয়েছেন স্বরাজবাবু ও

অশোকবাবু। মাঝে মধ্যে কখনও সখনও অবশ্য আমাকেও সঙ্গে নেন ওঁরা। কিন্তু সে আমারই প্রয়োজনে। পাছে ব'সে ব'সে একেবারে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ি এই ভেবে।·· তাই বলছিলাম—ওসব কাজ আমাকে কোনদিন করতে হয়নি,—আজও হয় না। এ অকম্মাকে সেদিক থেকে সেই ক্ষেমা ঘেন্না ক'রেই বোধ হয় সবাই রেহাই দিয়েছেন।···

কিন্তু আর এক রকমের কাজও তো আছে প্রিয়া। সেই বলিয়ে কইয়েদের কাজও তো একটা কাজ,—না কি বল? তা ও-কাজে অনেকদিন থেকেই একটা ইয়ে মতনই আছে তো আমার! তাছাড়া পেশায় প্রফেসার। এখনও লোকের ধারণা—প্রফেসারদের পেটে কিঞ্চিৎ বাড়তি বিদ্যে থাকে। তারওপর—যেমনই হোক—রাজনৈতিক নেতা ব'লে খ্যাতি অখ্যাতি যাহোক একটা রটেছে বহুদিন থেকে। সংবাদপত্র ও আকাশবাণীই বড় ভূমিকা পালন করেছেন এ ব্যাপারে। সরকারও মর্যাদা দিয়েছেন সেই রকম।—আজও দিচ্ছেন এই জেলে আটকে রেখে।—এ জেলে আসবার পর থেকেই তাই কিঞ্চিৎ জন সমাগমও আমার কক্ষটিতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা। কখনও রাজনীতি, সমাজনীতি, এই সব।—কখনও বা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ভিন্ন স্তরের বস্তু। আর ও-আলোচনা তো নামেই,—আসলে আমিই বক্তা, বাকী সব বড় জোর প্রশ্নকর্তা।

এতো গেল বাইরের লোকের কথা। আমাদের নিজেদের মধ্যেও তো অনুরূপ আসর বসতো। সন্ধ্যায় তো নিয়মিত। তা এতগুলি রাজনৈতিক লোক এক জায়গায় রয়েছি যখন, রাজনীতি সংক্রান্ত কথা তো উঠতই। বিশেষ রোজই যখন একটা না একটা উত্তেজক সংবাদ আসছে দেশের ভেতর বা বাইরে থেকে। আর ও রাজনৈতিক আলোচনার আসর বসলে অবশ্য কারো এক চেটে বক্তৃতার সুযোগ থাকত না। কারণ, সকলেই এক গোত্তর তো,

তায় ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতা, নিজের নিজের বক্তব্য কিছু আছেই সব ব্যাপারে। কিন্তু সব সময়ে, সব দিনে তো আর ও-রাজনীতির রাজ্যপাঠ থাকত না। মাঝে মাঝে সাহিত্য-আসরও বসত। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির কথাও উঠত। এমনকি নিছক আধ্যাত্মিক আলোচনাকেও অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হতো। ননীবাবুর বাড়ীর লোকেরা আবার বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত। তিনি আবার মহাপ্রভুর জীবন ও দর্শন প্রসঙ্গ তুলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও বাদ পড়তেন না। তা এসব ক্ষেত্রে এ-শর্মার কিঞ্চিৎ বোলবোলাও আছে তো বাইরে, তাই বোধ করি এ জেলের আসরেও সকলে মুখ্য ভূমিকা দিতেন আমাকে। আবার কোনদিন হয়তো এ জাতীয় কিছুই নয়। রকমারি আসরই বসল একটা। ভূতের গল্প, হাসির গল্প, এই সব। তা এসব ব্যাপারে আমার ষ্টক্ কেমন তাতো জানো। এক আধটা ছাড়তেই ক্রমশঃ ও-আসরটা প্রায় আমার দখলেই এসে গেল। আর এই সব আসরের মধ্য দিয়ে সময়টাও অন্যথায় বেশ কেটে যেতো।···

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন আর তেমন আসর বসে না। বসলেও দু'দণ্ড এটা সেটা আলতো কথাবার্তার পর কেমন যেন কথার খেই হারিয়ে যায় সকলের। যে যার নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন। সন্ধ্যের সে আসর এখন অন্যরকম। কোথা থেকে রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে এসে বিমানবাবু সুর ক'রে ক'রে পড়েন। স্বরাজবাবু আর অশোকবাবু তাই মন দিয়ে শোনেন। ওরই মধ্যে অশোকবাবু আবার পদ্মাসন ক'রে ব'সে থাকেন মাঝে মাঝে। বাকী আমরা সব যে যার ঘরে বইটই প'ড়ে সময়টা কাটাই। ক্ষিতিশদা আবার চরকাও কাটেন, হাঁটু গেড়ে ব'সে কি সব জপতপও করেন। অন্য ওয়ার্ডের লোকজনের আনাগোনার বহরটাও ইদানীং অনেকটা কমে গেছে। কিছুটা তো জেল কর্তৃপক্ষ কমিয়েছেন। কিছুটা হয়তো আমাদের সে মুডের অভাবেই কমেছে। তবে একটি

মানুষের আসা যাওয়ায় রকমফের ঘটেনি কিছু, সে ওম প্রকাশ। যথারীতি সে দু'বার করে আসে। যতক্ষণ পারে এখানেই ওঠে, বসে। যেমনই হোক, কাজ এখন আমার অনেক কমেছে। তাই বলছিলাম,—অনেক সময় ওই বারান্দায় চুপচাপ ব'সে থাকি, আর চারদিক দেখি। দেখতে দেখতে ভাবিও অনেক কথা।...

তা ও দেখবার বস্তুই কি আর আছে তেমন আগেকার মত! একদিন নীচেকার বাগান জুড়ে কত ফুলের গাছ ছিল। রং বেরঙের কত ফুল ফুটে থাকত তাতে। সর্বত্র কত রকমারি বড় বড় গোলাপ, দেখে দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যেতো। কামিনী ফুলের গাছটা ছেয়ে থাকত সাদা সাদা ফুলে। বাতাসে বাতাসে গন্ধ বিলোত সারাক্ষণ। রাতের বেলায় হাসনা হানার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে যেত। গন্ধরাজের গাছগুলোতে অজস্র ফুল ফুটত প্রতিদিন। রজনীগন্ধা আর দোপাটির তো অরণ্য মতনই তৈরী হয়েছিল চতুর্দিকে। সময় পেলেই চেয়ে চেয়ে দেখতাম ওদের। দেখতাম কত কত জানা অজানা পাখীরা এসেও ভীড় জমাত ফুল বাগানে। কিন্তু হায়! এখন আর সে সব বড় কিছু নেই। প্রায় সব শূন্য।...

তা প্রথমটায় শুরু করেছিলেন অশোকবাবুই। অকস্মাৎ কোথা থেকে গাছ ছাটা সেই লম্বা কাঁচিটার মত যন্ত্রটা নিয়ে এসে খচাখচ সব কাটতে শুরু করলেন। কি ব্যাপার? না, এ সময় ছাটলে গাছগুলো সব তেজী হবে, দেদার ফুল দেবে,—ফুলগুলো আরও বড় ও ভাল হবে। তা ভাল হলেই ভাল, ভাল কাজে কে আর আপত্তি করবে, বল? তা ও-গাছ ছাটার কাজ চলল ক্রমাগত ক'দিন ধরেই। এমনকি একই গাছের ওপর কোপ পড়তে লাগল একাধিক দিন ধ'রে। যে গাছটাকে আগের দিন ছেটেছুটে বেশ মনোমত হলো ভেবে ছেড়ে দিলেন, ব্যস, ঠিক পরের দিনই আবার ওরই অঙ্গ সজ্জায় নতুন ক'রে ব্রতী হলেন। শেষপর্যন্ত গাছগুলোর অবস্থা যা দাঁড়ালো তাতে ভবিষ্যতে বাড় বাড়ন্ত হবার

কথা থাক, বর্তমানে কোন মতে দাঁড়িয়ে থাকাটাই ওদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দুই একটা হেলেও পড়ল। কোন মতে ঠেকা দিয়ে রাখতে না পেরে দীনেশদা আবার কয়েকটাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে জায়গা পরিষ্কার করলেন। রজনীগন্ধার আবার এমনিতেই কমনীয় শরীর, কঠিন আঘাত বড় প্রাণে সয়না, কয়েকবার কাঁচির ছোঁয়া লাগতেই অর্ধেক গাছ তো হেলে পড়লই, কিছু আবার কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। আর দীনেশদা তো তক্কে তক্কে ছিলেনই, যাচ্চলে—ব'লে একদিন মুঠো মুঠো ক'রে উপড়ে তুললেন মুমূর্ষুগুলোকে।···

তবে দীনেশদার ক্ষেত্রে নেহাৎ সেই 'ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক' নয়। উপড়েও ফেলছেন যেমন, তরিবৎও করছেন তেমনি। থেকে থেকে গাছগুলোর গোড়ায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটিগুলোকে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছেন, আলো হাওয়া ঢোকবার ব্যবস্থা করছেন, ঝারি দিয়ে জলসিঞ্চন করছেন। তা করছেন সবই, কিন্তু ও-সব কর্ম করার প্রয়োজন তখন অবশ্য নিতান্তই সীমিত। কারণ, সাজানো বাগান তো প্রায় শুকিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে।···

তা এত কাণ্ড করেও অশোকবাবু, দীনেশদা তবুও যেমনই হোক একটা ফুলবাগান মতন রেখেছিলেন। কিন্তু ক'দিন বাদে সুশীলদা আসরে নেমে একেবারে ভোলই পাল্টে দিলেন জায়গাটার। দুটো ভলানটিয়ার সঙ্গে নিয়ে দাদা এলোপাথাড়ি কোদাল চালাতে লাগলেন। বড় বড় মাটির চাঙ্গ উঠতে লাগল প্রথমটায়। তা ও-মাটির চাঙ্গের সঙ্গে অবশিষ্ট ফুলগাছগুলোও প্রায় সব শেকড় সমেত উঠে আসতে লাগল। তারপর আর কদিনের মধ্যেই যেদিকে চোখ যায়—শুধু ঝুরঝুরে মাটি, আর মাটি!

কিন্তু শুধু মাটিই তো আর সব নয়। জলও চাই। জল না হ'লে তো মাটি থেকেও সব মাটি। অতএব জলের বন্দোবস্তের জন্য সেই সেচাইয়ের ছক কাটা ব্যবস্থা। সারা বাগানটা কেমন দাবা পাশার

ছকের মত দেখাতে লাগল। কোনটা গোলাকার, কোনটা চতুর্ভুজ, আবার কোনটা বা ত্রিভূজই একটা,—এমনি সব কাটা কাটা ছোট ছোট প্লট। সবার সব পাশ দিয়ে আবার জল বয়ে যাবার ব্যবস্থা। আর নেহাৎ আন্দাজের কারবার নেই কোথাও। একেবারে দড়ি ধ'রে জরিফ ক'রে ক'রে জমি বিভাজন। তা শুধু ওতেই তো সব হবে না। বাগানের মাঝখানকার বাঁধানো রাস্তাটা থেকে দূরের দূরের প্লটগুলোর জলসেচের ব্যবস্থাও ভাবতে হবে। তা ভাবা হলো সে কথা, এবং ওই সুবাদেই কোথা থেকে অনেকগুলো থান ইট নিয়ে এসে কাদার গাঁথুনি দিয়ে বেশ একটা সড়ক মতনই বানানো হলো জমির মাঝখান দিয়ে। ব্যস, প্রয়োজনীয় বিলি ব্যবস্থা এতেই সমাপ্ত। তারপর বীজ ছড়ানো, চারা লাগানো, এসবও সব কমপ্লিট হয়ে গেল একদিন। পালন শাক, নটে শাক, মূলো, মটর কলাই, সরষে, কফি, বেগুন,—নানা ভাবী স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে জেগে রইল ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূমিখণ্ড। অর্থাৎ একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই ঘটালেন সুশীলদা। কালচার থেকে এগ্রিকালচার···

কিন্তু ওখানেও যদি থামতেন দাদা,—তাহলেও কিছুটা থাকত। অশোকবাবু হাজার ছাটকাট করলেও সেই যাকে বলে ঝাড়া হাত পা হয়েও কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু ফুল-টুলও দিচ্ছিল। কিন্তু জমিতে যথেষ্ট রোদ লাগছে না, আর ওই গাছগুলার জন্যই অমন রৌদ্রাভাব ঘটছে এই কারণে ও-গাছগুলোর দিকেও দাদার দৃষ্টি পড়ল! ব্যস, তারপর তো মুহূর্ত কয়েকেরই কারবার। গোলক-চাঁপার গাছ দুটো একেবারে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ধরাশায়ী হলো, গন্ধ-রাজের ডালগুলো সব মট্ মট্ করে ভেঙ্গে ফেলা হলো, কামিনী গাছ ক'টার অবস্থাও যার পর নাই করুণ, একেবারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন ন্যাড়া কন্ধকাটা বিশেষ। তবে সব চাইতে বেশী চোট খেলো হাসনাহানা। একেবারে চরম অবস্থা দাঁড়ালো তার। স্রেফ ক'টা ছোট ছোট

কাঠি রূপেই সূর্য সাধনা শুরু করলো বেচারী। ব্যস, এবারে একেবারে নির্ভেজাল এগ্রিকালচার! নিতান্তই এক কৃষিসমাচার!…

তা ও-কৃষিবৃত্তান্তের আরও একটু বাকী ছিল বোধ হয়, তাই ক'দিন পরে দেখলাম ভূখণ্ডগুলির চারপাশে সার সার ছোট ছোট কাঠি পুঁতছেন সুশীলদা। তারপর কাঠি পোতা শেষ হলে লাল নীল সব সুতো ওই কাঠিতে কাঠিতে জড়িয়ে সব ভূখণ্ডগুলোর ওপরে কেমন এক জাল মতনই বুনে দিলেন। অবাক্ হয়ে ব'সে ব'সে সব দেখলাম। শেষটায় থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার দাদা? তা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন দাদা সহজেই। ঠিক ফাঁদ নয়, তবে ফাঁদেরই ভয় ধরাবার আয়োজন। চড়ুই, শালিক, —এরা নাকি খুটে খুটে জমিতে বোনা বীজগুলো সব সাবড়ে দেবার তালে ছিল। তাই ওই ফাঁদের ভয় দেখানো। দূর থেকে যখনই দেখবে, আর ধারে কাছে আসবার সাহস পাবে না বাছাধনরা। তা ভাল! সত্যিই তো, বীজগুলোই যদি খেয়ে ফেলে সব, শুরুতেই খোয়া যায় যদি মূলধন, তাহলে সবুজ বিপ্লবের তো প্রারম্ভেই পরি-সমাপ্তি। অতএব সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল!…

কিন্তু প্রিয়া,—ও সবুজ বিপ্লবে তো সময় লাগে। ওঠ, বললেই তো ওঠে না গাছগুলো। সবুজের সমারোহ তো একদিনে হয় না। যখন হবে সে সব, সারা বাগান জুড়ে শাক কফি হবে, মুলোগাছ তবতরিয়ে বাড়বে, মুক্তকেশীর গাছগুলো গাছের মত হবে, তাতে দু'চারটে মুক্তকেশী ঝুলবে, তখন না হয় চেয়ে চেয়ে দেখবার মত বস্তু পাব সামনে। ফুলের যথাযোগ্য বিকল্প নয় অবশ্য, তবুও দেখতে তেমন খারাপ লাগে না কিছু। তা ছাড়া ও-সব তো নয়নানন্দ বস্তুই নয় কেবল, উদরানন্দও বটে তো, তাই নেহাৎ চোখ ফিরিয়ে নেবার যো তো নেই কোন মহাজনের। কিন্তু আসল কথাটা তো তা নয়। আপাততঃ তো কিছু নেই দেখবার মত। শুধু মাটি আর রঙ্গীন সুতোর হিজিবিজি। তা স্থির হয়ে অমন বস্তু দেখতে চাইবে কেন

নয়ন—বল? তাই বলছিলাম,—দেখবার বস্তু কি আর আছে তেমন চারিভিতে!···

তা নীচের ও-ফুলবাগান ছাড়াও আরও একটা বড় দ্রষ্টব্যও ছিল তখন। ধারে কাছেই ছিল। অজস্র ছিল। তা আজ আর তাদের একটাও নেই। এ সময় থাকে না। বছরের সামান্য দুয়েক মাসই মাত্র তারা থাকে। থাকে গ্রীষ্মকালে। তখন তাই দেখেছি ওদের। আমাদের গোরাডিগ্রির আমগাছ দুটোতে, পাম গাছগুলোর মাথায়, আর আশেপাশের প্রায় সব আমগাছে, দেউদার বৃক্ষে, সর্বত্র। সাধারণ পরিচিত বক নয়। সুশ্রী, তবে একটু অদ্ভুত দর্শন বক,— ঝাঁকে ঝাঁকে সব আস্তানা গেড়ে বসত তখন। গাছগুলোর একেবারে ডগার দিকে খড়কুটো, আরও সব কি কি দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসা বাঁধত। দিনে রাতে সর্বদা ক্যাক্ ক্যাক্ ক'রে বিকট আওয়াজ করত। ডানা ঝাপটাত জোর শব্দ ক'রে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে লম্বা ডানা মেলে আকাশে পাক খেত নানা ভঙ্গীমায়। ব'সে ব'সে ওদের দেখতে বেশ ভাল লাগত।···

কিছুদিনের মধ্যেই আবার ওদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখলাম। নীড়ে নীড়ে নবজাতকেরা আত্মপ্রকাশ করল। পালকহীন ধূসর দেহ, লম্বা ঘাড়, তদোধিক লম্বা ঠোঁট। বিশ্রীদর্শন শিশু। আর বসবার ভঙ্গীটাও কেমন অদ্ভুত। ঘাড়টা উঁচু ক'রে, মাথাটা বেঁকিয়ে, কেবল লম্বা ঠোঁটটা জাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সারাক্ষণ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—পাখীর বাচ্ছা তো নয়, যেন অসংখ্য সাপই ফণা তুলে ব'সে আছে অমন গাছের ডালে ডালে। মাঝে মাঝে ওদের মায়েরা কোথা থেকে উড়ে এসে ওদের কাছে বসে। ঝিম মেরে ছবির মত বসে থাকা বাচ্চাগুলো অকস্মাৎ তখন কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কুয়াক্ কুয়াক্ ক'রে আওয়াজ করতে করতে প্রকাণ্ড ঠোঁট দুটো ফাঁকা করে। কি জানি কি বস্তু মায়েরা ওদের ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে গুঁজে দেয়। ব্যস, তার পরেই আবার উড়ে চলে যায়

মায়েরা। কিন্তু বাচ্চাদের বোধ হয় পেট ভরেনা ওই একবারের আহার্য্যে। খানিকক্ষণ অমনি কাঁপতে কাঁপতে কুয়াক্ কুয়াক্ করে; কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য আবার সেই শান্ত ছবিটি আগেকার মত।

মাঝে মধ্যে অবশ্য কাকের জ্বালাতেও একটু অস্থির মতন হয় বাচ্চারা। কেন জানিনা—ঝাঁকে ঝাঁকে কাক গিয়ে মাঝে মধ্যে বসে ওদের কাছে। এ ডাল থেকে সে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। বাচ্চাদের এক রকম রাগের ডগাতেই করে অমন। তা তখনও বাচ্চারা একটু ছটফট করে, কুয়াক্ কুয়াক্ ডাকে। কিন্তু সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কেমন করে জানি বাচ্চাগুলো ঠিক শত্রু মনে করে না কাকগুলোকে। পরক্ষণেই আবার শান্ত হয়ে যায়। তা কাকেরা যে সত্যিই শত্রু নয় ওদের, তা তো রোজই দেখতে পেতাম। ববং একদিনের ঘটনাতে তো বড় মিত্র বলেই মনে হলো ওদের।...

ঘটনাটা বলি—শোনো। তখন সকাল নটা কি সাড়ে নটা। সবে প্রাতরাশ ও তৎকালিক কিছু গল্পসল্প শেষ ক'রে ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। বাচ্চাগুলোও যেমন এমনিতে পটে আঁকা ছবির মত রোজ বসে থাকে তেমনিই রয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে জানিনা—একটা বিরাটাকার শকুন বিকট শব্দ ক'রে বাচ্চাগুলোর সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে আর্ত চীৎকার করে উঠল বাচ্চাগুলো। আর কি আশ্চর্য দেখ প্রিয়া,—আমিও কেমন অজান্তে চীৎকার ক'রে উঠলাম ওই দৃশ্য দেখে। নিশ্চিতই বুঝতে পারলাম—শকুনটার ওস্থলে অমন আগমন অহেতুক নয়। বাচ্চাগুলোর অমন নিদারুণ চীৎকারও অকারণ নয়। ওদের মায়েরাও কেউ ধারে কাছে নেই তখন যে—ও-দানবের গ্রাস থেকে ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে। অথচ—আমিই বা এতদূর থেকে কি করতে পারি! কি করা সম্ভব আমার পক্ষে! কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো,—ওই কাকেরাই শেষপর্যন্ত দানবটাকে তাড়ালে। বাঁচ্চাগুলোকে বাঁচালে।

কিভাবে যে খবর পেল সব কে জানে,—হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক ছুটল ওই গাছটার দিকে।—কেমন ক্ষিপ্রগতিতে ডাইভ মতন করে করে শকুনটার সর্বাঙ্গে মোষ্টম ঠোক্কর বসাতে লাগল সব শকুনটাও ঘাড় নীচু করে করে অনেকক্ষণ ওদের মার সামলাতে লাগল। তারপর বোধহয়—অপারগ বোধে লোভ ত্যাগ ক'রে লম্ব দিলে। আর কাকেরাও দেখলুম—বাহাদুর লড়িয়ে। শকুনটা যে পালাচ্ছে—তাতেও নিষ্কৃতি নেই। ডজন খানেক কাক আবার পিছু নিলে ব্যাটার,—একেবারে সেই যাকে বলে—ত্রিসীমানা পার করিয়ে দিয়ে তবে ফিরে এলো। তা ও-কার্যোদ্ধার হলো বলেই—কেউ স্থানত্যাগ করল না কিন্তু। ওই গাছেই বসে বসে খানিকক্ষণ কা ক করে ডেকেডুকে বাচ্চাগুলোকে বোধহয় সাহস দিতে লাগল,—ভয় কি?—আমরা তো রয়েছি! তা বাচ্চাগুলোও বোধহয় বুঝতে ওদের কথা। আবার কেমন নিশ্চিন্তে ঠিক আগেকার মত সেই ছবি হয়ে গেল!···

সত্যিই,—এই জেলে বসে ওই কাক নামক প্রাণীগুলোকে যতই কাছ থেকে দেখছি,—ওদের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করছি,—ততই কেমন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি! এতাবৎকাল ওদের সম্বন্ধে একট অবিমিশ্র বিরূপ ধারণাই পোষণ করেছি। যেমনি রূপ, তেমনি গুণ,—সব দিক থেকেই একেবারে সরেস জীব। আর আওয়াজ তো একেবারে মধুক্ষরা! ছেলেবেলাতেই কবিও শুনিয়েছেন—'কাকের কর্কশ রব বিষ্ ঢালে কানে'। আবার ওই কাককেই বোধকরি—অধিকতর হেয় করবার জন্যই কোকিলকে আমদানি করেছেন কবি বলেছেন—'কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।' তা এমনিতে কোন আপত্তি নেই এসবে আমার। কিন্তু কাক যে একেবারে নির্গুণের পর্যায়ে পড়ে—এমনটা মানাতেই আমার আপত্তি। রোজই দেখছি তো ওদের। কি অসাধারণ সামাজিকতা ওদের! কি বিরল সংঘবদ্ধতা! আবার কত স্নেহ, কত ভালবাসা পরস্পরের প্রতি!

সর্বোপরি অসহায় প্রাণীকে রক্ষা করবার জন্য কী ঐকান্তিক প্রয়াস ওদের।...

এই তো ক'দিন আগেকার কথা। একটা শালিকের বাচ্চা মা বাপের সঙ্গে ওড়ার পাঠ নিচ্ছিল। ছাদ থেকে স্বর্ণচাঁপার গাছে। সেখান থেকে আবার পাঁচিলের ওপরে। দিব্যি অল্প দূরত্বে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু একবার বোধহয় উৎসাহিত হয়ে--আরও একটু লম্বা পাড়ি জমাতে গেল,—ব্যস্, মুখ থুবড়ে একেবারে মাটিতে গিয়ে পড়ল। আমাদের ওয়ার্ডের বাগানের মধ্যেই পড়ল। বাচ্চাটার মা বাপে তো ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই নীচে নেমে এল। জানিনা ওই চীৎকার ছাড়া এমনিতে ওরা আর কিভাবে সাহায্য করতে পারত বাচ্চাটাকে। কিন্তু সেরকম কোন সুযোগ ওরা পাবার আগেই কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেল। চক্ষের পলকে একটা মোটা সোটা হুলো বেরাল কোথা থেকে যেন ছুটে এসে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস, বাচ্চাটাও তাল বুঝে ফুড়ুৎ করে উড়ে আরও একটু দূরে গিয়ে পড়েছিল,—নইলে হয়তো সেই এক লহমাতেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো বেচারীর। তা ও-বেরালকে অমন তাক করতে দেখে—বাচ্চাটার মা বাবাও তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে। আমিও ওপর থেকে বেরালটাকে তাড়া দিতে লাগলাম। নীচে থেকে অশোকবাবুও ছুটলেন অকুস্থলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাচ্চাটা সেদিন বাঁচত না যদিনা ওই কাকেরাই আগে থাকতে ওকে বাঁচিয়ে রাখতো। আশ্চর্য প্রিয়া, মুহূর্তের মধ্যেই কেমন গোটাকতক কাক ছোঁ মেরে নীচেয় নেমে এসে বেরালটকে ঠোকরাতে লাগল। আর কি—অপূর্ব রণকৌশল ওদের--কি বলব? কেমন যেন বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলল বেরালটাকে। বেরালটা তাড়া করবার আগেই একজন একদিক থেকে ঠুকরে একটু দূরে সরে যায়। বেরালটা স্বভাবতঃই ওদিকটায় তেড়ে গেল একটু,—ব্যস্, পেছন দিক থেকে অমনি আর একজনে মোক্ষম ঠোক্কর চালালে। তারপর—

এদিকে এলো তো ওদিক থেকে ঠোক্কর। এপাশে যায় তো ওপাশ থেকে আক্রমণ। তা এমন চারিদিক থেকে বেমক্কা মার খেয়ে খেয়ে বেরালটা হয়তো শীকার ছেড়ে ভাগতই শেষপর্যন্ত,—কিন্তু তার পূর্বেই অশোকবাবু গিয়ে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তারপর দোতলায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণচাঁপা গাছের উঁচু একটা ডালে বসিয়ে দিলেন তাকে। বাচ্চাটার মা বাপও ডাকতে ডাকতে এসে বাচ্চাটার পাশে বসল। বাচ্চাটাও বোধ করি বাঁচল। এযাত্রা তো নিশ্চয়ই।···

তা ওই কাক প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এটা সেটা খাওয়ার তালে তো ঘোরেই সারাদিন বেচারীরা। ঘুরতেই হয় অমন। প্রকৃতিই প্রয়োজন মত অমন প্রকৃতি দিয়েছেন ওদের। কিন্তু সকাল বেলা আমরা যখন নীচেয় বসে ব্রেকফাষ্ট করি,—তখনকার দৃশ্যটারই উল্লেখ করব এপ্রসঙ্গে। তা যদিও একই সময়েই আমাদের চা-টা খাবার কথা, কিন্তু আমার কেন জানি দেরী হয়ে যায় প্রতিদিন। আর ওই প্রতিদিনই দলে দলে কাক সব এসে হাজির হয় আমার সামনে। তা খান তো অমন সকলেই,—দেনও ওদের সকলে কিছু কিছু,—কিন্তু কি আশ্চর্য,—যতক্ষণ আমি এসে আসরে না বসছি—ততক্ষণ অঞ্চলটা প্রায় ফাঁকা। কেউ নেই বললেই চলে। কিন্তু যেই আমি মাখন মাখানো টোষ্ট, ডিম প্রভৃতি নিয়ে বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াব,—অমনি সব যেন শূন্য থেকেই ডানা মেলে এসে জুটবে। ধীর স্থির শান্ত হয়ে সব সামনে দাঁড়াবে। এক আধজন আবার সিঁড়ির ওপরও উঠে আসবে। কোন ভয়ই নেই যেন আমার সম্বন্ধে। তা মিথ্যে বলব না,—ওদের জন্য আমাকে বাড়তি টোষ্ট ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা রাখেন বন্ধুরা। আমিও মনের আনন্দে ওদের খাওয়াই প্রতিদিন। ওরা যখন লুফে লুফে ধরে,—দেখতে বেশ লাগে। অনেকে তো শূন্য থেকেই লুফে নেয়,—মাটিতে ফেলবার অবকাশ দেয়না। আবার কি আশ্চর্য দেখো, যেই আমি খেয়ে দেয়ে

ওপরে উঠে যাব,—অন্যান্য কেউ কেউ হয়তো তখনো খাচ্ছেন,—কিন্তু না,—ওরা আর কেউ নেই। স্থানান্তরে উড়ে গেছে সব। আশ্চর্য নয়?…

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সব বাচ্চাকে কাকেরা বাঁচাতে পারে অমন? সব প্রয়াসই কি ওদের সফল হয়? হয়না প্রিয়া,—তা হয়না। ওরা শকুনকে তাড়াতে পারে,—বেড়ালকে রুখতে পারে,—কিন্তু মানুষের মোকাবেলা করবে কোন্ সাহসে? কোন্ শক্তিতে বল? ওই বকের বাচ্চা সম্বন্ধেই বলি। ওদের প্রতি লোভ দেখলাম অনেক মানুষেরও। রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক—নির্বিশেষে সকল বন্দীরই। তক্কে তক্কে থাকেন দেখি অনেকেই, কোন্ সুযোগে বাসা থেকে পেড়ে নিয়ে আসা যায় গোটাকতক। লাঞ্চ বা ডিনারটা জমকালো করা যায় কি করে ওদের দিয়ে। তা আমাদের বাগানের মধ্যেকার গাছগুলোই ওঠার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধেজনক। তাই নজরটা এদিকপানেই বেশী সকলের। কিন্তু আমরাও ওৎ পেতে থাকি,—কক্ষনো না,—অমন অপকর্ম আমাদের এখানে ঘটতে দেব না কিছুতেই। তবুও ওরই মধ্যে একদিন অজান্তে দুজন উঠে পড়েছিল একটা গাছে,—বাসাতক প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিল চুপি চুপি. আমরা শেষপর্যন্ত হাঁকডাক করে নামালাম ওদের। কিন্তু আমাদের পাঁচিলের ওপাশে এক ছোট আমগাছের ডগা থেকে অনেকগুলো বাচ্চা খোয়া গেল একদিন।

প্রথমটায় আমরা বুঝতে পারিনি কিছু,—কাছাকাছি হলেও আমাদের ওয়ার্ডের বাইরে তো,—হঠাৎ বাচ্চাদের আর্ত চীৎকারে এবং অগণিত কাকের কর্কশ কা কা রবে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। কিন্তু ভাল করে দেখতে না দেখতেই—অনেক বাসা শূন্য ক'রে কারা যেন দ্রুতগতিতে গাছ থেকে নেমে আসছে বুঝতে পারলাম। আমি আর অশোকবাবু ছুটে গেলাম ওদিকে। দুটো বাচ্চা সমেত একটা কন্‌ভিক্‌টকে পাকড়াও

করলাম। কিন্তু বাকী বাচ্চাদের নিয়ে অন্যান্য আসামীরা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। তা ওই লোকটাকে দিয়েই আবার বাচ্চাদুটোকে তাদের বাসায় বসিয়ে দিয়ে এলাম আমরা। কিন্তু তখনও দেখলাম কাকেরা কেমন চীৎকার ক'রে—লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে সারা গাছময়। তাদের সে চীৎকার কিন্তু অনেকক্ষণ অবুধি থামেনি এর পরেও। দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম,—ওই দুটো বাচ্চাকে ঘিরে তখনও যেন তারা প্রহরারত। ওদের ডাক শুনে মনে হলো—হারানো বাচ্চাগুলোর জন্যেও যেন ওরা মর্মাহত। লোভী মানুষের হাত থেকে তাদের যে ওরা বাঁচাতে পারেনি তার জন্যও যেন লজ্জিত!—হতাশাগ্রস্থ!…

তা ও-কাকেরা আগেও ছিল, এখনও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু পূর্বেকার অনেক কিছুই আজ নেই। সে বকেরা নেই। তাদের বাচ্চারাও নেই। শালীক বাচ্চাও কিছু রোজ রোজ চোখের সামনে এসে বেঘোরে পড়ছে না। তাই সেদিক থেকে দেখবার জিনিস আজ এমনিতেই অনেক কমে গেছে। কিন্তু তবুও চেয়ে থাকলে আছে বইকি দেখবার মত অনেক কিছু।

ওই যেমন মিষ্টি হলদে পাখীটা। সারাদিনে কতবার যে কত ছুতোয় বাগানে আসে—তা আর কি বলব! আসে, আর কেন জানি—কখনও ছোট্ট আমগাছের চারাটাতে, কখনও বা পেয়ারা গাছটাতে,—অহেতুকই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। এদিক ওদিক তাকায়। এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে বসে অমন। তারপর আবার যেমন হঠাৎই এসেছিল, তেমনি হঠাৎই একসময় উড়ে পালায়। কিছুক্ষণ পরে আবার আসে, আবার যায়। হয়তো—একটা পাখীই ফিরে ফিরে আসে না অমন। অনেকগুলোই হয়তো আসা যাওয়া করে। আমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারি না। তা হতে পারে। কিন্তু কেন জানি আমার মনে হয়—ওই একটাই আসে অমন বারবার। ধারে কাছে জলাশয় নেই,—মাছও তেমনি সন্তরণশীল

নয় কেউ, তবুও একটা মাছরাঙ্গা পাখী কেন জানি মাঝে মাঝে এসে রূপের ডালি সাজিয়ে নির্বিকার বসে থাকে সামনের পাঁচিলটার ওপরে। আবার এক সময় অকারণেই বর্ণাঢ্য ডানা মেলে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

সামনের ডানহাতি রেকর্ড রুমটার ছাদের আলসের ওপর প্রায় প্রতিদিনই দেখি—দুটো ছোট আকারের বিশ্রী রংএর কাঠবেড়ালীকে। সত্যিই,—কাঠবেড়ালীর অমন রং আমি আগে দেখিনি। আর অমন ক্ষুদে ক্ষুদে আকারেরও না। তা ওই কাঠবেড়ালী দুটো স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে লেজ নাচাতে নাচাতে,—ঘাড়টাকে এদিকে বেঁকিয়ে ওদিকে বেঁকিয়ে,—লাফাতে লাফাতে খানিকটা যায়। আবার কি ভেবে থেমে পড়ে। দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় পরস্পরকে কেমন আদরও করে। আবার কোথাও একটু শব্দ হলেই চকিতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় দুটিতেই। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আবার আসে,—খুঁটে খুঁটে এদিক থেকে সেদিক থেকে কি সব যেন খায়। খানিক পরে আবার কোথায় যেন গা ঢাকা দেয়। চড়ুই শালিকের ঝাঁক তো আছেই সারাক্ষণ। আসছে, যাচ্ছে, কিচির কিচির করে মাতিয়ে রাখছে গোটা অঞ্চলটাই। পায়রা গলা ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে সেই বকম্ বকম্ তো সর্বত্রই,—সারাটা দিন। ওদের অনেকগুলো আবার থাকেই আমাদের দোতলার বারান্দার থামগুলোর ওপরে। তা রাত্তিরেও অমন বকম্ বকম্ শব্দ শোনা যায় অনেক সময়। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও কানে আসে। আবার প্রতিদিন সূর্য্য যখন পাটে বসে পশ্চিম আকাশে, টকটকে লাল গোলাকার পিণ্ডটা যখন দূরে ডান দিকের হাসপাতালটার পেছনে প্রায় আত্মগোপন করতে উদ্যত হয়, —দিনের আলো প্রায় নিভু নিভু হয়ে আসে যখন,—সারা আকাশ জুড়ে লম্বা লম্বা সরু সরু কালো দেহ বাতাসে ভাসিয়ে—পান কৌড়ির ঝাঁক দিকে দিগন্তরে উড়ে উড়ে বেড়ায়। সত্যিই, আকাশটা যেন

কাল হয়ে যায় তখন। দেখতে বেশ লাগে ব'সে ব'সে।...

দেখতে ভাল লাগে 'বুড়ী' আর তার বাচ্চা দুটোর খেলাও। বাচ্চা দুটো নিজেদের মধ্যেই বেশীর ভাগ খেলাধুলো করে। দৌড়ে দৌড়ে বাগানময় বেড়ায়। কখনও বেয়ে বেয়ে কোন গাছেও উঠে পড়ে খানিকটা। তরতরিয়ে আবার নেমেও আসে সময় বুঝে। আবার বাঘেরই মাসী তো, তাই বাঘের মতই কেমন আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে নিঃশব্দে চলে, কাছাকাছি গিয়ে এ ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে একেবারে সেই বাঘেরই মত। দু'জনের মধ্যে খানিকটা হুটোপুটি হয়,—আবার যেকে সেই,—নিজের নিজের মধ্যেই আবার সেই ছুটোছুটি খেলা,—গাছে ওঠা, আর সুশীলদার ক্ষেত নষ্ট করার খেলা। মাঝে মাঝে হুটোপুটি খেলতে খেলতে বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলে কেউ,—দু'জনে তুলকালাম লেগে যায় তখন। মা বুড়ীটা তখন দৌড়ে গিয়ে থাবা দিয়ে ওদের চিৎ করে ফেলে দেয়,—আঁচড়ে কামড়ে শাসন করে। কিন্তু পরক্ষণেই বাচ্চাদুটো কেমন মায়ের কোলের ভেতর নেতিয়ে শুয়ে পড়ে! বুড়ী সর্বাঙ্গে চেটে চেটে ওদের আদর করে তখন।—কি সুন্দর, স্বর্গীয় সে দৃশ্য প্রিয়া—তা আর কি বলব!...

এ বুড়ী আর তার বাচ্চারা অবশ্য আগে এখানে ছিল না। বুড়ী আগে ছিল ছাতা কামানের মেট্ মোতাবেকের পিয়ারের বেড়াল। কোথা থেকে দুধ টুধ কি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে মোতাবেক দেখেছি—বুড়ী, বুড়ী,—ব'লে ডাকত। বুড়ীও তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে মোতাবেকের সে স্নেহের দান অকাতরে গ্রহণ করত। ওপরে ব'সে ব'সে সে সব দেখতাম। সামনেই তো জায়গাটা। তা সেদিনে আমাদের এ ওয়ার্ডে আশ্রয় নিয়েছিল 'সুন্দরী', আর তার দুই বাচ্চা। একটা ছেলে একটা মেয়ে। মেয়েটা কেমন আকারে ছোট আর ক্ষীনজীবি মতন। কেমন মিহি সুরে মিউ মিউ ক'রে ডাকত সর্বদা। আর কি আশ্চর্য দেখো প্রিয়া,—সুন্দরী তার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে

এত লোক থাকতে বেছে বেছে যেন আমার পায়েই আশ্রয় চাইল। দু'পায়ে মাথা বুলিয়ে বুলিয়ে কী অদ্ভুত তার আর্তিপ্রকাশের ভঙ্গীমা। কেন জানি অকস্মাৎ আমার মনে হলো—ওতো আসলে সুন্দরী নয়, আমার জলিই যেন সুন্দরীর রূপ ধরে বাচ্চা নিয়ে আমার পায়ে মাথা ঘসছে। জেলে আটক রয়েছি তো, তাই ও অমন করছে। যাই হোক, আশ্রয় দিলাম ওদের। সবাই বললে—সুন্দরী আমার মেয়ে। তা ওই সুন্দরী আর তার বাচ্চাদুটোর খেলাও সেদিন দেখতাম বসে বসে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আমিও ছুটোছুটি খেলতাম। কিন্তু দুপুর সন্ধ্যে সুন্দরী আর ওই বাচ্চারা যখন আমার পাতের পাশে চুপ করে বসে থাকত, আমার দেওয়া ভাত মাছ ইত্যাদি ফূর্তি করে খেত, অনেকদিন পর্যন্ত আমার চোখে জল আসত। মনে পড়ত—বাড়ীতে যখন তুমি আর আমি প্রতিদিন একসঙ্গে খেতে বসতাম, আমার স্যাণ্ডো, জলিরাও ঠিক অমনিভাবে আমার চারপাশে ঘিরে বসে থাকত। আশা করত, খেতে খেতে ওদেরও কিছু খেতে দেব আমি। কিছু দিলে কি খুসী হতো। আহা। কতদিন ওদের কিছু খেতে দিতে পারিনি নিজের হাতে। তবে কালে কালে সবই তো সয়ে আসে অনেকটা। ও চোখের জলও শুকিয়ে এলো ধীরে ধীরে।—

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমার চোখের জল পড়ল ওই সুন্দরীর জন্যেই। ওর জন্যেই প্রায় সারাটা রাত সেদিত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।…

সেদিন দুপুর থেকে হঠাৎ বাচ্চা দুটোকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। প্রথমটায় ভাবলুম—কোথাও লুকিয়ে আছে বোধহয় আশে পাশে। কিংবা পায়ে পায়ে বেড়াতেই গেছে বোধহয় বাইরে কোথাও। আসবে ঠিক সময় মতন। চিন্তা কি। সুন্দরীকে অবশ্য মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কেমন যেন ব্যস্ত সমস্ত ভাব। কেমন যেন চঞ্চল। যে বেরাল, বেরোয়ই না ওয়ার্ড থেকে, সে আসছে বটে, কিন্তু

হু'চার মিনিট থেকে, এদিক ওদিক ঘুরে, আবার হঠাৎই যেন কোথা: উধাও হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা উদ্বেগ মতনই বোধ করলা: বাচ্চাছুটোকে না দেখে, সুন্দরীর অমন ভাবভঙ্গী দেখে। বি ব্যাপার!

তা ব্যাপার বোঝা গেল বিকেলের দিকে। সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে ফিরল কেবল তার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। আ: তা-ও কি চেহারা ছেলেটার! সর্বাঙ্গে অসম্ভব রকম জলকাদা,— চোখ নাকেও কাদা জড়ানো। কেমন যেন ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে চলতে চলতে। দেখে মনে হলো অর্ধমৃত একটা জীব-শিশু যে: মৃত্যুর সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে কোনমতে প্রাণটুকু হাতে করে ফি: এসেছে। তা এর পরে আর বুঝতে বাকী রইল না কিছু। বুঝতে পারলাম,—এ গোরাডিগ্রীর পাশেই যে বড় ড্রেনটা বয়ে গেছে,—যে ড্রেনটা এ জেলের সমস্ত ময়লা আবর্জনা সব বয়ে বয়ে টেনে নিয়ে যায় এ জেল অঙ্গনের বাইরে, সেই ড্রেনের মধ্যেই যেমন করে হোক পড়ে গিয়েছিল ওরা ভাই বোন ছুটিতে। ভাইটি স্বাস্থ্যবান আকারেও বড়সড়, কোনমতে মুমূর্ষু অবস্থাতেও উদ্ধারও করছে নিজেকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ওর মা-ও হয়তো ওকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পেরেছে। কিন্তু ওর সেই ক্ষীণস্বাস্থ্য ক্ষুদ্রাকা: বোনটি নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। বাঁচবার জন্য স্বাভাবিক আকুলি- ব্যাকুলিই সার হয়েছে শুধু। ক্ষুদ্রশক্তিতে মৃত্যুর পাঞ্জাকে শিথীল করতে পারেনি এতটুকুও,—অতলে তলিয়ে গেছে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই। আহা বেচারী! কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকলে তো এটাও বাঁচবে না বলে সুশীলদা তাড়াতাড়ি সেই ময়লা কাদামাখা বাচ্চাটাকে নিয়ে ছুটলেন কলতলায়,—ওকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবার জন্য।...

আর সুন্দরী?—সুন্দরী কেন জানি আমার পায়ে মাথা ঘসতে লাগল আর করুণসুরে ম্যাও ম্যাও করে কাঁদতে লাগল। ওর অমন

কান্না শুনে আমার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল প্রিয়া। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চেষ্টা করলাম ওকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু ও কিছুতেই শান্ত হয় না,—কেবল কাঁদে আর পায়ে মাথা ঘষে। হঠাৎ কেন জানি আমার মনে হলো,—বাচ্চাটা হয়তো এখনও মরে যায়নি। হয়তো এখনও গেলে তাকে তুলে এনে বাঁচানো যায়। সুন্দরী হয়তো তাই-ই বলতে চাইছে আমাকে অমন করে। তা ছুটলাম আমি সেই ড্রেনের দিকে। সুন্দরীও আমাকে অনুসরণ করল। আমি তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খুঁজলাম,—জেলের শেষ প্রাচীর পর্যন্ত গেলাম,—কিন্তু না প্রিয়া,—কোথাও বাচ্চাটার চিহ্ন পর্যন্তও দেখলাম না। ও বড় ড্রেন ছেড়ে—অন্যান্য ছোট ছোট ড্রেনগুলোও দেখলাম তারপর,—আশেপাশের লোকজনদেরও শুধোলাম, কিন্তু না, কোথাও সে নেই। কেউ কোন খবরও দিতে পারল না তার। অগত্যা ভগ্নমনেই আবার ফিরে এলাম এই গোরাডিগ্রীতে। সুন্দরী কিন্তু তখনও তেমনি কেঁদে চলেছে সমানে।···

তা অমন কান্না সুন্দরী কাঁদল সারাসন্ধ্যে। তাছাড়া অমন যে লোভী বেড়াল, খাওয়ার একঘণ্টা আগে থাকতেই আমার আসনের কাছে বসে থাকে চুপটি করে, সেদিন কিন্তু ও এলই না খাওয়ার সময়। কত ডাকাডাকি করলাম, তবুও না। সমানে শুধু কেঁদে বেড়াতে লাগলো বাগানের মধ্যে। রাত্রে ঘরে শুয়ে শুয়েও ওর সে আকুল ক্রন্দন শুনতে লাগলাম। জেলের নৈশ নিস্তব্ধতা ওর সে বুকফাটা কান্নায় যেন খান্‌খান্‌ হয়ে যেতে লাগল। ওর সে কান্না শুনে আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। চোখদুটো জলে ভরে এল। আমার মনে হলো,—আমি যা শুনছি—তা যেন বাচ্চা হারা সুন্দরীর কান্না নয়,—ও আমার জলির সেই কান্না যখন ওর প্রথম বাচ্চাটা কেমন করে জানি আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল একদিন। কিছুক্ষণ বাদে কিন্তু মনে হতে লাগল,—ও সুন্দরীর কান্না নয়, জলিরও নয়, বিশ্বের তাবৎ সন্তানহারা মাতৃত্ব যেন কেঁদে কেঁদে সারা আকাশকে

করুণ করে তুলেছে। কেঁদে কেঁদে উর্ধাকাশে প্রশ্ন তুলছে,—হে বিধাতা, দিয়েছিলে যদি কোল জুড়ে, তবে এমন নিঃস্ব করে কেড়ে নিলে কেন? বল—কেন? কেন? বিশ্বাস কর প্রিয়া,—অনেক রাত অবধি আমি ঘুমোতে পারিনি সেদিন।···

তবে সময় সব শোকই তো ভুলিয়ে দেয়। ক'দিন অমনি কেঁদে কেটে সুন্দরীও বোধ হয় বাচ্চাটাকে হারাবার দুঃখটা ভুলে গেল। আবার খেতে-দেতে লাগল। স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ওই ছেলেটাকে নিয়েই একান্তভাবে মেতে উঠল। ওপরে বসে বসে দেখতাম,—মায়ে ছেলে খেলা করছে বাগানে। সুন্দরী বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চেটে চেটে আদর করছে।···

তা সে সুন্দরী আর সেই বাচ্চাটা—এখনও আছে। তবে বাচ্চাটা আর বাচ্চা নেই নেহাৎ,—বড়সড় একটা জেন্টলম্যান গোছের হয়েছে। তরতরিয়ে গাছে চড়ে। পাঁচিলে উঠে বেড়িয়ে বেড়ায়। কাক ধরবার জন্য মাঝে মাঝে ভল্ট খায়। কে যেন নাম রেখেছে —গাড্ড।···

এখনকার নতুন আমদানি ওই বুড়ী আর তার বাচ্চাছুটো। প্রথমে বুড়ী একাই আসত। খেয়ে দেয়ে চলে যেত। থাকতো ছাতা কামানে। আগে ওখানেই খেতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধহয় টের পেলে—এখানে একরকম ঢালাও ব্যবস্থা। প্রচুর মাছ, মাংস, দই, ছানা ইত্যাদি। তাই ভুরিভোজনের আশাতেই নির্দিষ্ট সময়ে আসত, পাত পাড়ত। তারপর বিদায় নিত। কিন্তু কালক্রমে একদিন বাচ্চাটাচ্চা সমেত—পাকাপাকি ভাবেই এসে আস্তানা গাড়ল। দীনেশদা বললেন,—দেখুন, কেমন ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে এনেছে, চল্, রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবি চল্। তা ও-বুড়ী ও তার ছেলেমেয়েদেরও আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আমরাই বটে, কিন্তু ওরাও কেমন বুঝে নিয়েছে আসল খদ্দের এই শর্মাই। ফলে খাওয়ার সময়ে পুষ্যি বেড়েছে। তা এখন বসে বসে বিশেষ ক'রে

ওদের মা-বাচ্চার খেলাধূলো দেখি।...

তা ওরা ছাড়াও—আমার আরও পুষ্যি আছে। গাড়ুর বাবা আছে। আর সে আমার খুব নেওটাও। অনেক সময় ওপরে আমার ঘরে এসেই শোয়। তা সেও এক নিত্য খদ্দের আমার অন্নসত্রের। আর আছে—গুণ্ডা। ওর ওই নাম কিনা জানি না। সব ছুলোকেই ঠেঙ্গিয়ে বেড়ায় জেলের মধ্যে,—আর গাড়ুর বাবাকে বেমকা পেলে তো আর কথাই নেই। আক্রোশটা কেন জানি ওর ওপরেই বেশী। বেশ বড় সাইজের হৃষ্টপুষ্ট পালোয়ান ধরণের চেহারা। ওর কাণ্ড আর কারবার দেখে দেখে আমরাও অমন গুণ্ডা নাম দিয়েছি ওর। তা ও-গুণ্ডাকে দেখলে সবাই তাড়া করে। দীনেশদা তো লাঠি হাতেই বসে আছেন দিনরাত। কিন্তু যেই আমি খেতে বসব,—তা সে কি দুপুর কি রাত্রি,—কোথা থেকে যেন বিদ্যুৎবেগে ও ছুটে এসে আমার পাশটাতে গা ঘেসে মাথা নীচু করে বসবে। আমার দেওয়া আহার্য্য অসঙ্কোচে খেয়ে দেয়ে আবার ছুটে পালাবে এ এলাকা ছেড়ে। সত্যিই আশ্চর্য্য প্রিয়া,—সকলের কাছে সতত তাড়া খাওয়া নিগ্রহ পাওয়া ও-বেড়ালটাও কেন জানি আমাকে বিশ্বাস করে,—সহৃদয় ভাবে,—আমাকে ভয় পায়না।...

তা ভয় আমাকে পায় না নিশ্চয়ই ওই কপোত-দম্পতিও যারা ঠিক আমার ঘরের সামনেই বারান্দার থামের ওপর বাসা বেঁধে রয়েছে। ছোট্ট একটা পালকহীন লম্বা ঘাড় একটা আঙ্গুলপ্রমাণ বাচ্চা সামলাচ্ছে রাতদিন। ওরা ওখানে বসে বসে আমাকে দেখে। আমিও দেখি। মাঝে মাঝে ওদের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু তাতেও ওরা চঞ্চল হয় না, ভয় পায় না। নির্বিকার ভাবে ব'সে থাকে, আর জুলজুল ক'রে আমার দিকে তাকায় মাঝে মাঝে। ভয় করে না আমাকে ওই চড়ুই দুটোও,—যারা দিনে পর দিন ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে—আমার দরজার ঠিক সামনেই ঢালু বারান্দার লোহার

কড়ির ওপর বাসা বাঁধবার। প্রতিদিনই খড়কুটো, দুর্বোগাছ,—সব বয়ে বয়ে আনছে,—ওখানে নিয়ে তুলছে, আর প্রতি দিনই পড়ে পড়ে যাচ্ছে সব। বার বার তবুও তুলছে সব মুখে ক'রে নিয়ে। আমার সামনেই আসছে, কিট কিট করে ডাকছে,—নেচে নেচে ঠোঁটে করে তুলছে সব, ফুড়ুৎ ক'রে ওপরে উড়ছে, আবার নামছে। একইভাবে কাজ ক'রে চলেছে সব সময়। কখনও কখনও অসঙ্কোচে আমার একেবারে কাছেই চলে আসছে, পড়ে যাওয়া খড়কুটো খুটে খুটে তুলছে,—একটুও ভয় পাচ্ছে না।...

তা দিনের পর দিন এই সব দেখি আর ভাবি! ভাবি—কাকেরা আমায় ভয় পায় না, বেড়ালেরা আমায় বিশ্বাস করে, শালিক, পায়রা, চড়ুই,—কেউ-ই আমাকে সন্দেহ করে না,—আমাকে দেখে ভয় পায় না। তুমি জান প্রিয়া,—আমাদের বাড়ীতেও কোন প্রাণী আমাকে অবিশ্বাস করে না, ভীতিজনক ব্যক্তি বলে কদাচ মনে করে না। তুমি আরও জানো—আমার পরিচিত অগণিত মানুষেরাও আমাকে বিশ্বাস করে,—আমার সংসর্গে আদৌ আতঙ্কিত বোধ করে না। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো,—ওই সব অসংখ্য মানুষেরা যা তাদের জ্ঞান বুদ্ধিমত বিশ্বাস করে,—এই সব মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের সহজাত অন্তর আলোকে সহজেই যা উপলব্ধি করে,—যা সত্য বলে জানে এবং মানে,—অনেক বিচক্ষণতার অধিকারী এবং নিজ নিজ নখ-দর্পণে প্রতিফলিত অনেক অনেক গূঢ় সংবাদের আত্ম-প্রসাদস্ফীত সত্বাধিকারী কর্তাব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা কিন্তু তার হদিশ পায় না! প্রিয়া, -বিড়ম্বনা আর কাকে বলে—বল? কিংবা সেই যে কথা আছে না—'নিয়তি কেন বাধ্যতে'?—এও বোধ হয় তাই...

নয়

জেল নিরানন্দ স্থান নিঃসন্দেহে। কিন্তু তবুও এক অর্থে মানুষেরই মেলা তো,—তাই অন্যথায় এ নিস্তরঙ্গ নিরানন্দ জনসমুদ্রেও খুসীর তরঙ্গ ওঠে;—আনন্দের উচ্ছাস জাগে।...

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষই বোধ করি এক একটি খুদে ভগীরথ। পাষানের বুক চিরেও সে নামাতে পারে স্নেহধারা,—যৎকিঞ্চিৎ হলেও—সঞ্জীবনী সুধাধারা। শুধু যে অমন নামাতে পারে—তাই-ই নয়,—নামায়ও প্রতি-নিয়ত। নামাতেই হয় তাকে। হিমালয়-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে—পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যধারাকে মর্ত্যে নামিয়েছিলেন ভগীরথ অভিশপ্ত পিতৃকুলকে উদ্ধার করবার জন্য। তা প্রতিটি মানুষই এক অর্থে অল্পবিস্তর ওই একই কাজ করে। অভিশপ্ত না হোক,—সুপ্ত বা গুপ্তভাবে যে পিতৃকুল প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তার নিভৃততম সত্ত্বা রূপে বিরাজ করেন,—তারই কল্যাণার্থে মানুষকে অমন প্রতিনিয়ত প্রয়োজন ক্ষেত্রে পাষাণের থেকেও প্রাণদায়িনী ধারা টেনে নামাতে হয়,—নিরানন্দ পরিবেশেও আনন্দ ধারা বইয়ে দিতে হয়। তার প্রকৃতির তাগিদেই তাকে অমন করতে হয়। নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যও অমন করতে হয়। তা ছাড়া, পড়েছ তো—আনন্দ থেকেই তাবৎ সব কিছুর উদ্ভব,—আবার আনন্দেই বিলয়। তা জন্মসূত্রে আনন্দের সঙ্গেই তো আমরা সবাই বাঁধা,—আনন্দ ছাড়া তাই বাঁচি কি ক'রে বল ? তাই এমনিতে যতই নিরানন্দ হোক এ জেল-জীবন, যতই দুঃখময় হোক,—এরই মধ্যে আবার সতত আনন্দের উৎস সন্ধান করছে মানুষ। আর নিজে যা-কিছু কুড়োচ্ছে,—অপরকেও ভাগ দিচ্ছে। অন্ততঃ দেবার চেষ্টা করছে। আর ওই দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যথায় দুঃসহ

টাকে অনেকটা সহনীয় ক'রে তুলছে। নিজে বাঁচছে, অপরকে বাঁচাবারও চেষ্টা করছে।...

তা আসলে জেলই তো জায়গাটা, তাই নানা ধরনের মানুষেরই ভীড় এখানে। আর তার অনেকে যাকে বলে সেই "অন্ধকার জগতের"ই লোক। নানা সমাজ-বিরোধী অপকর্মের খুদে বড় নায়ক-নায়িকা সব। তা তাদের খুসী হবার বিষয়বস্তুটা,—তৃপ্তি পাবার পদ্ধতিটা,—আনন্দ অন্বেষণের ভঙ্গীমাটা তো তাদেরই মত,—ওই সেই অন্ধকার জগতেরই মানুষদের মত তো। তাই ও-জগতের সঙ্গে অপরিচিত কোন মানুষের পক্ষে ঠিক সম্ভব নয় তাদের আনন্দের খোঁজ-খবর রাখা,—যথাযথ বর্ণনা দেওয়া। তবে চলতে ফিরতে এমনিতেই চোখে পড়ে যায় তো কিছু কিছু। কানেও আসে তো কিছু কিছু কথা। বাকী পাদ-পূরণটা তো কল্পনাতেই সারা যায় অনেকখানি। তার ওপর সব না হলেও—অনেক-জাস্তা পুরোনো বিজ্ঞ বন্দীদের কাছ থেকেও অনেক কিছুর খবর তো পাওয়া যায়। তা চেষ্টা ক'রে পেতে হয় না সে সব বৃত্তান্ত। জিজ্ঞাসাও করতে হয় না কিছু। বলবার জন্য যেন মুকিয়ে আছে সব। বুঝলো যদি—লোকটা ভাল মানুষ, শ্রোতা হিসেবেও মন্দ নয়,—ব্যস, নায়েগ্রার জলপ্রপাত পড়তে লাগল। আদি-অন্ত—তাবৎ বৃত্তান্ত—শেষ না ক'রে আর থামবার নামগন্ধও নেই। তা ওদেরই কাছ থেকে শুনেছি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী। বিশ্রী বিশ্রী কথাও। অনেক কথা শুনলে সত্যিই কানে অঙ্গুল দিতে ইচ্ছে ক'রে,—মনটা কেমন কুকড়ে যায়,—অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।

সত্যিই,—মানুষ সম্বন্ধে আমরা মানুষেরাও কত অজ্ঞ। মানুষই মানুষের কত অপরিচিত। তবে একটা ইংরেজী শব্দ দিয়েই বোধ করি ওসব তাবৎ না-জানা না-শোনা বৃত্তি প্রবৃত্তিকে বোঝানো যায়। শব্দটা 'পারভারশান'। বস্তুটা এমনিতে প্রব্লেমও নয় তেমন। ও তো আছেই রকম বেরকমের। অল্পবিস্তর সর্বত্রই। আর বাইরের মুক্ত-

বায়ুতেও যখন জন্মায় আকছার অমন কৃমিকীট,—তখন জেলের এ বদ্ধ হাওয়াতে আর বিচিত্র কি তার অবস্থান! আশ্চর্য কি তার অসঙ্কোচ পদচারণা! তা ছাড়া অভাবে স্বভাব নষ্ট বলে একটা কথাও তো আছে! কিন্তু আসল সমস্যা তো সেখানে নয়। আদতে খটকা লাগে কোথায় জানো? বিশেষ ক'রে চিত্তটা চমকে ওঠে কি কারণে জানো? বিশেষ ক'রে এই কারণে যে শুনতে পাই—ওই সব পারভারশান আবার জেল প্রশাসনের কিছু কিছু কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পায়। তা শুধু প্রশ্রয় কেন,—বেশ মদতও পায়। আর ওই প্রসঙ্গে বিস্তর টাকা পয়সারও নাকি লেনদেন চলে। সত্যি মিথ্যে জানি না,—সবই শোনা কথা। তবে ঘটনাচক্রে মানতে ইচ্ছে করে—যা রটে, অন্ততঃ তার কিছু বটে। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই তাবৎ ভাতের অবস্থাটা বোঝা যায় তো। পারিপার্শ্বিক নিশ্ছিদ্র দুর্নীতির পঙ্কে ওই ব্যাপারেই কেবল একটি সঙ্গীহীনা পঙ্কোজিনী চতুর্দ্দিক আলো ক'রে ফুটে থাকবে, সুগন্ধ ছড়াবে, মধু ঝরাবে,—এমন একটা প্রত্যয়কে প্রশ্রয় দেবার মত প্রচণ্ড আশাবাদী তো ঠিক হতে পারছি না। অন্ততঃ এইখানে ব'সে।

তবে ওদের সব আনন্দই যে ওই রকমের,—তা নয়। অন্ধকার জগতের মানুষ হলেও—মূলতঃ ওরাও তো মানুষ! তাই ওরা আলোর মাঝেও আনন্দের আসর বসায় বই কি মাঝে মাঝে। কখনও হয়তো মজার মজার গল্প জমায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে। থেকে থেকে দমকা হাসিতে ভেঙেই পড়ে যেন সব। আবার কখনও হয়তো গানই ধরলো কেউ,—একটার পর একটা। শ্রোতারা মন দিয়ে শুনছে, আবার তালি দিয়ে দিয়ে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেড়ে নেড়ে দোয়ারকিও করছে। ওরই মধ্যে একজন আবার উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে হাত তুলে কোমর দুলিয়ে নেচে উঠল এক সময়। আর যায় কোথায়,—বিচিত্র শীসে, কদর্য অঙ্গ-ভঙ্গীতে,—অশ্লীল মন্তব্যাদিতে,—সেই যাকে বলে—নরক গুলজার তখন। রাত্তির বেলাও—দড়ি হাজত

থেকে মাঝে মধ্যে সমবেত গান ভেসে আসে। ক্রমাগত ঢোলকের বাদ্যিও শোনা যায়। ওই সঙ্গে হৈ হুল্লোড়ের হররাও শ্রবণে পশে।

আবার হয়তো—এ জাতীয় গান-টান কিছু নয়। নিছক তাসের আসরই বসে গেছে গোটা কতক। তে-তাসের খেলা। কোথা থেকে পয়সা পায় জানি না,—এমনিতে জেলের মধ্যে কয়েদীদের হাতে তো পয়সা-কড়ি রাখবার নিয়ম নেই,—কিন্তু দিব্যি পয়সা দিয়ে দিয়ে ওই তাসের জুয়ো চলছে। প্রকাশ্যেই চলছে। কেউ আমীর কেউ ফকির বনছে। তবে জুয়োরই যাদু তো, যুৎসই অবস্থাটা প্রায়শই সেই পদ্মপত্রে নীরের মত। এই হাতে দু'পয়সা এলো, ব্যস,—ক্ষণপরেই শূণ্য হাত। আবার একজনের মুঠি খুলছে তো আর এক জনের মুঠি ভরছে। একের পর এক চলেছে—এই পাওয়া হারানোর খেলা। কিন্তু তাতে বড দুঃখ নেই কারো,— আসলে তো কিছু হাতাবার হাপিত্যেশ নয় তেমন,—নসীব পরীক্ষাও নয়,—খালি মজা, ফুর্তি,—আনন্দ। এলো যদি কিছু,—তো উপরি পাও না। গেল যদি কিছু,—যাক্ না,— ব্যত্যয় কি এমন। জীবনটাই তো বাবা এই দড়ি টানাটানি খেলা! মোদ্দা কথা তো—ওই ফুর্তিই। —আসলে আনন্দে ক্ষণ দিন গুজরান্।···

তা আনন্দ ফুর্তির রকম-সকমের কি সীমা সংখ্যা আছে? রাম কহ। ও একেবারে সহস্রাংশুর মতন হাজার দিকে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। তরল, বায়বীয়,—সব পথেই ওর সমান দুরন্ত গতি: জেলের কানুনে বাধে। এমনিতে এখানে চাষ-আবাদও নেই সে সব কিছুর। বাইরে থেকে ভেতরে সেঁধোবার পথও মাত্র একটি। সেই জেল-ফটক। তা সেখানেও অষ্টপ্রহর তালা বন্ধ। কড়াক্কর পুলিশী ব্যবস্থাও। কর্তার হুকুমে ফটকটা খোলে একটু দরকারে বেদরকারে। ব্যস,— পরক্ষণেই আবার সেই লক-আপ। এমনিতে তাই কাকপক্ষীরও ঢোকবার সামর্থ্য নেই। অথচ—কি আশ্চর্য,—আসছে মালপত্তর! দেদার আসছে। বোধ করি প্রতিদিনই আসছে। না আসলে—

পাচ্ছে কোথায় সব এমন? ক্ষণে ক্ষণে,—হেথায় সেথায়,—ছোট ছোট কলকের মুখে অমন গন্‌গনে আগুন জ্বলছে কি ক'রে? দিবা-রাত্র অমন বুঁদ হয়ে পড়ে পড়ে থাকছে কি ক'রে অত মানুষ?—তা হাওয়ায় হাওয়ায় জেলের অমন উঁচু পাঁচিল টপকে তো আর ভেসে আসছে না কোন বস্তু। মাটি ফুঁড়েও উঠছে না।—তবে।…

তারপর—বোঁতল-লক্ষ্মীর তাল বেতাল কাহিনী তো শুনছি প্রায় প্রতিদিনই। মাঝে মাঝে হৈ হুল্লোড়ও পড়ে যাচ্ছে ওই বোতলবাহিত তরলবহ্নি নিয়ে। কালীপুজোর রাত্রিতে তো শুনি ভাঁটিখানাই বসে গিয়েছিল জেলের মধ্যে। আর ওই কারণবারির করুণায় মাতৃভক্ত বীর সাধকেরা নাকি এখন অসুরবোধন লীলায় মেতে ছিলেন সে রাত্রে যে ডজন কতককে সেলে ঢোকাতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে। তা নিছক শোনা কথাই বা হবে কেন এসব।—পরের দিন কলকাতার একটা নাম করা সংবাদপত্রে তো সংবাদও বেরিয়েছিল—'প্রেসিডেন্সী জেলে মদের ফোয়ারা'…ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা এ-সব কাণ্ডকারখানার মূলে তো ওই বোতল,—আর ওই বোতলগুলো বয়েই বা আনছে কে—বল? বোতলের তো আর দুটো পা গজায়নি—যে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে ভেতরে সেঁধুবে।—স্বয়ং দিলদারদের দ্বারস্থ হবে—কৈগো,—এই তো এইছি আমি?—তাহলে? রাস্তা তো বলেইছি—সেই একটাই। জেলফটক।—অতএব—বুঝে নাও বৃত্তান্তটা। কিন্তু ও কথা থাক। আসলে যা বলছিলাম—সেই আনন্দের কথায় আসি। তা নিষিদ্ধ হোক, আর না হোক,—ও কল্কে বোতল,—সবই তো জেলবাসিন্দাদের আনন্দেরই উপকরণ।—তা আনন্দ আসছে ওইভাবে। দেদার ফুর্তি-টুর্তি লুটছে অনেকে।—আর ওই ভাবে হয়তো ভুলে থাকতে চাইছে সব। ভোলবার চেষ্টা করছে।…

কিন্তু ও-বোতল কল্কে যে কেবল সেই 'অন্ধকার জগতের' লোকদেরই কারবার তা নয়। এক সেই 'ত্রিকূটলী পলিটিক্যাল ফাইল' ছাড়া বাকী সর্বত্রই শুনি ওদের একচ্ছত্র রাজ্যপাট। যাদের

বরাবরের অভ্যেস, তাদের তো কথাই নেই। হ্যাভিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার তো, তাই যা করছে আনন্দের জন্য তো বটেই, আবার প্রকৃতির তাগিদেও বটে। একরকম ডবল ইঞ্জিনেই গাড়ীটা টানছে। কিন্তু অনেকের আবার এখানেই হাতেখড়ি। ওস্তাদ কোন গুরুই হয়তো দীক্ষা দিয়েছেন একদিন সময় বুঝে। আর ও-সব বস্তুতে দীক্ষাটা একবার ভাল মতন হয়ে গেল তো আর দেখতে হবে না। চেলা গুরুর সঙ্গে সমানে সমানে সেঁটে থাকবে সব সময়। চাই বা কি এগিয়েও যাবে অনেকটা। তা তাই-ই বোধহয় ঘটেছে অনেকক্ষেত্রে। অনেক সময় অবশ্য ওগুরু-টুরু নিমিত্ত মাত্র। একটা কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি-ওয়ালা না থাকলেই নয়, তাই। আসলে শুরুতে শুধু কৌতূহল। দেখিই না ব্যাপারটা কি। সঙ্গে হয়তো কিছু লোভও, সবাই কেমন মজা লুটছে, আর আমিই অপদার্থ জুলজুল করে দেখছি কেবল। দূর, আমিও চাখিনা একটু। ব্যস, শুরু হয়ে গেল, যেভাবেই হোক। আর একবার শুরু হলো তো, চলতেই লাগল ব্যাপারটা। সারা হবে হয়তো একদিন দেহ-সারা সনেই। তা ততদিন তো ফূর্তিতে থাকি। আনন্দে কাল কাটাই। ভাবখানা এইরকমই।...

তা ও-কারণবারির কৃপা যে কেবল বন্দীদের বেলায়, তা কিন্তু নয়। এমনকি—ও যে রক্ষক সেই-ই ভক্ষক অনেক ক্ষেত্রে। এমনিতে পাহারা দেবারই ডিউটি, আইন মাফিক চলছে কিনা তাবৎ ব্যাপার, তাই দেখাই কাজ। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তারও কথা জড়িয়ে যায়, পা টলে, দেওয়াল বা দরজা ধরে সামলে নিতে হয়। একদিন তো একেবারে ক্লাইম্যাক্স। ঘটনাটা বলি, শোনো।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। জমাদার চাবি নিয়ে এসেছে আমাদের লক্ আপ করতে। তা নিয়ম মাফিক—যে সেপাইটার ডিউটি ছিল তখন আমাদের ওয়ার্ডে, তাকেই ডাকল প্রথম,—সেপাহি, কাঁহা গয়ি? কিন্তু ওর ডাক শুনে এগিয়ে আসা তো দূরের কথা,

রাও কাড়লে না কেউ। কি ব্যাপার? সাড়া দেয়না কেন কেউ? জমাদার একটু উষ্ণ মতন হয়ে গলা উঁচুতে চড়ালে,—আরে কাঁহা গয়ি বুদ্ধু? আওয়াজ কিঁও নেহি দেতা? কিন্তু তাতেও কেউ টুঁশব্দটি করেনা। আশ্চর্য্য তো!

তা শীতের রাত্রি, খাওয়া দাওয়ার পাট অনেকক্ষণ চুকে গেছে। বিছানার তরিবত করা, মশারী-টশারী টাঙানো,—এসবও সারা হয়েছে।—আমরা যে যার ঘরের মধ্যে বসেই তখন এটা সেটা সারছি—আর জমাদারের কথাগুলোয় বেশ কৌতুক বোধ করছি। কিন্তু হঠাৎ জমাদার যখন কেমন একরকম ভাঙা ভাঙা গলাতেই চেঁচাতে আরম্ভ করল,—আরে কোন্ হো তু? উধার কিয়া করতে হো? আরে আদমী হ্যায়, না—কিয়া হ্যায়? তখন ঘরের ভেতরে আর থাকতে পারলাম না। সত্যিই তো, কী ব্যাপার? কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিই কেউ ঢুকে পড়ল নাকি আচমকা! আর উদ্দেশ্যই বা কি! খারাপ মতলব টতলব নয়তো কিছু! বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম—অবস্থাটা বোঝবার জন্য।

তা প্রথমটায় তো চোখেই পড়েনা তেমন কিছু। একটু বাদে অবশ্য ওই জমাদার সাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করেই দেখতে পেলাম কিছুটা। নীচে সুশীলদার অনেক কষ্টে বাগে আনা—পালং শাকের বাগানটার মাঝখানে কামিনী গাছটার তলায় সেপাই-এর মত টুপি, গরম ওভার কোট পরা একটা মানুষই যেন আবছা অন্ধকারে মাটিতে জাবড়ে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখে তো—ওই জমাদারের মতনই মনের অবস্থা আমার,—কি আশ্চর্য! এই ঠাণ্ডার মধ্যে অমন জায়গায় এসময় আবার কে বসতে গেল অমন করে! কে লোকটা! পোষাকে আষাকে তো সেপাই-এরই মতন। কিন্তু সেপাই-এর এমন উদ্ভট সখ চাগল কেন হঠাৎ! তা কিছু পরেই ব্যাপারটা অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। জমাদার সাহেবই ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে পরিষ্কার করলেন সব। হ্যাঁ, সেপাই-ই বটে। আমাদের ওয়ার্ডে পাহারারত

সেপাই-ই। কিন্তু ভাগ্যগুণে কৃপা একটু বেশী পেয়ে গেছে কারণ-বারির,—তাই অমন অদ্ভুত অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে বেচারীর। তা শেষ পর্যন্ত আমাদের জনা ছয়েক ভলান্টিয়ারের সাহায্যে জমাদার সাহেব ওকে ওর সেই সাধনপীঠ থেকে তুলে এনে কয়েক মগ জল মাথায় ঢালিয়ে তবে কিছুটা মর্ত-মাটিতে টেনে নামালেন আবার। বোঝ প্রিয়া,—অবস্থাটা কি রকম। আর কী জাতীয় সাধক সেপাইয়ের ওপর আমাদের সামলাবার দায় দায়িত্ব ন্যস্ত করে কর্তৃপক্ষেরা নিশ্চিন্ত,—তাও বোঝবার চেষ্টা করো।...

তবে সত্যি কথা বলতে কি, ও নেশা-টেশার কথা বলতে কিন্তু ঠিক আজ বসিনি। ও আর এমন কি জিনিষ—যে সাত কাহন কইতে বসব? ও বস্তু আর বিরল কোথায়—বল? বর্তমানের সমাজটা তো দেখছই প্রতিদিন। এই মদ্য পানের কথাই ধরনা। আগে আগে তবু বাইরে বাইরেই চলত। লুকিয়ে ছাপিয়ে চলত। কেউ কেউ চালাত। এখন তো আর সে দিন নেই। এখন তো ঘরে ঘরেই চলছে। প্রকাশ্যেই সেই 'চীয়ার্স'—চলছে। এমনকি কচি কচি ছেলে-মেয়েরাও চালাচ্ছে। বাপে ছেলে, মায়ে মেয়ে,—কিছুতেই তো আর রাখো বাধো ঠেকছে না। এখন আর করন্তী খাওয়োন্তীদের লজ্জা নেই,—দেখন্তীদেরই সঙ্কোচ সরম।

তা এমন তরল আবহাওয়ায় দেশের কর্তাব্যক্তিরা আর কতদিন অটল হয়ে বসে থাকতে পারেন। সব কিছুরই একটা সীমা আছে তো! অকস্মাতই তাই বোধহয় একদিন তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ওঁরা, খবরদার, যত্রতত্র এসব বেয়াদপি আর চলবে না। কভি নেহি। তা শুধু হুঙ্কারই নয়, হুকুমও জারি হলো,—সে-আও বেশরম বেয়াদপ লোগোঁকো। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ইতি উতি কিছু গ্রেপ্তার হলো। লেকের পাড় থেকে ভ্যানে করে তুলে নিয়ে আসা হলো কয়েকজোড়া টালমাটাল স্খলিত বসন বসনাদেরও। আইনও বানানো হলো,—কাল থেকে ও-কারবার আর নয়। অন্ততঃ

পাবলিক প্লেসে। সেখানে সেই 'এ্যাবসলিউট প্রহিবিশান'। তা দেখো, বস্তুতঃ নিরীহ আইনই তো,—গৃহের পবিত্রতা যথাপূর্ব বজায় রইলই, তৎসঙ্গে পাবলিক প্লেসের পাল-পার্বনগুলোকে প্রাইভেট সেন্টারে সমাধা করলেই আর বখেড়া থাকেনা কিছু। উপরন্তু সেই একাদশীর বাবাও টের পাবেনা…এমন ডুব সাঁতারের ব্যবস্থা তো থাকলেই। কিন্তু তবুও মজা দেখো, ও-আইনও কার্যতঃ প্রয়োগ করা গেলনা। আর একটা আইনেই বাদ সাধল অমন। এ যেন সেই—আইনে আইনে ভোকাট্টা। বোঝ অবস্থা। তা বাইরের সুস্থ মুক্ত পরিবেশে যদি ব্যাপারটার তাদৃশ হাঁড়ির হাল হয়,—তাহলে এ-বদ্ধ কয়েদ খানার কাহিনী শোনাতে বসব কোন্ বিবেক বলে—বল? তবুও কথাটা যে তুলেছিলাম—তা কেবল ওই আনন্দ সংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গের প্রয়োজনেই। তার বেশী কিন্তু কিছু নয়।…

কিন্তু উত্তেজক আনন্দই তো তাবৎ আনন্দ নয় পৃথিবীর। শান্ত সুখও আছে। অনাবিল আনন্দও আছে। তা তার খোঁজেও ছুটছে বই কি মানুষ। তাতে মশগুলও হয়ে থাকছে বই কি অনেকে। এই যেমন সুশীলদার কথাই বলি। ওই যে পাঁচ রকম খাটাখাটনি করছেন, ক্ষেত খামারে মন দিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যে নিয়ম ক'রে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা করেন,—মায় সুন্দরীতনয় গাড়ু বাবাজীর যে রাতদিন অমন তদ্বির তদারক করেন, আসলে ও-সবই তো প্রসন্ন থাকবারই প্রয়াস,—আনন্দেরই অন্বেষণ। তা প্রচেষ্টা সফল নিশ্চয়ই দাদার, তাই এমন দীর্ঘ কারাবাসেও উৎসাহের ঘাটতি ঘটেনি এতটুকুও, মুখের হাসিটি এখনও অম্লান। বিমানবাবুদের রামায়ণ মহাভারত পাঠের সান্ধ্য আসর, ক্ষিতীশদার জপ-তপ্, সুতো কাটা, ও-সবও তো মুখ্যতঃ সেই আনন্দে কাল কাটাবারই চেষ্টা। এর ওপর আবার তো বই-টই পড়ার ব্যাপারও আছে।

অল্প বিস্তর সকলেই এখানে বই পড়েন। উত্তম মধ্যম,

অধম, সব রকমের বই-ই পড়েন। যেমন যেমন পাওয়া যায় তেমনি তেমনিই পড়তে হয়। বাইরে থেকে বই-পত্তর আনা মুস্কিল। শতেক বিধিনিষেধ। অতএব প্রধানতঃ ও-জেলের পাঠাগারই প্রধান ভরসা সকলের। আর জেলের পাঠাগারে তেমন উচ্চাঙ্গের বই বড় নেই। থাকবার কথাও নয়। কারণ থাকলে কেই বা পড়বে বল সে সব বই? যা কাটবে তাই-ই তো আমদানী করবেন কর্তৃপক্ষ। তা ওই সব পড়েই সময় কাটাতে হয় সকলের। সেই—নেই মামার চাইতে কানা মামা তো ভাল। তবে মাঝে মধ্যে ভাল ভাল বই আসে বই কি হাতের কাছে। এর ওর তার হাত ঘুরে ঘুরেই হাতে আসে অমন। আর তা বৈধ উপায়েই আসে। 'সেন্‌সারড্ এ্যাণ্ড পাস্‌ড্' ছাপা কপালে নিয়েই আসে। ক'দিন বেশ আনন্দে কেটে যায় তাতে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। তা তার জন্য তেমন দুঃখ নেই কারো, ঠিক আছে, 'আফ্‌টার অল্' জেল তো, যা জুটছে তাই-ই ভাল। বড় বর্ষণ হচ্ছে না ভেবে কি এক আধ পশলা বৃষ্টিকে অনাদর করব। পাগল নাকি। আর আসল কথা তো সেই সময় কাটানো, ভুলে থাকা, আনন্দ পাওয়া। তা সেটা তো অল্পবিস্তর হচ্ছেই যেমন হোক। ব্যস, আর চাই কি।···

ধর্ম-কর্মেও মতি টানে অনেকের। বাইরের মত এ জেলের মধ্যেও তাই অনেকে ভেড়েন ওই কাজে। একদিন শ্রীঅরবিন্দ যে সেলে থাকতেন আজ তো সেটা তীর্থস্থান। তা ওই প্রকোষ্ঠে বসে সকাল বিকেল অনেকেই দেখি গীতাদি ধর্মপুস্তক পাঠ করেন, ভজন-টজন গান। আবার শুধু ওখানে গিয়ে একটু বসতে, সম্ভব হলে কিছু ফুল-মালা চড়াতেও অনেকে যান। দু'য়েকজনকে তো ওখানে ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকতেও দেখেছি কয়েকদিন। শ্রীঅরবিন্দ প্রকোষ্ঠের পাশেই গুরুদ্বার। তা সেখানেও প্রতিদিন ভক্তেরা জমায়েত হন। অধুনা সাময়িকভাবে বরখাস্ত সুবেদার মেজর শ্রী পাঞ্জাব সিংজী তো প্রতিদিন নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা ক'রে গ্রন্থ-

সাহেব পাঠ করেন। আর আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা আছেন, অথচ মসজিদ নেই, এমন স্থান তো হয় না কোথাও, তাই জেলের মধ্যেও মসজিদ আছে। ভাইয়েরা সেখানে নিয়মিত নামাজাদি করেন। তার ওপর রোজার সময়, ঈদের দিনে, বাড়তি ধর্ম-কর্ম, উৎসবাদি তো আছেই। মাঝে মধ্যে খোলকরতালের আওয়াজও শোনা যায় সন্ধ্যের দিকে। কাছাকাছি কোন ফাইলেই কীর্তন গান-টান হয় বেশ বোঝা যায়। মহাপ্রভুর জন্মদিনে তো প্রায় সারারাত ধ'রে অমন কীর্তন চলেছিল একাধিক স্থানে। তা এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি নিয়েও মেতে থাকেন অনেক মানুষ। সাময়িক হলেও, আনন্দেই থাকেন।...

এমনিতে জেলের মধ্যে খেলাধুলোর তেমন ব্যবস্থা নেই। বন্দীরা যাঁর যাঁর ফাইলে নিজেরাই তাস-টাস খেলেন। দাবা পাশার ছক পাতেন। ওই ভাবে কিছু মানুষের বেশ সময়ও কাটে, আনন্দের টুকরো টাকরাও মেলে। তবে এক অর্থে—এ সবই তো বস্তুতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার। বড় জোর গোষ্ঠিগত। সাধারণের ব্যাপার তো কিছু নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সমষ্টিগত অংশগ্রহণের দৃশ্যও দেখেছি বেশ কিছুদিন। সেই গরমের দিনে। জুন জুলাই আগষ্ট মাসে। জেলকর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিভিন্ন ফাইলের ক্রীড়ামোদী যুবকদের উদ্যোগেই ঘটেছিল ব্যাপারটা।

জেলের মধ্যেকার মাঠে যথারীতি ফুটবল লীগের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিভিন্ন ফাইল—জেলের আর এক পরিভাষায় 'খাতা'র —নামে নামে টীম তৈরী হয়েছিল। আর প্রতিদিন বিকেলের দিকে নির্দিষ্ট ফিক্‌শ্চার অনুসারে ওই সব টীমে টীমে খেলা হোতো তখন। তা মাঠটা আয়তনে কিছু ছোট, ঠিক প্রমাণ সাইজ নয়,—তাই নিয়ম মাফিক এগার জনের বদলে প্রতিটি টীমে ন'জন ক'রে খেলোয়াড় থাকত। তা সে যেমনই হোক, মাঝে মাঝে খেলা খুব জমত। জোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা হোতো। শেষ

বাঁশী না বাজা পর্যন্ত উত্তেজনা থাকত, শেষ পর্যন্ত কে হারে কে জেতে তাই নিয়ে। তা যদিও জেলে আটক মানুষদেরই টীম, তবুও গোটা কতক টীম বেশ ভালই খেলত। কয়েকজন খেলোয়াড় তো বেশ প্রশংসা কাড়ত সকলের। তা কয়েকটা টীম ভাল খেললেও শেষ পর্য্যন্ত লড়াইটা গিয়ে কিন্তু সীমিত হলো মাত্র দুটো দলের মধ্যে। খাতা-টাতার হিসেবে কি যেন দুটো নম্বর ছিল তাঁদের, কিন্তু আসলে সবাই বলত—কংগ্রেস আর নকশাল। তা শেষ পর্য্যন্ত ওঁরাই লীগ-সম্মান ভাগ ক'রে নিলেন। নকশাল চাম্পিয়ান, কংগ্রেস রাণার্স।

কিন্তু সে তো সেই শেষ দিনের কথা। তার পূর্বে তো অনেকদিন ধ'রেই টালমাটাল অবস্থাটা গিয়েছিল অনেকেরই। আর যদিও মাঠের খেলাটা মুখ্যতঃ ওই সব টীম আর খেলোয়াড়দেরই,—কিন্তু খেলা দেখার আগ্রহ, উত্তেজনা ও আনন্দটা কিন্তু তাবৎ জেলবন্দীর। খেলা আরম্ভ হবার অনেক আগে থাকতেই কাতারে কাতারে সব দর্শক জমত মাঠের আশেপাশে। যতক্ষণ খেলা চলত—মাঠের পাশ দিয়ে লাইন বেঁধে সব দাঁড়িয়ে থাকত। কলকাতা ময়দানের বড় বড় খেলায় যেমন উত্তেজনা দেখা যায়—অনেকটা সেই রকমের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তারা ভেঙে ভেঙে পড়ত। মোটের ওপর কয়েকদিন বেশ আনন্দেই তখন রোজ কিছুটা সময় কেটেছে বন্দীদের।...

তবে খেলা ওই লীগ পর্যন্তই। 'নক্ আউট টুর্নামেন্ট' পর্যন্ত আর গড়াল না। শীল্ডের খেলা হবে হবে—শোনা গিয়েছিল কিছুদিন। শীল্ডের কি একটা নাম-টামও একবার কানে এসেছিল। কয়েকদিন উদ্যোক্তাদের জেলার ও সুপারের কাছে ঘোরাঘুরি করতেও দেখেছিলাম। কিন্তু কি হলো বুঝলাম না,—কিছুদিনের মধ্যেই কেমন সব চুপচাপ মেরে গেল।...

এখন শীতের দিনে ক্রিকেট নামবার কথা। তা আছেও সব

আয়োজন। স্টাম্প আছে, ব্যাট আছে, ক্যাম্বিসের বল আছে। জেলকর্তৃপক্ষই জুগিয়েছেন সব। কিন্তু তবুও—খেলার আসর তেমন বসছেনা। আবার এক আধদিন বসলেও ঠিক তেমন জমছে না। আর তা স্বাভাবিকও। খেলাটা আসলে 'লর্ডস্ গেম্'তো, ও ব্যাট বল ইত্যাদি জোগালেই তো হয় না, আরও অনেক তদ্বির তদারক চাই, সাজসরঞ্জাম্ চাই। লাঞ্চ্, টি, এসবেরও ব্যবস্থা থাকা চাই। তার ওপর পোষাক পরিচ্ছদেরও একটা ব্যাপার আছে। তা অত সব ঝক্কি কে আর সামলে উঠতে পারবে বল এ জেলের মধ্যে? তাই তেমন ধার্তিক-টার্তিক চাগাল কালে ভদ্রে-এক আধদিন খেলার আসর বসে। তবে সেও সেই মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—গোছের।

এই যেমন আমাদের অশোকবাবু একদিন ক্যাপ্টেন হয়ে মালকোচা মেরে মাঠে নামলেন। তা একে গোরাডিগ্রীর নেতালোক, তায় ক্যাপ্টেন, দায়দায়িত্বটা তাই একটু বেশীই চাপল কাঁধে। গোটা তিরিশেক সেদ্ধ ডিম আর সেই প্রয়োজন পরিমাণ পাউরুটি বয়ে নিয়ে গেলেন মাঠে। চায়ের পাতা দুধও সাপ্লাই করলেন। আর কোন্ একটা ফাইল থেকে যেন কিছু থকথকে ছোলার ডাল আর আলুসেদ্ধ এলো। ব্যস, ওতেই লাঞ্চ, টি, সব সম্পন্ন হলো। আর খেলার দিক তো সেই ব্যাটে বলের বৃত্তান্তই সব। তা তেমন খারাপ কিছু রেকর্ড নয় ক্যাপ্টেন সাহেবের। চার উইকেট, বার রাণ। তবে সেই অনভ্যেসের কৌটা তো, কপাল একটু চচ্চড় করবেই, পরের দিন সকাল থেকেই আর ডানা তুলতে পারেন না। ব্যস, আর ওমুখো হন না অশোকবাবু। অন্যদের কথা ঠিক জানিনা, তবে মাঠে কোথাও খেলাধূলো কোনদিন হচ্ছে ব'লে শুনিনা। তা সত্যি, এত বখেড়া মিটিয়ে স্রেফ খেলার জন্যই রোজ রোজ ও-খেলা খেলতে যাবে কে বল? বিশেষ ক'রে জেলে বন্দী থেকে?

কাপোধারা অবশ্য অন্য খেলায় মেতেছেন। ব্যাডমিনটন্ নামিয়েছেন। শীত পড়তে না পড়তেই তাঁদের ওয়ার্ডের সামনের

জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে বাঁশ-টাশ পুঁতিয়ে জিবি। নেট টাঙিয়ে নিয়মিত খেলা শুরু করেছেন। সকাল বিকেল দু'সময়েই খেলেন তাঁরা। যেতে আসতে মাঝে মাঝে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে ওঁদের খেলা দেখি। কয়েকজন তো বেশ ভালই খেলেন।...

জেলের মধ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানাদিও হয়। তাতে অনেক মানুষ জমায়েত হয়। বেশ আনন্দেই অনেকখানি সময় কাটে।

এই যেমন জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লগ্নকে স্মরণ করবার জন্য বিশেষ ক'রে কিছু আর, এস, এস, বন্ধুদের উদ্যোগে জেলের লাইব্রেরী হলের মধ্যে একটা অনুষ্ঠান হলো। বেঞ্চ-টেঞ্চ জোগাড় ক'রে একটা বেদী মতন বানানো হলো। তার ওপর রঙীন বেড্‌কভার বিছিয়ে দেওয়া হলো। বাসুদেব ভগবানের একটি পট বসানো হলো তার মাঝখানে। ফুল মালা-টালায় সাজানো হলো প্রতিকৃতিকে। তারপর বিকেলের দিকে দস্তুর মত এক ধর্মসভা বসল সেখানে। ধর্ম সঙ্গীত, গীতাপাঠ, বক্তৃতা, সবই হলো যথারীতি। অনেক লোক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগে সেই সব শুনল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশেই গড়ে উঠল জেলখানার মধ্যে।

অমনি সুন্দর পরিবেশই গড়ে উঠেছিল আবার গুরু নানকের জন্মদিনে। স্থান ওই সেই পাঠাগার প্রকোষ্টই। কিন্তু এবারকার সাজানো গোছানো আরও অনেক পরিচ্ছন্ন, আরও অনেক সুন্দর। দামী দামী সিল্কের কাপড় টাঙিয়ে একটা ষ্টেজ মতনই বানানো হয়েছিল, এবং তার ওপরে বসে পাঞ্জাব সিংজী অনেকক্ষণ গ্রন্থ সাহেব পাঠ ও ব্যাখ্যা করলেন। কয়েকজনে সুন্দর ভজন-টজন গাইলেন। কিছু ভাষণও হলো। জেল সুপার শ্রী মোক্তান তো সংক্ষেপে একটি সুন্দর বক্তৃতাই করলেন। কিন্তু এ অনুষ্ঠানের আরও একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তাতে ক'রেই বোধ হয় লোকসমাগম অমন প্রচুর

হয়েছিল। খালি মিটিং নয়, মিটিংয়ের পরে ইটিংয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন উদ্যোক্তারা। তাও সেই মামুলী সিঙাড়া নিমকী জাতীয় ব্যাপার নয়, দস্তুর মত ভুরিভোজন। গরম গরম পুরী, ডাল, কপির তরকারী, চাটনী, আর শেষপাতে গরমাগরম ঘি-জবজবে জাত-হালুয়া। বেশ তোফা ব্যবস্থা। তা আয়োজনও ছিল প্রচুর,—পাতা পেতে ব'সে পড়লেই হলো,—না নেই কাউকেই, কিছুতেই।…

মুসলমান ভায়েরা অবশ্য সবাইকে ডেকেডুকে ঠিক এ জাতীয় কোন অনুষ্ঠান কোনদিন করেন নি। তবে ঈদের দিনে জেলময় পরিচিত অপরিচিত সকলকে আদাপ জানিয়েছেন, আলিঙ্গন করেছেন, মিষ্টি-টিষ্টি খাইয়েছেন। অন্ততঃ সেদিনের মত বেশ একটা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করেছেন।…

সি, পি, এম্ ও নকশাল ফাইলে মাঝে মধ্যে থিয়েটার যাত্রা হয়। তরজা গান-টানের আসর বসে। তা বামপন্থী রাজনৈতিক ফাইল তো, নাটক, গান, সবই তাই পুরোপুরি ওই রাজনীতি ঘেঁষা। একদিন এক কবি গানের আসরে গিয়েছিলাম। কৃষাণ মজুর সংক্রান্ত গান সব। উত্তর প্রত্যুত্তরে বেশ জমে উঠেছিল আসরটা। কোন্ ফাইলে ঠিক মনে নেই, একদিন বেশ জমাটি গাজির গান শুনেছিলাম। ঢোল কাঁসি সহযোগে নেচে নেচে গায়ক গান ধরেছিল :

আমি আগে করি পয়গম্বরের চরণ বন্দনা,
তার পরেতে গাজির গান শুনেন সর্বজনা,
শুনেন বন্ধুগণ।
শুনেন বন্ধুগণ, দিয়া মন দেশের কাহিনী
সম্প্রতি হইয়াছে যাহা লোকে জানাজানি,
শুনেন জবর খবর।
শুনেন জবর খবর, মড়া কবর থেকে উঠবে নেচে।

আর কাটা ছাগল লাজের চোটে উঠবে হু'বার হেঁচে।…

দেশে খাস্ত নাই,

দেশে খাস্ত নাই, কি বালাই, জোতদার চাষী চোষে

আর—বড় নেতা গরিবী হটায়,—ঠাণ্ডা ঘরে বসে।

দালাল কাগজগুলো,

দালাল কাগজগুলো, কানে তুলো, মহিমা প্রচার করে,

সমাজতন্ত্র আসবে দেশে শুধুই গলার জোরে।

আঠাশ বছর ধরে,

আঠাশ বছর ধ'রে জনম্ ভোরে বাণীই শুনে গেলাম।

আর—আমরা যত হাড়হাভাতে অশ্বডিম্ব পেলাম …

বেশ পাকা গায়ক কিন্তু ভদ্রলোক। মনেই হয় না—নিতান্তই রাজনৈতিক বন্দী একজন। ভদ্রলোক আছেনও শুনলাম—বেশ কয়েক বছর। তা কিছুটা সময় বেশ কাটল সেদিন তাঁর গান শুনে।…

কিন্তু যতই বসুক অমন অমন গানের আসর, যতই হোক অমন যাত্রা থিয়েটার, হোক না কেন কিছু খেলা ধূলো,—বসুক না কেন কিছু সভা, কিছু সমবেত অনুষ্ঠান, প্রয়োজনীয় কতটুকু বিস্মৃতি আর তাতে ঘটে বল? কতটুকু আনন্দ আর মেলে বল? কিছু নয় প্রিয়া, বিশেষ কিছুই নয়। তাও তো এ সব ওই দিনমানের কিঞ্চিৎ সময়। কিন্তু বাকী দিনটা? বিশেষ ক'রে রাতটা? যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তামাম জেলপুরী, নিস্তব্ধ হয়ে যায় সব কোলাহল, বন্দীকে যখন একাকী তার মনের মুখোমুখি বসতে হয়, মনের সঙ্গে মনের আলাপচারি শুরু হয় যখন,—তখন? তখন তো কেবল স্মৃতির মর্মপীড়া, হতাশা আর ক্ষোভ, অসহায় ক্রোধ…

দশ

কোন দু'জন মানুষই ঠিক একরকম নয় দুনিয়ায়। কিছু না কিছু প্রভেদ থাকেই। আকৃতিতেও থাকে, প্রকৃতিতেও থাকে। হয়তো বলবে—করসিকান ব্রাত্রার্স? বা ঝিন্দের বন্দী? সেখানে কি? হ্যাঁ, স্বীকার করি ওসব ক্ষেত্রে গোলযোগের কারবার আছে বটে। আমার জানিতো কানাই বলাই—দুই যমজ ভায়েও কম গোলমাল বাঁধায়নি কিন্তু দেখো সেখানেও সাদৃশ্যটা যতটা আকৃতিগত ততটা প্রকৃতিগত নয়। আবার ও আকৃতির দিক থেকে সাদৃশ্য যতখানিই থাক, ঠিক অভিন্নতা তো নিশ্চয়ই ছিল না। অমনটা থাকতেও পারে না। যত অল্পই হোক, যত সূক্ষ্মই হোক, পার্থক্য কিছু না কিছু থাকবেই। আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে তা নজরেও পড়বেই।

তা এ জেলের মধ্যে অবশ্য ও জাতীয় কোন ঝঞ্ঝাট নেই। যমজ ভাই-ব্রাদারও কেউ চোখে পড়েনি। অমন আছে বলেও শুনিনি। এখানে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন, সবাই স্বতন্ত্র। তাই এক অর্থে সবাই এখানে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার আর এক অর্থে অধিকাংশই অমন দৃষ্টি কাড়বার কোন দাবীই রাখে না। কারণ, প্রায় সবাই সাধারণ, সবাই বৈচিত্র্যহীন। তবুও ওরই মধ্যে কিছু মানুষ আছেন এজেলে যাঁরা সত্যিই এক অর্থে অসাধারণ। বলতে পার একেবারে বর্ণাঢ্য চরিত্রও। বাইরের কর্মব্যস্ত দিনগুলোতে ওঁরা ঠিক এমনিভাবে নজরে পড়তেন কিনা— জানিনা। মনকে এতখানি টানতেন কিনা, বলতে পারিনা। কিন্তু এখানকার এই অস্তথায় অলস দিনগুলোতে কিন্তু ওঁদের বৈশিষ্ট্যের দৌলত যেন দেখে দেখে ফুরোতেই পারি না। প্রায় রোজই

দেখি, তবুও দেখি। দেখি আর মাঝে মাঝে ভাবি ওঁদের অনেকেরই কথা।

এই ধর আমাদের সুশীলদা। বয়স তো প্রায় সত্তর ছুঁইছুঁই। অথচ—এখনও কি মজবুদ গড়ন! এতটুকু বাড়তি মেদমাংস নেই শরীরের কোথাও! এ বয়সেও যেন চাবুকের মত লকলকে দেহ-কাণ্ডটা! আশ্চর্য! আর আশ্চর্য্য দাদার মাথার চুলও। এতখানি বয়েস, অথচ এখনও মাথা ভর্তি বেশ ঘন কালো চুল। না, না, তা ভেবোনা, আমি হলফ্ করে বলতে পারি কোন কলপের কারবার করেন না দাদা। তেমন কিছু হলে আর বলতেই বা বসব কেন একথা? ওসব কারবারে নব্বই বছরেও তো নটবর কার্ত্তিকটি সেজে ঘুরে বেড়াতে দেখি অনেককে। ওতে আর তাই নতুনত্ব কি এমন! না, না, সে সব কিছু নয়। আসলে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলেই তো অস্বাভাবিক ঠেকেছে এমন। সহজ বলেই তো স্বচ্ছন্দে নজর কেড়েছে। তবে ও-দেহ-কথাও বলতে গেলে আসল কথা নয় দাদা সম্বন্ধে। আসল কথা দাদার কর্ম্ম-শক্তি। এ বয়সেও কী অসাধারণ উৎসাহ দাদার সব ব্যাপারে। কি অপরিসীম পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। সারাদিন যেন চরকীর মত অবিরত বন বন ক'রে ঘুরছেন ভদ্রলোক!

সেই সাতসকালে যখন জেল-বাজার ব'য়ে নিয়ে এলো ভলান্টিয়াররা, —ব্যস,—তখন থেকেই দাদার কর্ম্ম-সূচির একরকম গোড়াপত্তন। গুছিয়ে গুছিয়ে জিনিষগুলোকে তোলা,—নির্দ্দিষ্ট কৌটোয় বাসন-কোসনে সেগুলোকে রাখা,—দরকার মত ঝাড়া মোছা করা,—সবই চলতে লাগল একের পর এক। প্রায় ডজন খানেক ভলান্টিয়ার মজুদ আছে ওয়ার্ডে,—তাদের কাউকে বললেই হয়,—করে কম্মে দেয় সব,—কিন্তু না,—দাদা নিজের হাতেই সব কিছু করবেন। তা ও-গোছানো পর্ব্ব শেষ হলো তো,—কুটনো কোটা আরম্ভ হলো। দিব্যি বটি বাগিয়ে আলু বেগুন কফি,—যেমন যেমন প্রয়োজন—,

কান্না কান্না করতে বসলেন। ব্যস,—তারপর—অদৃশ্য হলেন রান্নাঘরে।

সেখানে অবশ্য জনা তিনেক ঠাকুর যোগানে যোতায়েন আছে। কিন্তু বস্তুতঃ দাদাই সব। সেই যাকে বলে—হেড্ হালুইকর। কিংবা কুকিং ম্যানেজার।—না, না,—তাঁই-ই বা কেন,—সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে ব'সে থেকে শুধু সেই ডিরেকশান্ দেবার বৃত্তান্তই তো নয়,—নিজেই কলকলিয়ে কড়ায় তেল ঢালছেন,—খুন্তি হাতে এটা ভাজছেন,—ওটা নাড়ছেন,—মশলা মেপে কড়ায় দিচ্ছেন,—সময়কালে পরিমাণ-মত জল ঢালছেন,—নুন দিচ্ছেন, মিষ্টি দিচ্ছেন,—বস্তুতঃ শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত গোটা রন্ধন কার্যটাই সম্পন্ন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রেনও খাটাচ্ছেন—ওই রন্ধন-কর্ম নিয়েই। প্রতিদিন নিত্য নূতন রকমারি রান্নার গবেষণা ক'রে চলছেন। কিসে নতুনত্ব হয়,—মুখরোচক হয়,—সর্বদা তারই চিন্তা। তা এ সব তো গেল সাধারণের ব্যাপার,—যাকে বলে কোম্পানীকা কারবার। এর ওপর বিশেষ বিশেষ ব্যাপারও আছে বইকি। বিমানবাবুর ক্রনিক ডিসেণ্ট্রি, তাঁর জন্যে তাই বিশেষ ঝোল। ঝাল মশলা নাম-মাত্তর তাতে। যমুনাসিং—শাকাহারী,—তাঁর দিকেও তাই কিছুটা ভিন্ন নজর। দু'জন আবার ডায়েবিটিসের রোগী, মিষ্টি টিষ্টি চলেনা তাঁদের, তা তাঁদের জন্যও কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তা এতসব ঝক্কি ঝামেলা একাই হাসিমুখে সামলাচ্ছেন দাদা। সবদিকেই সমান সতর্ক দৃষ্টি।...

এর ওপর সপ্তাহের সবদিন জুড়েই আমাদের কারো না কারো ইন্টারভিউ। তা সকলের বাড়ী থেকেই কিছু না কিছু খাদ্য-দ্রব্য আসছেই প্রত্যহ। তুমি তো আবার বেদিনেও পাঠাচ্ছ নানারকম। তা সে সব কে সামলাচ্ছেন?—কে আবার।—ওই সুশীলদাই। নিজেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখছেন। দরকার মতন টিফিনকেরিয়ার, কৌটো-টৌটো সব আজার ক'রে বাহকের হাতে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন।

তারপর হিসেব ক'রে যথা সময়ে যথারীতি সকলের হাতে পাতে সেই সব পরিবেশন করছেন। আবার ওরই মধ্যে বাহকের হাতেও আগে-ভাগে কিছু তুলে দিচ্ছেন,—আহা! গরীব মানুষ, এসব তো বড় খেতে পায় না,—হাতে ক'রে বয়ে এনেছে এতটা পথ,—সেই জেল গেট থেকে,—কিছু ওকে খাইয়ে না দিলে চলে কখনও। মন খুসী হয়।—তার ওপর—আমাদের ভাঁড়ারে তো সেদার বস্তু,—কর্তৃপক্ষও দিচ্ছেন, আবার বাইরে থেকেও ক্রমাগত আসছে,—কিন্তু অন্যান্য অনেক ফাইলে? সেখানে তো আর এমন অবস্থা নয়। এটা মেলে তো, ওটা মেলেনা। কত জিনিষ তো চোখেই দেখে না কত দিন। আহা, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সব,—বাড়ীঘর ছেড়ে কত কষ্টেই না কাল কাটাচ্ছে।—তা দিই না ওদের কিছু মাঝে মধ্যে।—আমাদেব তো আর ঘাটতি ঘটবে না কিছুতেই। তা ডজন দেড়েক ডিম,—কয়েকখানা বড় পাউরুটি, প্যাকেটভর্তি মাখন,—চা, এসব চালান হয়ে যায় অন্য ফাইলে। কখনও কখনও মাছ মাংসও যায়,—পায়েস মিষ্টিও যায়। দাদাই পাঠান অমন। অর্থাৎ নানা দিকেই নজর দাদার। সর্বত্রই সক্রিয় সহানুভূতি।

তা ওই সব খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকলেই কি চুকেবুকে গেল সব।—পাগল নাকি! ওই টুকুতেই কি আর কর্মকাণ্ড শেষ হয় দাদার!—এই ধরনা—আমার ব্যাপারটাই। জেলে প্রচুর মশা,—মশারি ছাড়া শয়ন, নিদ্রাকর্ষণ,—অসম্ভব। ফুল-ফোর্সে পাখা চালিয়েও ও-মশার পাখা দুটোকে কাবু করা যায় না কিছুতেই। তা জেলকর্তৃপক্ষ মশারী দিয়েছেন। নতুন নেটের মশারী। কিন্তু ঠিকমত টাঙ্গাই কি ক'রে। এদিকটা হয়, তো ওদিকটা হয়না। এক দিকটা একটু উঁচুতে ওঠালাম, তো আর এক দিকটা একেবারে খাট ঘেঁষেই শুয়ে পড়ল। কিছুতেই যেন আর বাগে আনতে পারছি না। মহা মুস্কিল! তা বোধ হয় ও-মুস্কিলের আঁচ পেয়েই হঠাৎ এসে হাজির হলেন দাদা। ব্যস,—কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই

মুস্কিল আসান। তাও শুধু সে রাত্রির জন্যই নয়,—একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। এমনভাবে কাঠি-টাঠির বন্ধনী দিয়ে দড়িটড়ি টাঙালেন যে—প্রতিদিন চোখ বুজেও মশারী টাঙানো চলে। খালি কাঠিগুলোর বন্ধনীতে মশারীর নিজস্ব ফিতেটা লট্‌কে দিলেই হলো।

তা অমন কিছু কিছু দরকারী সাহায্য কেবল যে দাদা আমাকেই করেন,—তা নয়। সকলের জন্যই অবিরত দাদার সাহায্য হস্ত প্রসারিত। এমন কি প্রয়োজন-মত সকলের কাপড় জামাতে রিপু-টিপুও করতে দেখি দাদাকে। এর ওপর ওঁর নিজের লেখাপড়ার কাজও আছে কিছু কিছু। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায়—একটা আত্ম-জীবনী মতন বই লেখাতেও হাত দিয়েছেন দাদা। কিছুটা সময় নিয়মিত ওই কাজেই ব্যয় করেন। পাঁচ-ছ-খানা করে চিঠিও লেখেন দাদা। তা ছাড়া,—সেই ক্ষেত-খামারের কাজ তো রয়েছেই। জল দেওয়া, সার দেওয়া,—ইত্যাদি যত্ন আত্তি চলছে প্রতিদিনই।...

কিন্তু বস্তুতঃ এ সবই বাহ্য। দাদার চরিত্রের আসল ব্যাখ্যান কিন্তু অন্যত্র। আদতে—অনুশাসন মেনে চলা, নিয়মানুবর্তী হওয়া, নিষ্ঠার সঙ্গে রুটিন মাফিক কাজ কর্ম করা, এই-ই দাদা-চরিত্রের আসল চাবিকাঠি। নিদ্রাভঙ্গ থেকে নিদ্রাকর্ষণ, সারাদিন কেবল রুটিন আর রুটিন। ঝড় উঠুক, ঝঞ্ঝা আসুক, বজ্রপাত হোক, উঁহু, দাদার কোন প্রোগ্রাম পয়মল হবে না কিছুতেই। যে সময়ে যেটি, যেটির পর যেটি,—ঠিক চলবে একের পর এক, একেবারে কাঁটায় কাঁটায়, নিয়মিত, প্রতিদিন।

রাত্রে দশটা বাজতে না বাজতেই কিছুক্ষণ শবাসন ক'রে শয়ন। তারপর ভোর চারটে বাজতেই গাত্রোত্থান এবং পর পর কয়েকটা আসন। আয়রণম্যান নীলমনি দাশের যোগব্যায়ামের একটা ছবি যুক্ত চার্টও টাঙানো আছে দাদার ঘরে। দরকার মতন ওদিকে চোখ বুলিয়ে নেন এক-আধবার। তারপর

সকালে লক্ আপ খুলতে না খুলতেই দাদা বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। বাকী আমরা যখন সবে উঠি উঠি ক'রে বিছানার আড়ামোড়া ছাড়ছি,—ততক্ষণে তাঁর স্নান-টান তো সমাপ্তই,—মায় গুছিয়ে কাপড় জামা প'রে চুল-টুল আঁচড়ে দাদা একেবারে ফিট্ কাট্। এরপর—ওই অবস্থাতেই গোটাকতক সুগন্ধি ধূপকাঠি জেলে টেবিলের ওপর রেখে,—দাদা বিছানার ওপর হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায়,—"আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি"…পাক্কা একটি ঘণ্টা চলবে তাঁর ওই সঙ্গীত সাধনা। তারপর—গান বন্ধ ক'রে ব্রেকফাষ্ট,—আবার ব্রেকফাষ্ট অন্তে রোজকার বাজার ব্যস, দাদার কাজের চাকা ঘুরল। ছোট বড় নানান কাজের ভীড়ে দাদা ভিড়ে রইলেন। কিন্তু ওই-মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার কিছুক্ষণ শয়ন,—ওটি কিন্তু রোজই চাই দাদার। কোন কারণেই অন্যথ হবার উপায় নেই সে ব্যাপারে। রোজকার রুটিন তো। না, না রুটিন কাজে একচুলও এদিক ওদিক হবার যো নেই দাদার জীবনে আর ওই রুটিনের অন্যতম হচ্ছে দাদার বৈকালিক বা সান্ধ্য ভ্রমণ।

তা কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করি আমরা সকলেই। মানে—আমাদের ওয়ার্ডের বাগানটার মধ্যেই বাঁধানো রাস্তার ওপর পাইচারি করি। কিন্তু আমাদের ভ্রমণ আর দাদার সে ভ্রমণের মধ্যে যেন তুলনাই চলেনা কোনদিক থেকে। দাদা তো হাঁটেন না,—যেন দৌড়োন। বাপ্‌স্,—কি দ্রুতগতি এই ছোটখাটো মানুষটা!—এই এখানে,—ওই সেখানে! চক্ষের পলকে যেন বিশ হাত পেরিয়ে গেলেন। আর কি নিষ্ঠা! কি সময়জ্ঞান!—আমাদের বেলায় ওসব টাইম-ফাইমের বড় কারবার নেই। একটু বেড়ানো নিয়ে কথা,—ক্ষিদে করার কারবার,—যখন হোক,—নামলেই হলো পথে এক সময়। কিন্তু দাদার ক্ষেত্রে সে সব নয়,—একেবারে লৌহ নিয়মানুবর্তিতা,—সাড়ে পাঁচটা, তো সাড়ে পাঁচটাই,—ঘড়ির কাঁটার একটু আগে পিছে হবারও উপায় নেই। তাছাড়া, আমাদের মত সুবিধে অসুবিধের কারবার নেই,—প্রাকৃতিক

দুর্যোগের পরোয়াও নেই। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে?—নামুক না। ঝড় উঠেছে?—উঠুক না। দাদার প্রোগ্রাম কিন্তু বন্ধ হবে না কিছুতেই,—কোনদিনও না। দরকার মত রবারের জুতো প’রে,—মাথায় ছাতি ধ’রে,—দাদা সান্ধ্য ভ্রমণ সারবেন ঠিক। আর সারবেন ঠিক নির্দিষ্ট সময় ধরেই। কোন অবস্থাতেই কম বা বেশী হবে না কিছুতেই। আর ঠিক সময়ে ও-সান্ধ্য ভ্রমণটুকু সেরে, গা হাত পা মুছে আবার দাদা বসবেন সঙ্গীত চর্চায়। সময় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে—আমরা দাদাকে দেখে তখন ঘড়ি মিলিয়ে নি,—ঠিক সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।—তা বল,—এমন মানুষ কি মানুষের ভীড়ে একেবারে হারিয়ে যেতে পারে? বল,—এমন চরিত্র কারো নজর না কেড়ে পারে?...

আমাদের সহ-বন্দীদের মধ্যে আর একজন মানুষও বিশেষ ক’রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্বরাজবাবু। সুশীলদার মতই অকৃতদার ভদ্রলোক। কমবেশী সুশীলদার মতনই থেকে থেকে জেল খাটছেন জীবনভোর। তবে সাদৃশ্য দু’জনের মধ্যে বোধ করি ওই পর্যন্তই। আকৃতিতে তো মূর্তিমান বিপরীতই স্বরাজবাবু। লম্বা চওড়া,—একেবারে দশাসই চেহারা। তবে জোরালো আধি ব্যাধি আছে এক আধটা। চায়েতেও চিনি চলে না। আর অসুখ-বিসুখ যা আছে,—আছে তার চাইতেও অনেক বেশী অসুখ-সচেতনতা। ডাক্তার বদ্যির ডাক পড়ে তাই মাঝে মধ্যেই। এমনিতেও একটু পিট্‌পিটে স্বভাব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে এক মাত্রাধিক প্রবণতা। সকাল সন্ধে স্নান করবার কালে পা দুটোকেই ঘ’ষে ঘ’ষে পরিষ্কার করেন আধঘণ্টাটাক। সদ্য কাচা কাপড়-চোপড়ে একটু-আধটু দাগ-টাগ লেগেছে তো রজক বেচারাকে প্রায় রদ্দাই বসিয়ে দেন আর কি। কিন্তু আসলে ভদ্রলোক সম্বন্ধে এসব কথা লেখবার জন্যই এমন কলম ধরিনি। আসলে—এসবের জন্যও উনি আমার আকর্ষণ করেন নি। সে একেবারে অন্য বৃত্তান্ত। আসলে

ভদ্রলোকের হৃদয়টাই ওঁর প্রকৃত পরিচয়। সত্যিকারের সম্পদ।...

এমনিতে স্পষ্ট বক্তা ভদ্রলোক,—সবাইকে মুখের ওপরই শুনিয়ে দেবেন যা মনে আসবে এবং মনে করবেন। কোন সঙ্কোচ নেই। এমনিতেও খোলা মেলা মানুষ। সেই ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই কোন ব্যাপারেই। আবার স্পষ্টতঃ একটু রূঢ় ভাষীও। সেই যাকে বলে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে সইয়ে সইয়ে বলতে পারেন না কোন কথা। দুম্‌দাম্ বোমাই ফাটান প্রয়োজন মত। অনেক সময় নিজেও বোমার মত ফেটেও পড়েন রাগে। কিন্তু যা বলছিলাম—এসবই মানুষটার বহিরঙ্গ। আসল চরিত্র নয়। আসলে ভদ্রলোক একটি অসাধারণ হৃদয়বান সহজ সরল পুরুষ। রোজ রোজ ওঁকে দেখলে,—ভাল ক'রে সব লক্ষ্য করলে,—নিতান্তই পল্লবগ্রাহী কোন ব্যক্তির কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রকৃত চিত্রটা।...

এই বেরালের বৃত্তান্তই বলি প্রথমে। আমাদের মধ্যে সুশীলদা আর আমারই বেরাল-প্রীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বদনাম। বাকী সবাই নাকি এ-জীবের ওপর একেবারে খার। আর স্বরাজবাবুর ভাব তো সেই—দেখ্ মার্,—দেখ্ মার্। কি?—না নোংরা জীব! যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়! আর গায়ের লোম?—হুড়হুড় ক'রে উঠছে তো উঠছেই সর্বদা। সেঁধোয় যদি ওর একটা পেটে,—তাহলে আর দেখতে হবেনা।—খাওয়া দাওয়ার দফা একেবারে গয়া কয়েকদিন। অতএব,—দূর, দূর,—ভাগ্, ভাগ্,—কাছে এসেছো,—কি মরেছো বাছাধন; আমার কাছে ও সব আহ্লাদ নেই।...কিন্তু তাই বলে—কি ধারে কাছেও আসবি না কেউ? দূর,—তা কেন?—দূরে দূরে বস্‌না,—এই নেনা মাছের মুড়োটা,—ছানা,—দই প্রভৃতির প্রসাদটুকু,—খা, বাবা, খা,—খেয়ে আমায় উদ্ধার কর। কিন্তু খবরদার,—বেশী ঘনিষ্ট হাতে এসো না চাঁদ, ওসব আদিখ্যেতা আমার সয়না,—যা, যা,—পালা,...তা রোজ দু'বেলাই স্বরাজবাবুর এই কীর্তিকলাপ দেখি, আবার সাথে সাথে হুঙ্কারও শুনি। বেশ কৌতুক বোধ করি।

কিন্তু যেমনই যা করি,—মানুষটার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টা বুঝতেও তো আর কষ্ট হয় না কিছু।...

তবে ও-বেড়াল বৃত্তান্তও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় এ ব্যাপারে। রকম বেরকমের কাহিনী আছে আরও। এই ক'দিন আগেকার ঘটনাটাই শোনো না। সহ-বন্দী বন্ধুবর নরেশ গাঙ্গুলী মশাইকে নিয়েই কাণ্ডটা।

গাঙ্গুলী মশাইকে সরকার ঠিক রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেন নি। যথাযোগ্য তো নয়ই। উচ্চ শিক্ষিত ও প্রবীন এ্যাড্‌ভোকেট হলেও, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সভাপতি হয়েও, বিচক্ষণ সরকার কর্তৃক নিম্নতম শ্রেণীর মিসাবন্দীরূপেই গণ্য হয়েছিলেন। তার ওপর আর-এস-এসের সদস্য বলে নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক ফাইলেও কেউ জায়গা দিতে চায়নি। ফলে প্রথমটায় তো একরকম আশ্রয়-হীনের মতই—ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে—ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি মাথায় করেও—নিউ ওয়ার্ডের সামনেকার খোলা জমিটুকুতে পায়চারী ক'রে জেলকর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য সদ্‌গতির আশায় কাল কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই অবস্থাতেই ওঁকে ওখান থেকে উদ্ধার ক'রে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে নিয়ে এসে তুলেছিলাম। একে পূর্ব পরিচিত বন্ধুলোক, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও, তায় একই নির্যাতনের সেকলে বাঁধা আমরা সবাই,—তা সে যে যেমন ভাবেই হোক।—তাই স্বভাবতই অমনটি করা আমাদের কর্তব্য বলে ভেবেছিলাম। জেলের নিয়ম অবশ্যই তাতে আমরা ভেঙ্গেছিলাম, জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তা বড় তা বড় সব মহাজনরা ঘন ঘন এসে সেদিন আমাদের স্মরণ করিয়েও দিয়েছিলেন সে কথা, এমন কি ওঁকে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিলেন তাঁরা কয়েকবার। কিন্তু—আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধে সেদিন কর্তৃপক্ষের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। আর আমাদের সেই প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকাই ছিল স্বরাজদার। তা ছাড়া, নরেশবাবুকে আমাদের

স্পেশাল ওয়ার্ডে রাখবার ব্যাপারেই নয়,—আমাদের ও প্রতিরোধ চালাতে হয়েছে—আরও অনেকদিন, আরও অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে। যাক্ সে কথা। কিন্তু—এই নরেশবাবুকে কেন্দ্র ক'রেই তুলকালাম কাণ্ডটা ঘটে গেল সেদিন। আর কি আশ্চর্য! —ঘটে গেল মুখ্যতঃ ওই স্বরাজবাবুর সঙ্গেই। আর ঘটে গেল—সাত সকালেই,—একেবারে যাকে বলে সেই—ব্রেকফাষ্ট টেবিলেই।

কি ভাবে সূত্রপাত—ঠিক বলতে পারব না। আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম,—সব সেরে শুরে যখন এলাম—তখন তো প্রায় চরম অবস্থা। প্রথমটায় আমি তো একেবারে থ,—কি কাণ্ড-রে বাবা!—হঠাৎ হলো কি!···

যাই হোক,—শেষ পর্যন্ত বেশীদূর অবশ্য গড়াল না ব্যাপারটা। নরেশবাবু, স্বরাজবাবু—উভয়েই কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত চিত্তে ফ্রেঞ্চ টোষ্টে দাঁত বসালেন,—চায়ের গেলাস হাতে তুলে নিলেন। ভাবলাম, —যাক্ বাবা, ফাঁড়াটা কেটে গেল। কিন্তু হা হতোস্মি! ব্যাপারটার জের যে রয়েই গেল—একটু বাদেই তা টের পেলাম।

চা পানাদি সেরে আমরা সব খবরের কাগজে মন দিয়েছি,—হঠাৎ দেখি নরেশবাবু তাঁর স্যুটকেস্, জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গুটিগুটি আমাদের ওয়ার্ড থেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আমরা কত অনুনয় বিনয় করলাম,—ব্যাপারটা বিশ্রীধরণেরই তো, দুঃখ-জনকও বটে, কিন্তু—কা কস্য পরিবেদনা!—নরেশবাবু মাথা নীচু ক'রে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের ওয়ার্ড-সীমানা অতিক্রম ক'রে চলে গেলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আসল স্বরাজবাবুও আত্মপ্রকাশ করলেন। বিছানায় গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখ দুটো টকটকে লাল,—মুখে অনর্গল আক্ষেপোক্তি,—এ আমি কী করলাম! কেন করলাম!···আর লোকটাই বা কী রকম! সাত সকালে নিজেই না হোক গালাগাল দিলে, আবার নিজেই গোঁসা ক'রে বেরিয়ে গেল! এত দিন এক সঙ্গে রইল,—একটু মায়া দয়া বলেও কিছু নেই

মানুষটার! দূর! দূর!...চোখের কোনে জল চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল খরাজদার।...

বোঝ প্রিয়া—মানুষটার আসল বৃত্তান্তটা।

অন্যান্য সহ-বন্দীরাও অবশ্য কম বেশী নজর কাড়েন সকলেই। অশোকবাবু এমনিতে গম্ভীর প্রকৃতির। মনের ভেতরে যখন ঝড়ও বয়,—বাইরে তখনও খুব ধীর স্থির,—অনেকটা যেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ গোছের।..

পিতা মাতা বৃদ্ধ। তায় অসুস্থ ও অশক্ত। একমাত্র সন্তান আদরিণী পিতৃসোহাগিনী বালিকা কন্যা। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা সংসারের সব দ্বায় দায়িত্ব ঝক্কি—সামলানোর তাবৎ ভার—বেচারী স্ত্রীর ওপর। তার ওপর দশটা—পাঁচটা অফিসে হাজিরাও দিতে হয় বেচারীকে। সবটা মিলিয়ে একটা উদ্বেগ মন তাই থাকেই সব সময় বাড়ীর জন্য। এর সঙ্গে আবার নিজের চাকরীস্থলেও দুর্যোগ। সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ এসেছে কোম্পানি থেকে। চাকরীর ভবিষ্যৎ ও সাংসারিক অর্থকষ্ট সংক্রান্ত দুশ্চিন্তাও তাই জড়িয়ে আছে অহর্নিশি। তথাপি—কি আশ্চর্য!—বাইরে থেকে বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারবে না এসব! দিব্যি নিশ্চিন্তে ব্রেকফাষ্ট বানাচ্ছেন, কাজকর্ম করছেন,—বই আনছেন, পড়ছেন, কাপড় জামা কেঁচে নীল লাগাচ্ছেন,—আর সকাল সন্ধ্যে কিছুক্ষণ যোগাসন করছেন। মনে হবে—বেশ আনন্দেই আছেন।

কিন্তু বাইরের ওই চাপা মনোভাবটা যে আদপে ওই চাপা দেবারই চেষ্টা মাত্র,—তা প্রকাশ হয়ে প'ড়ে রাত্রিবেলা, শয্যাশ্রয় কালে। মুখে বলেন—এমনিতেই ঘুম আসেনা, ওষুধও খান সেজন্য,—কিন্তু আসলে ওই জোর ক'রে চাপা দেওয়া দুশ্চিন্তা-গুলোই যে নিরালায় নিশুতি অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে এসে মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত ক'রে তোলে ব'লেই অমনটি হয়,—ভাবে ভঙ্গীতে —তার আভাস পেতে কষ্ট হয়না। আর—মাঝে মাঝে যখন

সোচ্চারে মা মা ব'লে ডাকেন—রাত দুপুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে,—তখন সে ডাক যে কোন জগন্মাতার উদ্দেশ্যে নয়,—নিজ গর্ভধারিণীর উদ্দেশ্যেই চিন্তাকুল সন্তানের ব্যথিত হৃদয়েরই আর্তনাদ,—তা বুঝতেও অসুবিধে হয় না কিছু। তার ওপর যেদিন জেল অফিসে বসে মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, সেদিন তো ভেতর বার—সব একাকার হয়ে গেল। জানো প্রিয়া,—অশোকবাবুর সে মর্মন্তুদ কান্নায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। তাঁকে সান্ত্বনা দেব কি,—আমি নিজেই যেন কেমন বেসামাল হয়ে পড়লাম।...

ক্ষিতিশবাবু, বিমানবাবু, দীনেশদা, যমুনা সিংজী,—সবাই এক এক দিক থেকে বিশিষ্ট চরিত্র সব। সবাই সজ্জন,—সবাই সহৃদয়। ক্ষিতিশবাবু ওরই মধ্যে অবশ্য একটু রিজার্ভড্ ধরণের মানুষ,—মেলা-মেশা ঠিকই করেন,—কথাবার্তাও যথাযোগ্য বলেন,—সময়ে সময়ে আলোচনাদিতেও মাতেন, যথাস্থানে প্রাণখুলেও হাসেন,—সবই ঠিক আছে,—তবুও কেমন যেন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। কেমন যেন একটা দূরত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা। আর এই জেলের তাবৎ রাজনৈতিক বন্দীদের সকলের সমান আপনার জন হতে গিয়ে—নিত্য সহচর আমাদের এই কটি প্রাণীর প্রতি প্রত্যাশিত দৃষ্টি দেবার সময়ও তাঁর তেমন নেই। ফলে—মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুল বোঝাবুঝিও যে না ঘটে—তা নয়। তবে—একত্র থাকতে গেলে—অমন একটু আধটু সাময়িক মনান্তর কোথায় আর না হয়। কিন্তু অমন ব্যাপার ওই দীনেশদা বা যমুনাজীকে নিয়ে অবশ্য কখনও হয় না। ওঁদের প্রকৃতিটাই তেমন নয়। তর্ক-বিতর্ক যে কখনও না বাঁধে,—তা নয়।—মতান্তরও দেখা দেয়,—কিন্তু ব্যস্ ওই পর্যন্তই,—মতান্তর আর মনান্তরে পরিণত হতে পারে না,—তেমন পথও ওঁরা মাড়ান না। আর দীনেশদার তো উপরি সম্বল তাঁর অনবদ্য হাসি,—হোঁ হোঁ ক'রে—সর্বশরীর কাঁপিয়ে—থেকে থেকে দমকা হাসি

হেসেই সব ময়লা সাফ ক'রে দেন সকলের মনের।···

তা তাবৎ দেখবার মত চরিত্র যে কেবল এই গোরা ডিগ্রীতেই বাসা বেঁধেছেন—তা নয়। এমন ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ না থাকলেও বিশেষ করে চোখে পড়ে এ জেলের আরও কয়েকটি নজর কাড়া চরিত্র।

এই যেমন রুক্মিণী দাস আগরওয়ালা। আমাদের কাছাকাছিই এক ওয়ার্ডে থাকেন। বয়েস বোধ করি সত্তর পেরিয়ে গেছে। দোহারা গড়নের ছোটখাটো মানুষটি। কোটি-পতি ব্যবসাদার। দিব্যি বহাল তবিয়তে কাটিয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু এই শেষ বয়সে—ভাগ্যে এই বন্দীজীবনের দুর্ভাগ্যবরণ। কাফে পোষা আইনেই আটকে পড়েছেন এমন। তা তার জন্য তেমন হা হুতাশ কিছু শুনিনা। মনমরা গোছেরও মনে হয় না কখনও। দিব্যি তিলক ফোঁটা টোটা কেটে,—তাস খেলে, গল্পগুজব ক'রে, কাল কাটান দেখি। আর সকালের দিকে ও দিকটায় গেলে দেখি—ভদ্রলোক শত শত ছোট ছোট ময়দার গুলি সামনেকার ছোট্ট মাঠটাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন, আর ঝাঁকে ঝাঁকে কাক পায়রা প্রভৃতি জীবেরা সেই গুলিগুলো লুফে লুফে খাচ্ছে।···

প্রথমটায় তো ভেবেছিলাম—জীবকে ভোজন করানোর মামুলী পুণ্যকর্মই একটা। কিন্তু তখন কি জানতাম যে ব্যাপারটা আরও কত গুরুত্বপূর্ণ। তা কথায় কথায় একদিন রুক্মিণীদাসজীই জানালেন সব।···

বেপার কী জানেন ভারতীজি। ও স্রেফ ময়দাকা গোলি না আছে,—হর গোলিকা বীচমে রাম নাম ভি আছে···

রাম নাম আছে?

হাঁ জী, রাম নাম আছে। বেপার কি জানেন—ভারতীজি,—রাতমে রোজ ছোটা ছোটা পেপার পর হামি রাম নাম লিখে দি উসকা বাদ ওহি কাগজ ময়দাকা গোলিমে গুসে দি, ব্যয়টি—ও

গোলিভি খাচ্ছে, রাম নাম ভি খেয়ে লিচ্ছে। ব্যস, দো কিসিমকা কাম বনছে। এক পক্ষ্‌সী জনমসে মুক্ত হো যায়েগা বেচারী। ঔর দেখিয়ে—ভারতীজি,···মেরা ভি তো সাথ সাথ এক কামমে তিন কিসিমকা পুণ্য হয়ে যাচ্ছে। এক, হাজারোটো রাম নাম হর্‌-রোজ লিখছি,—দো, হাজারো পক্ষ্‌সীকো রাম নাম ভি দিচ্ছি, ঔর তিস্‌রী চীজ, উসকা সাথ সাথ গোলিভি খিলাচ্ছি।—এখন, হাপনি দেখেন ভারতীজি,—ও শালা তিন কাম—হুঁয়া কি, নেহি? কিয়া,—ঠিক কহা কি, নেহি?···

তা এমন পুণ্যকর্মকে তারিফ না জানিয়ে পারি কি ক'রে বল? তাই শুধু সেদিনই নয়,—সহস্রবার মনে মনে সাধুবাদ দিয়েছি ভদ্রলোককে ওর জন্য। তা এমন জীবমুক্তি-সাধককে উপেক্ষা করা কি সহজ—বল? বিশেষ করে যখন এই জেলের চৌহদ্দিতেই ঘোরা ফেরা সারাদিন?

বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে শ্রীমান প্রণব মুখার্জীও। সবটা মিলিয়ে একটি মনে রাখবার মত চরিত্র। প্রায় নিয়মিতই আসে আমার কাছে। কিছুটা তার জন্যও স্নেহ পড়েছে যুবকটির প্রতি,—সন্দেহ নেই। কিন্তু—তবুও ওর আসল আকর্ষণটা অন্যত্র। এমনিতে চেহারাটাই তো সুন্দর,—তার ওপর কথাবার্তা চলন ফেরনের ধরণ ধারণটাও সুন্দর। অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র। নিজস্ব একটা মত অবশ্য আছে—সব তাতেই, তা নিয়ে তর্কও করে অনেক সময়,—কিন্তু কখনও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে না কোনদিক থেকেই। আর সব চাইতে আকর্ষণীয় ওর বাঁশী বাজানো। এই জেলের মধ্যেও একটি মস্ত বাঁশের বাঁশী ও সযত্নে রক্ষা করে। এবং মাঝে মধ্যে আমাকে এসে বাজিয়ে শোনায়। কি মিষ্টি, কি মিষ্টি,—ওর সে বাঁশী বাজানো কি বলব!—ও বলে গৌর গোস্বামী মশায়ের কাছে ওর বাঁশীতে দীক্ষা। তা তেমন ভাল শিক্ষকের অধীনে অনেকদিন সাধনা না করলে তো এমন শিল্পকর্ম অকারণ ঘটানো যায় না। অতএব যোগ্য-

স্থানে বোধ করি যোগ্য তালিমই পেয়েছে প্রণব।

কিন্তু সত্যিই দুঃখ হয়—যে এমন প্রতিভা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে নিঃবীর্য হয়ে হয়তো ধীরে ধীরে অপমৃত্যুর পথেই এগুচ্ছে! এমন কি ওর বাঁশী বাজানো মনটাও যেন একটু একটু ক'রে মরে যাচ্ছে। নিজে থেকে আজকাল তো আর বাজাতে বসেই না,—এমন কি অন্যেরা পীড়াপীড়ি করলেও বড় বাজায় না। অবশ্য—কেন জানিনা—আমি একটু বললেই ও তার লম্বা বাঁশিটি খবরের কাগজে মুড়ে—ঢেকে ঢুকে গোপনে আমার কাছে নিয়ে এসে বাজাতে বসে। এমন কি অনেকদিন বাঁশিটা আমার ঘরেই রেখে যায় ও, বোধ করি বয়ে নিয়ে আসা যাওয়ার মানসিক ধকলটা এড়াইবার জন্য।

কিন্তু প্রণব সম্বন্ধে আমার আসল আকর্ষণ ওর ও-বাঁশী নয়। আসলে ওর ভবঘুরে রোমান্টিক মনটাই আমাকে বেশী টানে। ও যখন নানান জায়গার কথা বলে, নানান মানুষের কাহিনী শোনায়, তখন ওর বর্ণাঢ্য বর্ণনা শক্তি, ভাবালু চোখ দুটো, প্রতিটি কথার মধ্যেকার আন্তরিক সুরটি,—সবটা মিলিয়ে ভাল লাগে ওকে। আর বাস্তবিকই অনেক জায়গা ঘুরেছে। ছেলেটি। না, না, তেমন তেমন জায়গা টায়গা নয়—যা সৌখীন টুরিষ্টরা সাধারণতঃ ঘোরেন। এমনিতে হয় অপরিচিত সব জায়গা, না হয় নামে পরিচিত, কিন্তু দুর্গম ও দুর্ভেদ্য সব অঞ্চল। আর আসাম নামক রাজ্যটার প্রতি এ বঙ্গ-যুবকটির যেন এক বিশেষ পক্ষপাতিত্ব! গৌহাটি, শিলং প্রভৃতি জানা শহর-গুলো তো আছেই, আছে মিজোরাম, মণিপুর, নেফা, নাগাল্যাণ্ড। এর মধ্যে আবার ওই নাগাল্যাণ্ডের প্রতিই ওর অধিকতর ভালবাসা। বেশ কয়েক বছরই কেটেছে সেখানে। আর ওই নাগাল্যাণ্ড থেকেই একদা গ্রেপ্তার হয়ে,—প্রথমটায় ওখানকার কয়েকটা জেলে কিছুকাল আটক থেকে,—শেষ পর্যন্ত এসে আস্তানা গেড়েছে এই প্রেসিডেন্সী জেলে। দশ বছরের নাকি মেয়াদ হয়েছে ওর।

তা অশোক নগরের ওই বাঙ্গালী যুবকটি কেন যে অমন আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছে, অমন, দুর্ধর্ষ নাগাল্যাণ্ডেই বা কাটালো কেন এবং কেমন ক'রে অতদিন,—তা অবশ্য ঠিক বলতে পারব না। জেলের মানুষের মুখে দু'রকম কাহিনী শুনেছি। কেউ বলেছেন—ও নক্সালী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল, রিবেল নাগাদের সঙ্গে মিশে চায়না থেকে সীমান্ত পথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির তালে ছিল। আবার কেউ বলেছেন—আসল ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়,—একেবারে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' গোছের ব্যাপার। তা সে যে যেমনই বলুন, প্রণব নিজে কিন্তু বলে—ওর ঘর ছাড়া বেদুইন মনই ঘটনা চক্রে অমন টেনে নিয়ে গিছল ওখানে। আর বিশেষ ক'রে যখন নাগাল্যাণ্ডের রঙ্গীন আকাশ, সেখানকার অদ্ভুত সুন্দর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, সেখানকার পাহাড়, অরণ্য, মানুষজন, নাগাদের পরিবার সমাজ, তাদের সুখ দুঃখ, প্রেম প্রতিহিংসা, উৎসব নৃত্য, নীতি দুর্নীতি প্রভৃতির বিবরণ শোনায় ও, তখন ওর মুগ্ধ চোখদুটোর দিকে তাকালে কিন্তু ওর নিজের ব্যাখ্যাটাই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী মনে হয়।

কিন্তু এহেন ভাবুক মুসাফির প্রণব মুখার্জীরও কিন্তু নিজস্ব ঘরোয়া ভাবনা চিন্তা আছে। যেদিন ইণ্টারভিউয়ের সময় ওর মা ভাই বোন—প্রভৃতিরা আসেন, ও হঠাৎ যেন কেমন সচেতন হয়ে ওঠে যে সে বাড়ীর বড় ছেলে,—ওর পিতা বৃদ্ধ, রুগ্ন,—অহেতুক হলেও ওর মুখ চেয়েই সকলে সব সহ্য করছেন,—আর তখন ওকে বড় বিষণ্ণ, বড় অসহায় বোধ হয়।···

বড় ভাল লাগে নতুন ওয়ার্ডের সৌগতকে। যেমন ভদ্র, তেমনি পরোপকারী। বাচ্ছা ছেলে,—বোধ হয় চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স। অথচ—জেলেই আছে বছর ছয়েক। এখনও বেচারী ইউ, টি, অর্থাৎ বিচারাধীন আসামী। মামলা যেমন মন্থর গতিতে চলছে—আরও কতকাল যে জেলে এমনিতেই কাটবে—কে জানে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত শ্রীঅনন্ত সিংহের দলভুক্ত ব'লে

আরও অনেকের সঙ্গে শ্রীমান সৌগতও প্রথম ধরা পড়ে বিহারে, এবং ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এই প্রেসিডেন্সী জেলেই আপাততঃ আস্তানা পেতেছে। ব্যাঙ্ক লুট, বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রের কারবার ইত্যাদি কয়েকটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে বেচারী।...

কিন্তু ও-সব মামলা মোকদ্দমা নিয়ে যে ওর তেমন কোন দুর্ভাবনা আছে—তা মনে হয় না। ও-সব ভাবনা চিন্তা, তাবৎ দায় দায়িত্ব,—সব ওদের সাক্ষাৎ দল নেতা কল্যাণ রায় এবং খোদ নেতা অনন্ত সিংহের ওপর ছেড়ে দিয়েই যেন ও নিশ্চিন্ত। এমন কি মামলার দিন কোর্টেও হাজিরা দেয় না কখনও। কি ক'রে যেন নিত্যি কোর্ট-ঘর করার ঝক্কি থেকে মুক্ত ক'রে নিয়েছে নিজেকে। তা ছাড়া, মামলাটা যে এখন ঠিক কোন্ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে,—আর তার গতি-প্রকৃতিই বা কেমন,—সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোন খোঁজ খবরও সে রাখে না।—যেমন চলছে—চলুক না,—শেষ মেষ যা হোক যা দাঁড়াবে—জানাই তো যাবে তখন, আগে ভাগে অহেতুক ভাবনা চিন্তা ক'রে লাভ কি,—এই ভাব। জিজ্ঞাসা করলে বলেও অমনি কথা।...

এত অল্প বয়সে এবং এত দীর্ঘ অনিশ্চিত কারাবাসের দিনেও; এমন মানসিক নির্লিপ্ততা সত্যিই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর তেমনি এমন অবস্থাতেও ওর অসাধারণ সৌজন্য বোধ,—ওর ভদ্র অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু সকলের চাইতে আকর্ষণীয় বোধ করি সৌগতের পরোপকারের বিরামহীন প্রয়াস।...

লেখাপড়া কতদূর—ঠিক জানিনে। মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট ছিল কিনা কোনদিন,—তা ও বলতে পারিনে। কিন্তু আশ্চর্য ওর ঝোঁক ওই চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারেই। জেলের হাসপাতালে নিয়মিত হাজিরাও দেয় প্রতিদিন। ডাক্তারদের সাহায্য করা, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তাঁদের সঙ্গে ঘোরা, যথাস্থানে রোগীদের জন্য ওষুধ-পৌঁছে দেওয়া,—ইত্যাদি কাজেই জেলময় ঘুরে বেড়ায় সৌগত। আর তা-ও কিছু নেহাৎ ডিউটি করা বা সময় কাটানোর মত ব্যাপার

নয় ওর কাছে। সেই সেবা-ধর্ম বলতে যা বোঝায়, অনেকটা যেন সেই রকমই। ডাক্তারবাবুদের হয়তো সময় নেই, হাসপাতালের নিয়মমাফিক রোগীও হয়তো নয়,—তথাপি কেউ অসুস্থ,—কেউ আর্ত্ত,—সংবাদটা পেলেই হলো,—সৌগত ঠিক তৎক্ষণাৎ হাজির হবে সেখানে। নিজের বিদ্যে বুদ্ধি মত ওষুধও দেবে,—দরকার মত ইন্‌জেকশান্‌ও দেবে।—আর আশ্চর্য ব্যাপার,—ওর ওষুধে ইন্‌জেকশানে ঠিক কাজও হয়। এমন কি চুপি চুপিই বলি—কারো কারো মতে আসল ডাক্তারবাবুদের চাইতে সৌগতের হাতযশ বেশী। অনেকে তাই ওকেই ডাকে আপদে বিপদে। আমাদের এখানে তো নিত্য ডাক্তারবাবুদের আনাগোনা,—তবুও টুকিটাকি ব্যামোতে সৌগতই সর্বেসর্বা। না চাইতেই ঠিক ঠিক ওষুধটি জুগিয়ে যাবে যথা সময়ে।···

অথচ দেখো—এত যে ডাকাডাকি ওকে নিয়ে, নিত্য এত যে টানাপোড়েন,—ওদিকে নিজের শরীরও সুস্থ নয় তেমন, মাঝে মধ্যে বুকের এক্সরে প্লেট নিয়ে ডাক্তারকে দেখায়,—তবুও এতটুকু বিরক্তির ভাব নেই কখনও—বরঞ্চ সর্বদাই প্রসন্ন মুখ,—সদা ক্লান্তিহীন সেবক সকলের।···

এই ডাক্তারী ছাড়া সৌগতের অবশ্য আরও দুটো বস্তুতে ঝোঁক আছে। দেদার বই পড়ে ছেলেটি, রকম বেরকমের বই। তেমন কোন জাত বিচার যে আছে এই সম্বন্ধে—তা মনে হয় না। বই—বই-ই,—সবই পড়বার বস্তু,—এমনই বোধ করি ভাবখানা ওর। তবে যেমন তেমন ভাবে পড়বার রীতি নয় সৌগতের, বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে, খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে,—খটকা লাগলেই চটকা উঠে পড়ে, বই হাতে সম্ভাব্য স্থানে দৌড়োয় অর্থ টা পরিষ্কার ক'রে নিতে। কতবারই যে ছেলেটি ওই জাতীয় উদ্দেশ্যে আনাগোনা করেছে—এই গোরাডিগ্রিতে,—এই আমাদের ক'টি মানুষের কাছে—,তা আর কি বলব। আর কি আশ্চর্য দেখ,—ওর এই বই পড়তে ভালবাসা

থেকেই বোধ করি জন্ম নিয়েছে নিছক বই-এর প্রতিই এক গভীর ভালবাসা। এই জেলের মধ্যে যে ছোট্ট পাঠাগারটি আছে,—সৌগতের তো সেটা প্রাণ বললেই চলে। প্রতিদিন নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে, কয়েক ঘণ্টা কাটাচ্ছে,—বই গুলোকে নিত্য ঝাড় মোছ ক'রে ঠিকানা মত সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে, ছেঁড়া ফাটা পাতাগুলো আটা দিয়ে জুড়ছে, নিজের মত করে ক্যাটলগ বানাচ্ছে—দরকার মতন বইপত্তর ইস্যু করছে, আবার ইস্যু বইগুলো ফেরৎ দেবার জন্য যথারীতি তাগাদাও দিচ্ছে কাউকে কাউকে। অর্থাৎ—এককথায় একজন দায়িত্বশীল লাইব্রেরীয়ানেরই কাজ করছে যেন সৌগত। অথচ আসলে ও কিছু নয়,—কেউই নয় ও পাঠাগারের। আসলে—ওর পুস্তক-প্রীতিই ওকে অমন পাঠাগারমুখো করেছে, পাঠাগার-চর্যায় নিয়ত নিযুক্ত রেখেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি—সৌগতের ওই পাঠাগার সেবার সৌজন্যে আমাদেরও একটা বাড়তি সুবিধে হয়েছে,—প্রায় প্রতিদিনই কাড়ি কাড়ি বই আসছে, রকম বেরকমের বই,—আসছে কখনও ওই সৌগতের হাত ঘুরে অশোক বাবুর মাধ্যমে,—আবার কখনও বা সৌগত স্বয়ংই পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে হাতে হাতে, সুবিধে মত।

সৌগতের দ্বিতীয় সখ—রেকর্ড আর রেকর্ড প্লেয়ার। কাড়ি কাড়ি গানের রেকর্ড আছে ওর,—দিশী বিদেশী সব রকম। সুযোগ মতন নিত্য নতুন নতুন রেকর্ড আমদানি করে। ফুরসৎ মতন বাজিয়ে বাজিয়ে সেগুলো শোনে,—মাঝে মধ্যে ডেকে ডুকে অন্যদেরও শোনায়। আমাকেও কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল,—কিন্তু কাজের ভীড়ে ওর সে নিমন্ত্রণ রক্ষাটা হয়ে ওঠেনি কখনও।

কিন্তু সৌগত সম্বন্ধে এ সব কথা তাই বলে সব কথা নয়,—শেষ কথা তো নয়ই। এই সতত কর্মচঞ্চল,—পর সেবারত পুস্তক-প্রেমিক, আত্ম-চিন্তাশূন্য অন্যথায় উদাসীন যুবক সৌগতও মাঝে মাঝে সত্যই উদাস হয়ে যায়। প্রতিমাসে প্যারোলের দৌলতে এ জেলের

চৌহদ্দি পেরিয়ে ও যখন নিউ আলিপুরে গিয়ে মায়ের অধিক ওর মাসীমার বাড়ীতে ঘণ্টাকতক কাটিয়ে—মাসীমার অনেক স্নেহ ও আদর মাথায় নিয়ে—তাঁর দেওয়া কিছু মিষ্টি বা গোটাকতক নারকেলের নাড়ু হাতে করে আবার জেলে ফিরে আসে, এবং সেই নারকেলের নাড়ু বা মিষ্টির কিছু অংশ কখনও কখনও আমাদের হাতে তুলে দিতে আসে,—তখন কিন্তু ওর আরেকটা ছবি আমার চোখের তারায় অজান্তেই কেমন ফুটে ওঠে; ওর তখনকার সেই মাসীমা সংক্রান্ত অনর্গল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা আর ঈষৎ কম্পিত অঙ্গুলগুলো অন্য আর এক কথা বলে—যাতে ক'রে ওকে আমার আরও ভাল লাগে।—স্বাভাবিক সৌগতকে যেন ঠিক সহজে খুঁজে পাই তখন।···

মনে রাখবার মত মানুষ ওই ছাতা কামানের হারান মণ্ডলও।···

আসতে যেতে হারানের সঙ্গে নিত্যই দেখা হয়। পরিচিতের মাঝারি গড়নের কৃষ্ণকায় যুবক। মাথা ভর্তি এক রাশ কালো চুল। বড় বড় দুটি ঘনকালো চোখ। টানা টানা ভ্রূযুগল। কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও করেছে—মনে হয়। উলবেড়ে কলেজে পড়েছিলও নাকি কিছুদিন। মধ্যে মধ্যে হাসি বিনিময়ও হয়। দু'চারটে কথাবার্তাও হয় কখনও সখনও। আর ওপরের বারান্দায় ব'সে,—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে নিজের ঘর থেকেও,—ওকে তো চোখে পড়ে সারা দিনই। দেখি,—ছাতির একরাশ কালো কাপড় আর গুচ্ছের খানেক শিক্ নিয়ে অবিরাম ছাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ব্যস্ত শ্রীমান। হাত চালাতে চালাতে কয়েক কলি গানও গায় হারান। কখনও গুনগুনিয়ে, —কখনও বা বেশ গলা ছেড়ে। ওপরে ব'সে ওর গান শুনি মাঝে মাঝে। বেশ মিষ্টি গলা,—তবে সুরটা অনেকটা সেই যাত্রার বিবেকের ঢঙের, কথাগুলোও প্রায় ওই জাতীয়। যদিও হারাণ নিজে বলেছে—ও কোনদিন কোন যাত্রার আসরে নামেনি।—ওর সখ থিয়েটারের। একেবারে পাগলের মত সখ। ওর ভাষায়—'ম্যাড্ ক্যাপ

কর থিয়েটার···তবে হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না স্যার, ছেলেবেলায় কেষ্ট যাত্রায় নেমেছি কয়েকবার। মেইন রোল করেছি,—খোদ কেষ্ট ঠাকুর সেজেছি, বাঁশী বাজিয়ে গান গেয়েছি। ফল্‌স্‌ বাঁশী নয়,—একেবারে আসল বাঁশী।—আর তখন গলাও ছিল—স্যার—কি বলব—একেবারে সকলের মন কাড়া। আর ওই মনকাড়া সুরের জন্যই বলতে গেলে স্যার একদিন পড়ল এই হাতে কড়া,—আয়রনি অফ ফেট্‌—আর কাকে বলে—বলুন। তবুও তো একসট্রিমটা শেষ পর্যন্ত হয়েও হলো না,—গলার কারণেই গলায় দড়িটা পড়তে পড়তেও পড়ল না শেষ পর্যন্ত। সেই ড্রপ সিনটা নামতে নামতে মাঝ পথেই আটকে পড়ল যেন···

কি রকম?—স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম ওর কথায়।

কিন্তু না,—আমার সে কৌতূহল মেটায়নি হারান সেদিন। কত চেষ্টা চরিত্তির,—না, তবুও না। সেই যে হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে দিলে—ব্যস,—হাজার অনুরোধ উপরোধেও আর রাটি কাড়লে না। তবে হ্যাঁ—রা শেষ পর্যন্ত কেড়েছিল হারান।—শুধু রা কেন,—সরাসরি সবটাই বলেছিল একটু একটু ক'রে।—কিন্তু সে বেশ কয়েক দিন পরে। অনেকটা অতর্কিতেই। তবে—শ্রীমান প্রণব মুখার্জীর যথেষ্ট অবদান ছিল তাতে। আর সত্যি কথা বলতে কি—এ ব্যাপারে পূর্বাপর অনেকটা কৃতিত্বই প্রণবের। হারানকে বলতে গেলে ওই-ই ভিড়িয়েছিল আমার দরবারে। যাইহোক,—কাহিনীটি শোনবার পর—আর কোনদিন কিন্তু হারান—অমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আর বসেনি আমার মুখোমুখি। তার পরেও এক আধবার অবশ্য এসেছে আমার ঘরে, প্রণবের সঙ্গেই এসেছে,—কিন্তু কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব,—সলজ্জ ভঙ্গীমা,—চোখাচোখি হলেই কেমন যেন চোখ নামিয়ে নিতে ব্যস্ত,—মাথাটা তো নীচু করেই বসত প্রায় সমস্ত সময়টাই। তা সে-ও তো সেই মাত্র কয়েকদিন। আজ

কাল তো আর এ মুখো হয়ই না কখনও। তবে—ওই যে বলেছি—যেতে আসতে দেখা হয়,—গোরাডিগ্রী থেকে বেরোবার পথের ওপরই তো এক রকম বসে বেচারী—তাই দেখা সাক্ষাত হয়েই যায় অমন।—তাছাড়া দোতলার বারান্দায় বসলে তো শ্রীমান মূর্তিমান হয়েই জেগে থাকে চোখের সামনে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, কথাবার্তা বিশেষ বলেনা হারান,—আসেও না কখনও এদিক পানে আগেকার মত। হয়ত লজ্জা পেয়েছে,—লজ্জা পাবার মতই তো বৃত্তান্ত। কিংবা হয়তো তেমন কিছু নয়—অনুতাপেই আপশোষ করে বোধ হয়,—কেন খাম্‌কা নিজের কথা অমন সাত কাহন বলতে গেলাম ওঁকে!—এমনিতে বুদ্ধিসুদ্ধিটা টন্‌টনে আছে তো,—লাইফার হলে কি হবে!···

তা সত্যিই—সাত কাহনই বলেছিল হারান। কেষ্ট যাত্রার কেষ্ট ঠাকুর বাঁশী আর গানের সুরে কেমন করে এক সুন্দরী কিশোরীর মন কেড়েছিল,—পরবর্তী কালে—আর ও ময়ুর পাখা, পীতধড়া প্রভৃতি পরে নয়,—সেই বাঁ পা তুলে বাঁয়ে হেলে বাঁশী বাজিয়ে নয়। কখনও থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে কখনও করুণ রসের বীর রসের অবিরাম নানান ভিয়েন চড়িয়েই কেমন ক'রে সেই একদা কিশোরী—পরে তরুনী তরুবালাকে প্রেম পাগলিনী বানিয়েছিল তারই বিস্তারিত কাহিনী।

তা ও-পর্যন্ত গোলমাল ছিল না কিছু। নিছক প্রেমেরই কাহিনী একটা। এ কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে পরিণয়ের পিঁড়িতেই বসবার কথা। বসেও অমন আকছার আপামর জনসাধারণ। কিন্তু ···'ব্যাড্ লাক্' বলে একটা কথা আছে না, স্যার,—এও তাই। ভেরী ভেরী ব্যাড্ লাক···সবই যখন প্রায় ঠিক ঠাক হয়ে এসেছে,—কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে,—বাকী কেবল ডেজ কাউন্টিং,—এমন সময় আচমকাই কেমন যেন সব ভেস্তে গেল।—উঁ!—ব্যাড লাক্ কি আর সাধে বলেছি স্যার?···

…বলা নেই, কওয়া নেই, নাথিং,—কোত্থেকে সেই স্কাউণ্ড্রেল্ সুরেন পাড়ুই এসে হাজির হলো,—আর খপ করে সেই যাকে বলে—একেবারে 'ডিনার' টেবিল থেকেই আমার 'রিচ ডিসটা' কেড়ে নিলে। ভাবতে পারেন স্যার আমার কণ্ডিশানটা তখন ?

রাগে দুঃখে প্রথমটায় তো কেমন পাগল মতনই হয়ে গেলাম—কি করি আমি এখন ? হোয়াট টু ডু নাউ ?…

সত্যি কথাই বলব স্যার,—রাগটা তরুর ওপরই গিয়ে পড়ল বেশী।—স্কাউণ্ড্রেল সুরেনটার কথা থাক,—ও বেচারীর গিল্ট কি তেমন,—মওকা পেয়েছে, মাৎ করেছে,—ব্যস্, সাবাস্ মরদ !… কিন্তু তুই তরু ? তোর এ কেমন ধারা বিয়েভিয়ার ! এত দিনের এত কথা,—এত মেশামেশি, ভালবাসাবাসি,—সব মিথ্যে ? অল্ ফল্‌স্। অল্ ফরগট্‌ন্ !…

কি বলব,—মাঝে মাঝে সত্যিই ইচ্ছে হতো স্যার,—ট্রেটারটাকে একেবারে ফিনিস্ করে দিই। আবার কখনও বা ইচ্ছে হতো—না, তরুকে নয়,—নিজেকেই ফিনিস্ ক'রে ফেলি। কেমন ক'রে এ জীবন বইব বাকী জীবন ? এ কালামুখ দেখাবই বা কেমন ক'রে মানুষকে এর পরে ?—এমন লাইফ রাখার মানে হয় কিছু ?…

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন স্যার,—হারান বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল এবার,—লাইফ না চাইলেও—কেমন 'লাইফার' হয়ে গেলুম শেষ পর্যন্ত ! অদৃষ্ট আর কাকে বলে—বলুন !—তবে এসব তো স্যার,—অনেক পরের কথা। আগের বৃত্তান্তটাই আগে বলি স্যার, ফার্ষ্ট থিং ফার্ষ্ট।…

বিগিনিং-এ অবস্থাটা যেমনই হোক স্যার,—শেষটায় মনটাকে একরকম সামলে সুমলেই নিলাম। যাক গে,—বেচারী এখন পরস্ত্রী,—কু-চিন্তে করতে নেই তাকে ঘিরে,—তাতে পাপ হয়।—নিজের ওপর ক্রোধটাও কেরমে কমে এল,—যাক্ গে,—লাইফে অনেকের অনেক কিছুই তো লষ্ট হয়,—আমারও না হয় হলো

একটা, সো হোয়াট্!···

কয়েক মিনিট একটু যেন অন্যমনস্ক মতন হয়ে রইল হারান,—লম্বা লম্বা বিড়িতে টান দিল বার কতক,—তারপর আবার ধীরে ধীরে কথার খেই ধরলে,—

ওই যা বলছিলাম স্যার,—একটু একটু ক'রে নরম্যাল হয়ে উঠলুম। খাই দাই, নতুন নাটকের রিহার্সালও দিই নিত্যি সন্ধ্যেবেলা,—কখনও সখনও রোদটা পড়ে এলে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে বসে আপন মনে গানও গাই এক-আধটা। আর ওই গান গাওয়াটাই,—কি বলব স্যার,—কাল হলো আমার,—ট্র্যাজিক ড্রামাটা জমে উঠল একেবারে···হারান যেন সমস্ত ফুসফুসটা উজাড় করেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে একটা।···

একটু বিরতি দিয়ে হারান আবার আরম্ভ করলে,—একদিন,—কি বলব স্যার,—অমনি তো ব'সে ব'সে গান করছি আপন মনে,—মনে হলো কে যেন পাশে এসে বসল।—প্রথমটায় তো চমকে উঠেছিলাম,—কে রে বাবা!—এমন লোন্‌লী নদীর ধার,—ঝোপজঙ্গলও দেদার আশে পাশে, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে,—এমন সময় কে আবার বসবে এসে এমন ক'রে!—তা পরক্ষণেই ভয়ের ভাবটা কেটে গেল স্যার।—ভয় কি স্যার,—একেবারে ভিন্ন ভাবেই পেয়ে বসল তখন আমাকে। রাগ, অভিমান, দুঃখ্যু, আনন্দ,—সে এক স্ট্রেঞ্জ্ ফিলিং স্যার!—ফিলিং কি, যেন ফিলিংয়ের অদ্ভুত এক ককটেল আর কি!—মানে অন্য কেউ তো নয়,—আমার সেই তরুই অমন হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল তো সেদিন,—আমার গানের টানেই এসেছিল অমন,···তাই···

তা শুধু ওই একদিনই নয়,—প্রতিদিনই আসতে লাগল তরু,—সেই একই জায়গায়,—প্রায় একই সময়ে, অল মোষ্ট টু দি গান। আর আমি তো—মিথ্যে বলব না স্যার—প্রায় দুপুর থেকেই হা পিত্যেশ করে বসে থাকতাম···

জানি—তরু পরস্ত্রী।—জানি কদিনের জন্য বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে,—কদিন পরেই আবার যথাস্থানে ব্যাক করবে।—তবুও কেমন যেন এক নেশার ঘোরেই ডেলি হাজিরা দিতাম অমন। তাছাড়া,—অপরাধ নেবেন না স্যার,—বিয়ের পরে তরুর চেহারাটাও যেন অনেক বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছিল, সেই যাকে বলে 'ডেন্‌জারাস্‌লী বিউটিফুল'—আর কি!—কিন্তু তখন তো ভাবতে পারিনি স্যার,—যে ওই বিউটি ওর কাল হবে!—তাহলে সত্যি বলছি স্যার,—হাজার কষ্ট হলেও—ওকে আমি আসতে বারণ ক'রে দিতাম।…

একটুখানি থেমে—হারাণ আবার বলতে লাগল,—কিন্তু সেই যে বলেছি স্যার,—ব্যাড্‌ লাক্‌। তাই-ই ঘটে গেল সব অমনধারা কাণ্ডকারখানা!—কিন্তু ভাবতে পারেন স্যার,—মানুষ অমন নীচ হতে পারে?—অমন ক্রুট্‌ বনে যেতে পারে?…তুই মনসুর মিঞা,—পাড়া-প্রতিবেশী,—পাশাপাশি বাড়ী বললেই চলে,—নিত্যি দু'বেলা দেখা সাক্ষাৎ, আসা যাওয়া,—বয়েসও তোর ষাটের কাছাকাছি, তরু সে তুলনায় তোর মেয়ের বয়সী,—ডাকেও চাচা চাচা বলে,—আর তুই-ই কিনা—মেয়েটাকে একলা পেয়ে—অমন হাংরী উল্‌ফের মতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লি?—পারলি—মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে অমন পশুর মত কর্ম করতে?—চাচা, না হাতি!—শালা হারামীর বাচ্ছা! তোর পেটে পেটে শালা এতো কুচিন্তে!—অথচ—বাইরে থেকে বোঝবার কি যো আছে কিছু।

তা দোষ আমারও কিছু কম ছিল না স্যার।—স্কাউণ্ড্রেলটাকে দু' একদিন আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে যে না দেখেছি,—তা নয়। ভেবেছিলাম,—এমনিতেই হয়তো লকড়ী-ফকড়ী যোগাড় করতে বেরিয়েছে, কাটারিও একটা হাতে রয়েছে,—নিছক গৃহকর্মেই ঘুরছে অমন,—ব্যাড্‌ মোটিভ নেই কিছু।—কিন্তু অন্য বৃত্তান্তও কিছু যে থাকতে পারে এসব ক্ষেত্রে,—তা তো ভাবিনি। তাহলে

তো ওকে অমন আসতেই দিতাম না। তবে—ওই যে বলেছি স্যার,—বুড়োর বাইরের বিহেভিয়ারটাই মতিচ্ছন্নটা ঘটালে।…

আর মতিচ্ছন্নটা কি শুধু ওই ভাবেই হলো স্যার সেদিন?—তা নয়, নট ছাট।—রোজ আগে আগে গিয়েই বসে থাকি,—ওদিন আবার বেশ একটু পরেই গেলাম।—কি? না, সারপ্রাইজ দেবো।—তা কে কাকে সারপ্রাইজ দেয়—এবার দেখো বোকচন্দর হারাণচন্দ্র!—কি বলব স্যার,—আজও নিজের গালটা চড়াতে ইচ্ছে করে নিজের ফুলিশনেসের কথা ভাবলে—…

কিন্তু সে তো স্যার পরেকার কথা—প্রথমটায় দৃশ্যটা দেখে তো 'ফর সাম্ টাইম্' একেবারে স্পেলবাউণ্ড হয়ে গেলাম,—কি আশ্চর্য! এ-ও সম্ভব! কিন্তু সে ওই স্যার—কয়েক সেকেণ্ডেরই বৃত্তান্ত,—তার পরেই তো ধা করে মাথায় তাবৎ রক্ত চ'ড়ে উঠল,—চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টানে বেটাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলাম!—কিন্তু কি আশ্চর্য!—শালার গায়ে যেন তখন অসুরের শক্তি— ! প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওকে ছাড়াতে পারলাম না।—আর তাতে করেই বোধ করি একেবারে সেন্স হারিয়ে ফেললাম,—পাশে কাটারিটা পড়েছিল,—স্কাউণ্ড্রেলটারই কাটারি,—ব্যস,—মাথাটা একটু তুলে ধ'রে—এক কোপ বসিয়ে দিলাম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল,—আর বুড়ো ব্রুটটাও বাবারে বলে শিকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে—দৌড়োতে লাগল। কিন্তু তখন কি আর রক্ষে আছে বাছাধনের,—একেবারে ডেনজারাস নেশা ধরে গেছে,—রক্তের নেশা, বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে লাগলাম। —ব্যস, বাছাধন একেবারে ফ্ল্যাট কিছুক্ষণের মধ্যেই।—

কিন্তু…কিন্তু স্যার,—যার জন্য এত কাণ্ড করলাম, এমন একটা মার্ডার পর্যন্ত করলাম,—সেই তরুকে তবুও আমি রক্ষা করতে পারলাম না। হা অদৃষ্ট! হা অদৃষ্ট!…হাউ হাউ ক'রে হঠাৎ কেঁদে উঠল হারাণ। দু'চোখ বেয়ে তার দরদরধারা নামল।…

কেমন যেন অভিভূত মতনই হয়ে গেলাম প্রিয়া,—ওর ভাব-গতিক দেখে। নীরবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম—ওর বাকী কাহিনীটুকু শোনবার জন্য।

তা বাকীটুকুও শোনালে হারাণ। একটু সামলে নিয়ে ভেজা ভেজা চোখদুটো আমার চোখের ওপর রেখে বললে,—সেই রাত্তিরেই স্যার—তরু সুইসাইড করলে। বোধ করি—ঘৃণার দেহটা আর বইতে পারল না বেচারী!···

তারপর—তো দেখছেনই স্যার আমার হাল। মার্ডার চার্জের পরিণামে এই লাইফারের জীবন। কিন্তু মিথ্যে বলব না স্যার,—এমনটি আমি হতে চাইনি,—তরুর সুইসাইডের খবর পেয়ে আমিও নিজেকে ফিনিশ করতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু হলো না,—পুলিশ এসে আচমকাই এ্যারেষ্ট করলে। মানে,—এমনিতে মরলে আর মজাটা কিসের!—লাইফ সেভ্ না করলে—আর লাইফার বানানো যাবে কি করে বলুন?—তবে অতি দুঃখের মাঝেও সেদিন পুলিশের চার্জ শুনে কিন্তু হাসি সামলাতে পারিনি স্যার। মার্ডার করেছি,—সত্যি, হলফ করে বলেছিও সে কথা কোর্টে,—কিন্তু রেপ?—তরুকে রেপ করেছি আমি?—মরি! মরি! বলিহারি যাই—সেই উদোর পিণ্ডি এমনভাবে এই বুদোর ঘাড়ে না চাপালেই কি চলত না বাবুদের! মানে—আসলে আমিই লোকটা জানোয়ার, আর ও বুড়ো ভামটা কেবল তরুকে বাঁচাতে গিয়েই না অমন বেঘোরে প্রাণটা দিলে···ভাবুন কাণ্ডটা! থিঙ্ক!···সত্যিই স্যার,—যত ভাবি তত মনে হয়—বাইরের সে জগতটার তুলনায় এ জেলের ভেতরটা বোধ হয় তেমন ডার্টি প্লেস নয়।—অন্ততঃ এখানে কোন ক্রিমিনালকে মার্ডারার বানাবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগেনা মানুষ।···

হারাণের কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্তু এর পরেও তার কিছু কথা আছে। কথাটা সে সেদিন আর বলেনি। বলেছিল ক'দিন

পরে এসে। দুপুরের দিকে একলা এসে চুপি চুপি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল,—আচ্ছা স্যার, আপনি পরজন্ম মানেন? মানেন জীবনের আন্‌স্যাটিসফায়েড ডিজায়ারগুলো পরজন্মে ফুল্‌ফিল্ড হয়?—হতে পারে?

ওর প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম,—হঠাৎ এ জাতীয় প্রশ্ন কেন?

তা একটু পরেই বিস্ময়ভাবটা কেটে গেল। কাটিয়ে দিলে হারাণই। একটি বিবর্ণ অর্ধছিন্ন অনেক ভাঁজে ভাঁজ করা চিঠি হাফ্‌ প্যান্টের পকেট থেকে বার ক'রে—হারাণ বললে,—তরুর চিঠি। সুইসাইড্‌ করবার ঠিক আগেই বোধ হয় লিখেছিল। লিখেছিল,—এ জন্ম তো বৃথাই গেল,—কিন্তু ভগবান যদি থাকেন—পরজন্মে আমাদের মিলন হবেই। তা বলুন না স্যার,—এসব কি সত্যি? পরজন্ম আছে? পরজন্মে মিলন হয়?—মৃত্যুকালে মন দিয়ে চাইলে? ইজ্‌ ইট্‌ পসিবল্‌?···

উত্তর ঠিক আমার জানা ছিল না,—তবুও কেন জানি হারাণকে অসঙ্কোচে বললাম,—নিশ্চয়ই সত্যি। এর চাইতে বড় সত্য বোধ করি আর কিছু নেই হারাণ···

কী বলব প্রিয়া,—আমার এই সামান্য আশ্বাসবাক্যে যে সান্ত্বনা ও শান্তি পেয়ে প্রসন্ন মুখে ফিরে গেল হারাণ তা আমার আজও চোখের সামনে ভাসছে।—আর ভাসছে—আসতে যেতে অসংখ্যবার দেখা ওর বোধ করি এই চিঠিখানাই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বার দৃশ্যটা···

তবে একদিক থেকে সকলের ওপরে টেক্কা দেবার মত চরিত্র কিন্তু 'টম্‌টম্‌ দাদুর'।—ওঃ! বিশ্বকর্মা যে সত্যিই কত বড় কারিগর,—তা ওই টম্‌টম্‌ দাদুকে দেখলে কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়···

'টম্‌টম্‌ দাদু' নামকরণের কৃতিত্বের দাবীটা কোন্‌ মহাজনের,—জানিনা। কেউ ঠিক কোন সংবাদও রাখে না তার। কিন্তু এ

জেলের তাবৎ ব্যক্তিই বোধ হয় জানে—'টম্‌টম্ দাদু' ব্যক্তিটি কে,—এবং জানে—মোটামুটি কোন্ কোন্ গুণে অলঙ্কৃত সে অসাধারণ মহাপুরুষ। তবে ইতর বিশেষ তো থাকেই এসব ব্যাপারে,—খোলামেলা খবরের কাগজ তো আর নয়,—একেবারে সিল্ করা বন্ধ বই,—যত পাতা ওল্টাবে ততই মজা,—নিত্য নূতন।···

তা প্রথম দর্শনেই শুভদৃষ্টি গোছেরই একটা কিছু হয়েছিল নিশ্চয়ই,—নইলে টম্‌টম্ দাদুই বা অমন থেকে থেকে প্রতিদিন আসবে কেন আমাদের অঙ্গনে! আর আমরাই বা অমন ব্যস্ত থাকব কেন—ওকে পাকড়াও করবার জন্য। দেখা হলেই বা সবাই অমন ধ'রে বসব কেন,—দাদু, গল্প বলো!···

তা গল্প কিছু আছে বটে দাদুর ষ্টকে!—আর গল্পগুলো তো গল্পও নয় তেমন,—যেন অটোবায়োগ্রাফীই আওড়ে যাচ্ছে লোকটা! —সবই জীবন-কাহিনী,—নির্ভেজাল নির্জলা আত্ম-কথা।···

প্রথম দিনেই শুনিয়েছিল টম্‌টম্ দাদু—এক রোমাঞ্চকর কাহিনী, —গত বিশ্বযুদ্ধের এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী অধ্যায়েরই ইতিবৃত্ত। আর বলা বাহুল্য, তার অন্যতম নায়ক স্বয়ং টম্‌টম্ দাদু···

কি বলব ছার, উপরে সারি সারি উড়োজাহাজ।—এই পাক মারতাছে আকাশে—যেন দল বাঁইধা চিল শকুনই উড়তাছে ঘুইরা ফিইরা,—এই আবার ধাঁ কইরা ওই চিল শকুনের মতনই ডাইভ্ মারলো একেবারে বিদ্যুগতিতে,—ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে দুম্ দাম্ গুড়ুম্ গাড়াম শব্দ। উঃ, কি আর বলব ছার,—যেন হাজারটা বজ্রপতনই হইয়া গেল এক সঙ্গে চোখের সামনে! চারিদিকে তখন বেবাক ধোঁয়া আর ধোঁয়া! আর আগুনের কারবার আর কি কইব আপোনাগো, যেন তামাম দ্যাশটাই জ্বলতাছে জ্বলজ্বল কইরা।

তবে ছার,—নিয়তি বইলা একটা জিনিস আছে—মানেন তো? —ও ফাটাক না বেটারা অমন হাজারটা বোমা,—দিক না সব আশে পাশের পুড়াইয়া শ্যাষ কইরা, তাই বইলা আমার ইস্ত্রীরও যে

কপাল পুড়ব ওই সঙ্গে—তা তো আর হইবার নয়।—কপালের লেখা তো নয় তেমন ছার।—তাই আমি ঠিক হেল্ এ্যাণ্ড হার্টিই রইয়া গেলাম।…

তবে ছার,—বিদিকিচ্ছিরী আওয়াজ তো,—একবারেই কানে তালা ধইরা যায়,—তায় মুহুর্মুহুই চলছে তো ব্যাপারটা,—তাই পেরথম্ পেরথম্ তালা ধরতে ধরতে শ্যাষটায় কানটা কালা না হইয়া যায়—এই ভাইব্যা গামছাখান কানে জড়াইয়া রাখছিলাম—শুরু হইতেই।—তার উপর—নিয়ম কাইনুন জানা আছিল তো সব,—নতুন তো না এ লাইনে,—তাই চক্ষু দুটি মুদ্রিত কইরা এক্কেবারে ভূমিশয্যা তো লইয়াছিলাম সেই গোড়া থাইকাই,—ব্যস, প্রাণে বাঁচলাম ছার ওই ভাবেই…

তবে ওই বোমাই তো' সব না ছার,—ও তো আছেই,—কিন্তু আরও আছে ওর লগে হাজারো পোলাপান।—থাইকা থাইকা কামানের গোলা আইসা পড়তেছে,—দুম্, দুম্। রাইফেলের বুলেট ছুটতাছে—ছাঁই, ছাঁই।—সবটা মিইলা সে এক বীভৎস কাণ্ড-কারখানা! ষ্ট্যাণ্ড করতে ষ্ট্রং নার্ভ চাই ছার,—হকলে পারে না। আমাগোর দলের এক সেপাই কান্নাইয়া তো কাঁইদা কাইটা একশা হইল,—আর আনোয়ার আলি বেটা তো এক্কেবারে চরম করল। সেই যে নিয়ম মাফিক শুইয়া পড়ল মাটিতে,—ব্যস,ওই-ই শ্যাষ,—মাটির উপর থেকে টাইনা লইয়া পরের দিন মাটির তলাতেই শোয়াইয়া দিতে হইল বেচারীকে।…তবে মিছা কইব না ছার,—আমরাও কিছু কম যাই নাই,—অগো কতলোক যে মরছে আমাগো গুলিতে—তারও কোন খোঁজ খবর নাই। এই ধরেন গিয়া,—আমিই তো কম কইরা দশ বিশ হাজার রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ছি। এনিমিদের কত লোককে যে ঘায়েল করছি,—তা আর কি কইব আপনাগো…

কিন্তু মজার কথা কি জানো,—টম্‌টম্ দাদু শুধু মুখেই কথা বলেনা, প্রয়োজন ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গী সহযোগে সমস্ত ব্যাপারটাই সরল

ক'রে দেয়। এমনকি স্থানে স্থানে আগে পিছে হ'টে, হাঁটু গেড়ে ব'সে,—হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে.—এমনকি এক আধবার মুখে সোচ্চারে দুমদাম্ আওয়াজ ক'রেও—বর্ণনাটাকে বাস্তবচিত্র ক'রে তোলবার চেষ্টা করে। আর তাতে ক'রে—আমাদের আকর্ষণটাও বেড়ে চলে ক্রমশঃ। কিন্তু অকস্মাতই অসময়ে ছেদ টানতে হলো ব্যাপারটায়। কারণ, নীচে থেকে—দীনেশ দা হাঁক পাড়লেন,—নীচেয় নেমে আসুন সব, খানা প্রস্তুত। অর্থাৎ—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটা বেজেছে,—তাই ব'সে ব'সে গল্প শোনা মুলতুবি রেখে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আপাততঃ চলমান হতে হবে। তা উঠেও পড়লাম আমরা সবাই,—ক্ষিদেটাও হঠাৎ কেন জানি বেশ চনমনে বোধ হলো।···

তবে অমন ব্যস্ততার মধ্যেও স্বরাজদা কিন্তু চট্ ক'রে টম্‌টম্ দাদুকে ছাড়লেন না। জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু দাদু, যুদ্ধটা করলেন কাগো সঙ্গে? এনিমিটা কে আছিল?

প্রশ্নটা শুনে টম্‌টম্ দাদু কিন্তু বেশ রেগেই গেলো···কি যে জিগান ছার,—মাথা মুণ্ডু নাই কিছু।—বলে মাথার উপর থিক্ থিক্ কারতছ বিষধর সর্প সব,—গাছের ডালে ডালে, তাঁবুর ছাদে,—সর্বত্র,—মাটিতে হকল স্থলে ইয়া বড় বড় জোঁক মাথা উচাইয়া খাড়া হইয়া আছে অহর্নিশ,—জঙ্গলে জঙ্গলে চোখ জ্বইলতাছে—বাঘের, নেকড়ের,—তার উপর গিয়া হাপনার ও বোমা গুলিগোলা তো আছেই। বলে পরাণডা রক্ষা করতেই প্রাণান্ত তখন, আবার জিগাইতেছেন—কার সঙ্গে লড়াই! ও-সব দেখভাল্ কাম করি তখন ক্যামনে? কোন্‌দিক দিয়া? টাইমটাই বা দেখলেন কোথায় ছার?···

বোঝ ব্যাপার। টম্‌টম্ দাদুর সেপাই বৃত্তান্তটা উপলব্ধি কর। অথচ—যুদ্ধে যাবার কাহিনীটা কিন্তু মিথ্যে নয় টম্‌টম্ দাদুর। সত্যিই—ও সেপাই ছিল। আর ওই এক্স্ মিলিটারী ম্যান

হিসেবেই এই বৃদ্ধ বয়সেও জেলের খবরদারির কাজে বহাল হয়ে রয়েছে।...

তবে ও-নামেই দেখভাল্—কেবল খাতায় কলমে।—আসলে টম্‌টম্ দাদু সারাক্ষণ চরকির মত পাক খাচ্ছে জেলময়। সকলের সঙ্গেই ওর ভাব ভালবাসা। ইয়ার্কি ফাজলামির সম্পর্কও। তাই যত্রতত্র,—শাসক শাসিত,—সবার সঙ্গে গল্প গুজব—হাসি ঠাট্টা—অহরহ চলছেই টম্‌টম্ দাদুর। আর সকলেরই সমান আগ্রহ—ওকে দুদণ্ড কাছে পাবার জন্য,—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর দুয়েকটি ওই অটোবায়োগ্রাফী মার্কা গল্প শোনবার জন্য। আর তা বিস্ময়করও নয় কিছু।

একে তো দাদুর চেহারাটাই যথেষ্ট আকর্ষনীয়। বেঁটে, একটু মোটাসোটা, কয়লার মত কাল দেহবর্ণ, তায় চুল ভ্রূ শোনের মত শাদা! আর ওই শাদা ভ্রুর বড় বড় শাদা চুলগুলো চোখের ওপর নেমে এসে চোখদুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। ফলে দাদু চোখ চেয়ে না বুজে—ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেও ঠিক বোঝা যায় না। তার ওপর টম্‌টম্ দাদুর চলনটাও চেয়ে চেয়ে দেখবার মত! চলে তো না দাদু,—যেন কথক নৃত্যের তাল মেলাতে মেলাতে নাচে।—আর তার সঙ্গে যদি একটু ভাবের গানের এক আধ কলি শুনিয়ে দেয় কেউ, কিংবা কীর্তনীয়াদের মত হাত তুলে কেউ উদ্বাহুমতন ভঙ্গী করে—তাহলে তো আর দেখতে হবে না,—একেবারে তা থৈ থৈ থৈ নৃত্য শুরু ক'রে দেবে টম্‌টম্ দাদু। সে এক প্রায় চক্ষু বিদারক দৃশ্য।

কিন্তু টম্‌টম্ দাদু যে একদা মিলিটারী ম্যান ছিল—তারও স্মৃতি বোধ করি মাঝে মধ্যে চাগিয়ে ওঠে মনে,—তখন স্রেফ মার্চের ভঙ্গীতেই চলা ফেরা করে দাদু। কেউ যদি আবার চাগিয়ে দেয় একটু,—তাহলে তো কথাই নেই,—একেবারে সেই ডবল কুইক মার্চ তখন। যেমন স্বরাজদা মাঝে মাঝে চাগিয়ে তুলে মজা দেখেন।

আসছে হয়ত বেচারী গোরাডিগ্রী পানে,—কাছাকাছি ডিউটি আছে বোধ হয় কোথাও,—কিন্তু ওপরের বারান্দা থেকে যেই ওকে দেখা,—স্বরাজদা হাঁক পাড়লেন—এ্যাটেনশান্, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে টম্‌টম্ দাদু এ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল। স্বরাজদা এবার হাঁকলেন—লেফট রাইট, লেফট রাইট—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওই পা ঠুকেঠুকে লেফ্‌ট রাইট। আর যেই বলা—কুইক মার্চ,—ওই কুইক মার্চ করতে করতেই টম্‌টম্ দাদু ওপরে উঠে এসে একেবারে সামনে হাজির হলো। কিন্তু হাজার হোক মিলিটারী ম্যান তো,—অর্ডার না পেলে সৈনিক থামতে পারে না, তাই সামনে এসেও—ওই বুট ঠুকে ঠুকেই বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। তারপর যেই অর্ডার দিলেন স্বরাজদা—হল্ট! ব্যস, থেমে গেল টম্‌টম্ দাদু।···

তবে প্রকৃত আকর্ষণ বোধ করি—এসব নয়,—আসলে দাদুর গল্পগুলোই মনোহারী। আর সে সব গল্পই যে কেবল যুদ্ধের,—তা নয়। রকমারি সব গল্প দাদুর। আর কেনই বা না হবে তা। শুধু মিলিটারী ম্যানই তো ছিল না দাদু। সাপের ওঝা ছিল, ভূতের ওঝা ছিল,—অসাধারণ সব করিতকর্মা মন্ত্রতন্ত্রও ছিল ওর আয়ত্তে। কত অসাধ্য সাধনই না করেছে দাদু সেই সব মন্ত্র দিয়ে! তবে হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁপা সামলাতে হতো সেই সব কর্ম করতে। এই যেমন—সাপে কাটা রোগী সারানোর ব্যাপার। যে কোন সাপে কাটুক,—যত কঠিন কেস হোক,—এমনকি ডেথ্ সার্টিফিকেটও দিয়ে দিক ডাক্তারে,—না, তাতেও ভয়ের কোন কারণ নেই, টম্‌টম্ দাদু ঠিক সারিয়ে তুলবে রোগীকে। তবে হাঁ,—ওই যে বলছিলাম,—কিছু হ্যাঁপা পোয়ানোর কারবার ছিল···

তা বলতে গেলে—ঘটনার তুলনায় সেই বা এমন কি!—একটা টাকা, সাতবাটি দুধ, আর একখানা নতুন বস্ত্র,—এই-ই তো ক'বস্তু সাকুল্যে। ওই টাকাটাই অবশ্য লাগবে প্রথমে। ওইটে দিয়েই শুরু হবে দাদুর খেল্। মন্ত্রপূত করে ওই টাকাটাই শুধু ছুঁড়ে দেবে

দাছু। তারপর তো টাকারই র্মক সব। নাচতে নাচতে ঐ টাকাটাই ধাওয়া করবে সাপের পানে।—যেখানেই থাকো, যত দূরেই থাকো, যেখানেই লুকোও না বাছাধন, নিস্তার নেই কিছুতেই। টাকাটা ঠিক আততায়ী সাপটার কপালে গিয়ে ঠক্ ক'রে সেঁটে যাবে। শুধু কি তাই ?—ওই টাকাটাই হিড় হিড় ক'রে টেনে আনবে সাপটাকে তার শিকারের কাছে,—সেই সাপে কাটা রোগীর কাছে,—আর তারপরেই—সাপটা গিয়ে ঠিক যে জায়গায় ছোবল লাগিয়েছিল ঠিক সেইখানটায় মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে নিজের ঢেলে দেওয়া সব বিষটা নিজেই চুমুক দিয়ে তুলে নেবে। কপালে সেঁটে থাকা টাকাটাও এই সময়ে অবশ্য সাপের কপাল থেকে টুক ক'রে পড়ে যাবে। তা যাক,—সাপটা কিন্তু এর পরে ওই পর পর সাজানো দুধের বাটিতে মুখ ঠেকিয়ে বিষ ঢেলে দেবে। প্রথম বাটিটার দুধ বিষে সবুজ হয়ে উঠবে,—দ্বিতীয়টারও তাই। তৃতীয়টারও তথৈবচ। তারপর ধীরে ধীরে পঞ্চম বাটি থেকে দুধের রং স্বাভাবিক ঠেকবে। তবুও বলা যায় না তো কিছু,—কথায় বলে সাবধানের মার নেই,—ও পঞ্চম, ষষ্ঠ,—কোন বাটির দুধই পান করবে না সাপটা। চোঁ চোঁ ক'রে চেটে পুটে সব দুধটা খাবে সেই সপ্তম বাটি থেকেই। আর তার পরেই কেমন মৃতবৎ নেতিয়ে পড়বে ঠিক ওই বাটির পাশেই। আর তখনই কাজে লাগবে ওই কাপড়খানা। ওই কাপড়খানায় ভাল ক'রে জড়িয়ে মৃতপ্রায় সাপটাকে বেচে দাও ব্যবসায়ীদের কাছে। সাপ পিছু পঞ্চাশ টাকা লাভ। রোগীকে বাঁচানোও হলো,—'বেবসা ভি হলো সাথ সাথ'।···

অকপটেই বলেছে টম্‌টম্ দাদু,—ছার, উচিৎ না এমন কাম। কিন্তু কি করব কন,—প্যাটের লাইগাই করতে হইছে অমন কাম।

তা অখন আর কর না নাকি অমন কর্ম ?—জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্বরাজদা।

না ছার,—অনেকদিন ছাইড়া দিছি ও-সব। একদিন রাইত্রে,—

তা দুইটা তিনটা হুইব তখন,—কি বলব ছার,—এই ছাখেন এখনও গায়ে কাঁটা দেয় কথাডা মনে করলে, যে সে নয়, স্বয়ং মাদার মনসা আইয়া বললেন,—দত্ত, ছাইড়া দে অমন কাম,—ওতে পাপ হয়··· ব্যস্, সেই থেইকা সব বন্ধ কইরা দিছি···

তা শুধু সাপের ব্যাপারেই নয়,—ভূতের কারবারও আর ইদানীং করে না টম্‌টম্ দাদু। আর তাতে দোষও দেওয়া যায় না বেচারীকে। কি করবে বল?···দিব্যি এর ওর কাঁধ থেকে ভূত নামাচ্ছিল,—টু পাইস হচ্ছিলও তাতে, কিন্তু একদিন পড়বি তো পড় স্বয়ং ওঝাই পড়ল ভূতের পাল্লায়। আর পড়লও এক বিশ্রীভাবে।

আসল লোকের ঘাড় থেকে ভূতকে অনেক কষ্টে নামিয়ে টম্‌টম্ দাদুতো দিব্যি ট্যাঁকে পয়সা কড়ি গুঁজে ঘর মুখো হলো, মনের আনন্দে দুয়েকবার শিসটিসও দিলো,—কিন্তু বাড়ী ঢুকেই কেমন যেন একটু বেতালা ভাব।—কিরে বাবা, বাঁ কাঁধটা এমন ভারী ভারী ঠেকছে কেন!—কি ব্যাপার! তা বাঁয়ের ব্যাপার বুঝতে না বুঝতেই —ডান কাঁধটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল।—তারপর ক্রমান্বয়ে তাজ্জব ব্যাপার ঘটতে লাগল সব,—এই বাঁ কাঁধ, এই ডান কাঁধ, বাম দক্ষিণ, —লেফ্‌ট্ রাইট,—ঠিক মিলিটারী প্যারেডই চলতে লাগল কেন। তা অমনটা চলল বাকী রাতটা ধরেই!—সে এক অসহ্য অবস্থা টম্‌টম্ দাদুর। কিন্তু যেমনই হোক, নামকরা গুণীন একজন,— সকাল হতে না হতেই টের পেয়ে গেলো তাবৎ বৃত্তান্ত।—মিলিটারী ভূতেই ঘাড়ে চড়েছে,—রোগীর ঘাড় ছেড়ে ওঝার ঘাড়েই ভর করেছে। ও লেফট্ রাইটের রহস্যটাও ফাঁস হয়ে গেল ততক্ষণে।

তা যতই মিলিটারী হও বাবা ভুত, যতই কেননা লেফ্‌ট্ রাইট্ কর,—আসলে আমিও তো ছার, মিলিটারী ওঝা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমনি কাবু কইরা ফেললাম না বাবাজীবনকে যে পলাইতে আর পথ পায়না তখন···তা যাই হোক,—সেই থেইকা আর ও-ঝামেলায় জড়াই না নিজকে···টম্‌টম্ দাদু একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলল,—কিন্তু ছার, রোজগার পাতিও তো কইম্যা গেল তাতে কইরা…

কিন্তু—ওই সাপ বা ভূত নিয়েই যে তাবৎ মাহাত্ম্য টম্‌টম্ দাদুর—তা নয়। ওই যে বলছিলাম হরেক রকম মন্ত্রতন্ত্র আয়ত্তে দাদুর,—হয়কে নয় করতে পারেন। এই যেমন—ইচ্ছে করলে ফুস মন্তরে হাওয়া ক'রে দিতে পারেন মানুষকে। জেলের কয়েদ খানা থেকে চালান করে দিতে পারেন বাইরে,—মুক্ত জগতে। তা স্বরাজদা সতর্কই ছিলেন। বললেন, দাও না দাদু মাষ্টার মশাইকে অমন মন্ত্রবলে হাওয়া কইরা? বেচারী বাড়ী যাওনের লগে ব্যস্ত হইছে তো।··ছার, মিথ্যা বলুম না,—পারি আমি। কিন্তু ছার, তাহলে তো আমার বিপদ হয়,—ওনার জায়গায় আমাকে ঢুকতে হয়। গুণতিতে তো কম হইলে চল্‌ব না। তেমন মন্ত্র তো জানা নাই ছার যে গুণতিতেও গুবলেট কইরা দিব।…

কিন্তু এত গল্প, এত হাসির মধ্যেও টম্‌টম্ দাদুর আরও একটা নিজস্ব গল্প আছে,—একটা বেদনার বুক ফাটা কান্না আছে। আর সেইখানেই বোধকরি লোকটার আসল রূপ ধরা পড়ে।··আর ওই আসল রূপের দর্পণে টম্‌টম্ দাদুর ওই বাইরেকার প্রতিবিম্বটা যেদিন আমার চোখে ধরা পড়ল সেদিন থেকেই ও আমার কাছে আরও আকর্ষণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হলো…

সেদিন শনিবার। অনেক ফল, অনেক মিষ্টি জমেছে টেবিলে। জেলের ক'জন কাপোষা দিয়ে গেছেন। ওপরের ঘর থেকে যথারীতি নীচে সুশীলদার ঘরে চালান করবার সময় পাইনি তখনও। হঠাৎ টম্‌টম্ দাদু এসে হাজির,—ভাল আছেন ছার?…

কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম—ওকে অমন দেখে। একে তো—এমন সময়ে ও কখনও আসেনা। আর অমন চুপি চুপি আর পাঁচ জনের মত নিঃশব্দেও আসেনা। তার ওপর—কেমন যেন শুকনো শুকনো ভাব। দেখলে মনে হয়—অসুস্থ। তা জিজ্ঞাসাও করে-

ছিলাম সে কথা।—কিন্তু না, তেমন কোন অসুখের কথা স্বীকার করলে না দাদু। যাইহোক,—টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফল মিষ্টি থেকে দাদুকে কিছু খেতে দিলাম। আর কি আশ্চর্য!—অন্যান্য দিনের মত কিন্তু কিন্তু ভাব নেই দাদুর,—প্রাপ্ত মাত্রেই গোগ্রাসে যেন গিলতে লাগল খাবারগুলো। আরও দুয়েকটা মিষ্টি দিলাম, তাতেও আপত্তি করল না। সব শেষ ক'রে জল চেয়ে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ ক'রে পুরো এক গ্লাস জল খেলে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ফলগুলো সে খেলোনা। বরঞ্চ শেষকালে সবিনয়ে বললে—ছার, যদি অনুমতি করেন,—ফলগুলো বাড়ীর জন্য লইয়া যাই,—পোলাপানগুলো খাইব…অনেককাল তো মুখ দেখে নাই এ-সবের, তাই…

কেন জানি বড় করুণ শোনালো ওর কথাগুলো। কি মনে হল, সমস্ত ফল মিষ্টিই একটা ঝাড়নে বেঁধে ওকে দিয়ে দিলাম,—যাও দাদু, এগুলো বাড়ীতে নিয়ে যাও,—ছেলেমেয়েদের খেতে দিও—

কি আশ্চর্য!—এমন যে সব উজাড় করে ওকে দিলাম,—একটা কিছুও নিজের জন্য রাখলাম না,—তাতেও ও আপত্তি করল না। দিব্যি হাত পেতে নিল থলিটা। আর কি আশ্চর্য! সদা সর্বদা অমন লোক হাসানো টমটম দাদু বালকের মত হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল হঠাৎ,—বিশ্বাস করেন ছার,—দু'বেলা প্যাট ভইরা খাইতে দিতে পারি না পোলাপানদের,—কোত্থনে দিমু কন? ক'টাকা মাইনা পাই?—এতগুলি প্যাট,—কোন্ দিক সামলাই? মিছা কইব না ছার, আজ সারা দিনে প্যাটে পড়ে নাই কিছু,—আপনার এ দান—ছেলে মাইয়াগুলোর মুখে তুইলা দিয়া যে আজ কি আনন্দ পাইব—তা এক ভগবানই জানেন…মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করুন ছার,—আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন…চোখের জলে বুক ভাসিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল টমটম দাদু।

অবাক বিস্ময়ে—ওর অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে চেয়ে ভাবলাম, সত্যিই বিশ্বকর্মা, তুমি খুব বড় কারিগর!—এত অভাবের মাঝখানেও

এত প্রাণপ্রাচুর্য্য তুমি ফোটাতে পার!—এত জলভরা চোখেও তুমি এমন হাসির ঝিলিক খেলাতে পার। সত্যিই, অমন হাস্যরসিককে তুমি এমন ভাবে কাঁদাতে পার। সত্যিই বিশ্বকর্মা, তুমি অনন্ত শিল্পী,—তোমাকে নমস্কার···

স্থানটা জেল। মুখ্যতঃ অপরাধীদেরই আস্তানা। এমন স্থানে তাই সাধু সন্ত খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বরঞ্চ পাপ-পঙ্কে পঙ্কোজ হয়ে কেউ যদি ফুটে ওঠে কোথাও,—ঘটেও যদি তেমন অঘটন,—বড় জোর ঘেঁটুফুলের মতন ফুল একটা ব'লে ভাবতে বসবে লোকে। পঙ্কজের প্রতিষ্ঠা তো কদাচও নয়,—'নৈব নৈব চ'। তা এমন স্থানে —সেই যাকে বলে—দুর্নীতি,—তাই-ই প্রায়শঃ নীতি। ভ্রষ্টাচারই আচার।···

তা ও-কয়েদীরাই যে সব করছে এমন, পাপীরাই পুণ্যস্থানকে পঙ্কিল ক'রে তুলছে,—তা কিন্তু নয়। অপরাধীরা তো আছেই,—থাকবেই,—কিন্তু অপকর্মকারীদের ও-বাহিণীতে সামিল হয়েছেন তাঁরাও যাঁরা দুর্বৃত্তদমনের জন্যই দরবার আলো ক'রে বসেছেন। সেই যাকে বলে রক্ষকই যেন ভক্ষক বনেছেন। আর এই মণিকাঞ্চন যোগেই চিত্রটা বোধকরি এত চমৎকার হয়ে উঠেছে।···

ওপর ওপর ব্যবস্থাদি অবশ্য ঠিকই আছে। রাজ্যজোড়া প্রশাসন ব্যবস্থা আছে, জবরদস্ত দপ্তর আছে, জেলমন্ত্রী আছেন, মোটা অঙ্কের অর্থও বরাদ্দ আছে, নিয়ম কানুন, জেলকোড্,—সবই ঠিক আছে। কিন্তু?—ওই কিন্তুতেই তাবৎ কিছু থেকেও কার্যতঃ কিছুই নেই শেষ পর্যন্ত। আর কি ক'রেই বা থাকবে? একই আস্তানায় তাবৎই সকলে যদি আখের গোছাতে বসেন,—তাহ'লে আর জঞ্জাল সাফ্ করবেন কোন্ মহাজন? সে অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছে,—হাত সাফাইয়ের খেলই জমজমাট হয়েছে চতুর্দিকে।···

আর তা হবেই বা না কেন? চেইন মতনই তো ব্যাপারটা।

একটা গিঁট টানে তো আর একটা গিঁটেও টান পড়ে, টনটনিয়ে ওঠে গোটা শেকলটাই। আর ওই শেকলের গাঁটের যেমন বস্তুতঃ ঠিক ওপর নীচু নেই, একদিক থেকে যে উঁচু, ভিন্ন দিক থেকে—সেইই আবার নীচু,—এ-ও ঠিক তাই। পদে হয়তো বড় সাহেব, বেতন বিত্ত, ঠমক ঠামক,—সবই উঁচুস্তরের, দণ্ড মুণ্ডের কর্তাও বটে সকলের, —হাঁক ডাক শুনলে তো পিলেই চমকে যায়,—কিন্তু কি আশ্চর্য! ওই এক জায়গায় কিন্তু তিনি বালুস্তূপের বালুকণা,—সকলের একজন —সমান জন। কপিটা এঁচোড়টা, মাছটা মাংসটা, বোতল বোতল দুধটা,—সবই গুটি গুটি চালান হয়ে যাচ্ছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, চা কফি,—তাও। সবই যাচ্ছে, সাহেবের ঘরে। দেদার যাচ্ছে।···

কথায় কথায় মোড়ল মশাই-ই বললেন কথাটা একদিন। কথাচ্ছলেই বললেন। আর বললেন, তবে স্যার, আমাদের সাহেবের নজরটা কিন্তু নীচু নয়, ও ছাই পাঁশ যা মিলবে,—তাই-ই যে দুহাত ভরে নেবেন, তা নয়। হ্যাঁ, সে দেখতে হয় বেটা ডেপুটিকে,— একের নম্বর হ্যাংলা, বন্ বন্ ক'রে চোখের গোলা ঘুরছে অহর্নিশ, আর জল সরছে মুখে,—যা কিছু পাচ্ছে সামনে—সমানে সেঁটে দিচ্ছে,—কচুগাছ থেকে কুচো কাৎলামাছ,—কিচ্ছুটি বাদ-বিচার নেই। সেই যে কথা আছে না স্যার—পরের পাই তো···এও তাই···

মোড়ল মশাই নিজেও কিছু ফ্যালনা লোক নন এ জেলে। কি একটা ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ,—মানে কিছু মালপত্তর সামলাবারই দায়িত্ব ওঁর। তা শুনি—ভালই সব সামলাচ্ছেন তিনি। যা কিছুই চাওয়া যায় ওঁর কাছে,—না, নেই, কিছুই নেই।···আর কি করেই বা থাকবে? নতুন ক'রে কেনাকাটা হচ্ছে কি কিছু? তবেই হয়েছে? কি বলব স্যার,—যা-ই বলি,—বাঁধা উত্তর কর্তাদের হচ্ছে, হচ্ছে,—তাড়া কিসের এত? তা ওই তাড়া কিসের বলতে বলতেই তাড়া তাড়া সব লিষ্টি বেমালুম লোপাট হয়ে যাচ্ছে ফাইল

থেকে। অথচ—এদিকে দেখুন—আমাকে দু'দণ্ডও থির হয়ে বসতে দাঁড়াতে দিচ্ছে কি কেউ। রাতদিন—এটা দাও, ওটা দাও, রাজত্ব দাও, রাজকন্যে দাও,—উঃ। একেবারে জ্বালিয়ে দিলে স্যার…

তা এ তো গেল মোড়ল মশাইয়ের জবানবন্দী। ও দিকে কর্তা ব্যক্তিদের কথাবার্তাই ভিন্ন ধরণের…ও মোড়ল মশাইয়ের কথা আর বলবেন না স্যার, বেটা একেবারে বাস্তু ঘুঘু,—যতই দিন,—একই হাল,—নেই, কিচ্ছুটি নেই। সবই নাকি কয়েদীরা ছিঁড়েছুটে নষ্ট ক'রে দেয়! আর সাপ্লায়াররাও নাকি তেমনি সব হাড়বজ্জাত বদমাস,—এমন সব মাল ছাড়ে যে দুদিন যেতে না যেতেই সব উলুলিধুলুলি। আসলে—রাম চোট্টা ওই মোড়লই স্বয়ং,—দুহাতে হাপসাচ্ছে সব…

তা ও-কত্তারাই যে কেবল বলেন অমন,—তা নয়। লাইফার রাজেন দাসও বলে অমনি কথা। মোড়লেরই সাকরেদ সে। সেও বলে,—বলবেন না স্যার, বলবেন না। মোড়ল শালা দিনে দুপুরে ডাকাতি করে। যা পাচ্ছে—তাই লুটছে। কোম্পানীর মাল বেচে খেয়ে শালা একেবারে ঢোল হয়ে উঠেছে। লবচবানি দেখেন না কেন শালার,—যেন রাজপুত্তুরটি। অথচ জানি তো সব কুষ্টিঠিকুজি, আছিও তো এনেকদিন এ জেলে, কত ধানে কত চাল,—বুঝি না তা তো নয়,—বেটার মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।…

তা দেখ,—ঠিক অমনি কথা আবার রাজেন দাস সম্বন্ধে বলে নতুন ওয়ার্ডের মেট তুহিন ঘোষও,—রাজেনটা স্যার, সেরা বদমাস, চুরি ক'রে ক'রে শালা একেবারে জেলটাকেই লাটে তুলে দিলে। অমন মানুষের মুখ দেখলেও দিনটা খারাপ যায়…

অর্থাৎ—যা বলছিলাম,—সেই চেইন বৃত্তান্ত। এক অর্থে উঁচু থেকে নীচু,—দুর্নীতির তরল ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে। অন্য অর্থে আবার—কেউ উঁচুও নয়, কেউ নীচুও নয়, সবাই ভ্রষ্টাচার শৃঙ্খলের পারম্পর্যের বন্ধনে বাঁধা ভিন্ন ভিন্ন গাঁট মাত্র। একের

গতিতে অন্যটি গতিশীল। অন্যটির গতিতে আবার অন্যান্যেরা চলমান।...

তবে এক দিক থেকে ওই উঁচু নীচুর বৃত্তান্তটা আবার তাৎপর্য-পূর্ণও বটে। উঁচুর ক্ষমতা বেশী, তাই সুযোগও বেশী। তাই শুরুটা হয় সেখান থেকেই। এই যেমন রেশন বাবু। কত চাল আটা চিনির—দেখ্‌ভাল্‌, বিলি ব্যবস্থার এক রকম একচ্ছত্র কর্তা তিনি। তা এক আধজন বা এক আধটা পরিবারের ব্যাপার নয়,—হাজার তিনেক বন্দীর হপ্তার বরাদ্দ। সে অবস্থায়, হাতে না হলেও—ভাতে মারতে পারেন তিনি সবাইকে। তা মারেনও তিনি অমন। তবে নেহাৎ চন্দ্র সূর্য এখনও উঠছে তো,—তায় পুণ্যের শরীরও তো ভদ্রলোকের,—তাই—আধা মারছেন। অর্থাৎ—মাথা পিছু বরাদ্দের অর্ধেকটা গোড়াতেই সরিয়ে রাখছেন। মানে—ব্ল্যাকে বেচছেন, দুহাতে কামাচ্ছেন। তবে এসব ব্যাপারে একা একার কর্ম নয়তো কিছু, তাই সঙ্গী সাথী নিতেই হয় দু'একজনকে, আর সেই কারণে মালকড়ির বখরাও কিছু দিতে হয় তাদের মুখ বন্ধ করতে। তা যেমনই হোক—সিংহভাগটা তবুও যে থাকে রেশন বাবুর সে তো নিছক ওই উঁচু পদের জন্যই। তাই ওই উঁচুর বৃত্তান্তটা থেকেই যায়—যেমন ভাবেই হোক। আর ওই উঁচু যখন গলতে থাকে—তখন সে তরল ধারা একেবারে তলানি পর্যন্ত না পৌঁছে আর থামেনা বড়।...গড় গড় ক'রে একটা মুখস্ত পাঠই যেন আওড়ে গেল রেশন বিভাগের মেট তারক মণ্ডল।

তবে ওই তলানির ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক তাল কষতে হয়। ক্ষমতা এমনিতে কম তো,—এক রকম নেই বললেই চলে,—তাই মাথা ঘামাতে হয়,—মাথা খাটাতে হয়,—ওরই মধ্যে কিছু মালকড়ি যোগাড় করবার জন্য। আর ক্ষমতা কম হলেই যে বুদ্ধি কিছু কম হবে—তা তো নয়। বরঞ্চ দেখে শুনে মনে হয়—ও তলদেশের মানুষগুলো সব এখানে এক একটি অতুলনীয় প্রতিভা। কি করে কি করতে হয়

—তা যেন সব মুখস্থ।···

হ্যাঁ, এমনিতে মাপের বাটি, পূর্ণবাটি দেওয়াই নিয়ম, মাথা পিছু বরাদ্দও তাই,—কিন্তু অমন কর্ম করতে গেলে তো আর নিজের হাতে থাকেনা কিছুই। তাছাড়া,—এমনিতেও তো অসম্ভব অমন পুণ্য-কর্ম,—কারণ শালা রেশন বাবু তো আদ্ধেক সাবড়ে রেখেছে শুরুতেই, অতএব?···অতএব, একটু মাথা ঘামাও বোকচন্দর,—বাটকারার ঘা লাগাও গোটাকতক,—দাও বাটিটার তলদেশটার কিঞ্চিৎ উর্ধগতি ক'রে,—ব্যস,—পূর্ণ বাটিকে পূর্ণবাটি,—অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম রক্ষে,—তবে ওই তোবড়ানো বাটিতে আর সত্যিই তো তেমন পরিমাণ অন্ন ধরতে পারে না,—তাই কিছু বেঁচে গেল অমনি ভাবে। তার ওপর আবার হাতের কেরামতি তো আছেই,—বাটি ভর্তি ভাতের ওপর হাত চালিয়ে কিছুটা হাফসে দাও। দেখতে ওপর ওপর কানায় কানায়-ই রইল, কিন্তু বেশ ক'গ্রাম মাল তো স্রেফ হাত চালিয়েই বেমালুম কমিয়ে দেওয়া গেল···হরে দরে তাই স্যার—ছিটেফোঁটা হলেও—কিছু জুটল বরাতে। মানে ওই বাড়তি অন্নটা বিক্রী ক'রে এ অভাগার অন্নবস্ত্রের কিছু সুরাহা হলো,—এই আর কি···

কেমন সহজ সরল স্বীকারোক্তি শোনো শ্রীমান শ্রীমন্ত সাধুখাঁর! বেটার কাজ কয়েদীদের ভাত তরকারী বিলি করা। লম্বা বাঁশের বাঁক্ মতন ক'রে বালতি বালতি ভাত ডাল তরকারি নিয়ে নিয়ে ও আর ওর এক সাকরেদ দেখি—রোজ রোজ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়,—আর অমনি ভাবে বরাদ্দ বিলোয় কারারুদ্ধদের। কথায় কথায়—একদিন ওই অবস্থাতেই বৃত্তান্তটা শোনালো শ্রীমন্ত। কিন্তু একাই শ্রীমন্ত কি এ ব্যাপারে? পাগল নাকি! অমন শ্রীমণ্ডিত এখানে প্রায় সকালেই। বালতি-ভর্ত্তি ডাল নামক বস্তুতে নজর চালিয়ে দেখেছি, হ্যাঁ, খোদাতাল্লা আর কত বড় কারিগর,—ও আবদুল্লা খুদ্ খোদার ওপরও খোদকারি করে ছেড়েছে। ডুবুরির বাপেরও সাধ্যি নেই যে ও-পাণি ছেঁচে পণ্য আবিষ্কার করবে।

তবে যেমনই হোক, অমন ডালও কাটছে,—হাতা হাতা নিচ্ছে কয়েদীরা। নিচ্ছে—তার সঙ্গে তরকারী নামক বিচিত্র এক হরে-করকম্বাও। তা কি আর করবে বেচারীরা? পেটটা তো ভরাতেই হবে কোনমতে। কিছু দিয়ে। তাই ওই-ই সই।…

তা তাবৎ খাদ্য-কথা যে এতেই সমাপ্ত—তা নয়। না, না,—কথার নটে গাছটি এখানে মুড়িয়েও মুড়োয় না। একদিন বেড়াতে বেড়াতে জেলের মূল বা সাধারণ 'চৌকা' বা সার্বজনীন রন্ধনশালায় গিয়েছিলাম। উঃ! এলাহি কাণ্ডকারখানা একেবারে। কি প্রশস্ত জায়গা! কি বড় বড় জ্বলন্ত উনুন! আর তার ওপরে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব হাঁড়ি কড়াই!—আর কত লোকই না নিযুক্ত সেখানে ওই রন্ধন কার্যে!—ঘর্মাক্ত কলেবরে!—আর ওরই মধ্যে সব চাইতে বেশী নজর কাড়া দৃশ্যটা আবার রুটি বানানোর ব্যাপারটা। বিরাটাকার তাল তাল সব মাখা আটা একপাশে,—আর ওই তাল থেকে তিল তিল টুকরো নিয়ে তালে তালে বেলুন চালিয়ে রুটি গড়ছে ডজনখানেক লোক। আর তারপর ওই রুটিগুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে—এক বিচিত্র ধরণের উঁচু ঢিবি মতন জায়গায়। আসলে এক ধরণের উনুনই জায়গাটা,—নইলে অমন পাকাপোক্ত কড়কাড় রুটি আঁকশি মতন এক বস্তু দিয়ে টেনে টেনে নামাচ্ছে কি ক'রে কয়েকজন লোক?

যাই হোক,—ও-সব বস্তুর জন্য অবশ্য ব্যস্ততা নেই আমার।—আসল বৃত্তান্তটাও তা নয়। আসলে ওই রুটির আকার ও ঘনত্ব নিয়েই আমার বক্তব্য। সত্যিই, কারিগর বটে লোকগুলো! কারিগর কি,—আসলে অসাধারণ শিল্পিই সব এক একজন! নইলে—অমন পাতলা পাতলা আর বড় বাতাসা সাইজের রুটি বানানো কি চারটিখানেক কথা? আর অমন শিল্পকর্মের আসল মাহাত্ম্যটাও বোঝ। মাথা পিছু বরাদ্দটা তো গুনতিতে ঠিকই রইল,—তবে হাতের গুণে কিঞ্চিৎ গুণগার গেল তাবৎ জেলবাসীর, এই যা। আর

তাতে বিস্ময়েরই বা কি আছে?—শিল্পীর নজরানা তো নিতেই হবে শিল্পীকে।—না কি বল?

তবে এসব বৃত্তান্ত অবশ্য ওই নন্‌পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বেলাতেই। রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে—উঁহুঁ,—ওসব চালাকির চল নেই বড়। আর ও-কমন চৌকার চৌহদ্দিও তো বড় মাড়ান না তাঁরা। তাঁদের সব স্ব স্ব চৌকা,—স্ব স্ব রেশান,—জেলগেট থেকেই নিজ নিজ হিস্যা বুঝে নিয়ে যান তাঁরা। সকাল সকাল এসে,—যেখানে যেটি মেলে,—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাল ক'রে দেখে শুনে—ভলান্‌টিয়ারের মাথায় চাপিয়ে—নিজ নিজ ফাইলে সব বয়ে নিয়ে আসেন আগেভাগে। আর এ-সব ব্যাপারে পান থেকে চুনটি খসবারও যো নেই বড়। তা হলেই তুলকালাম কাণ্ড,—কর্তৃপক্ষের কালঘাম ছুটিয়ে ছাড়বেন সবাই। জেল-কর্তারাও তাই সচরাচর সতর্ক থাকেন এঁদের সম্বন্ধে। এমন কি—সরকার প্রদত্ত গ্রুপ্‌ অনুরায়ী—যা যা ঠিক পাবার কথা নয়,—তা-ও অনায়াসে ওঁদের নিয়মিত দিয়ে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। মানে—সেই 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট' আর কি!—ওঁরা শান্ত, সন্তুষ্ট থাকলে আর জেলে স্বস্তিটা নষ্ট করতে সাহস পাবে কোন্ নরাধম্!—লম্বা লম্বা লগুড় আছে না হাতে! সেল্ নামক সোনার নীড় আছে না দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে!—অতএব,—ও-ভেজাল বাঁধানেওয়ালাদের সঙ্গেই কেবল ভাব জমাও,—যতটা পার,—বাকী সর্বত্র দু'হাতে লোটো,—যে যেমন পার।…

তবে ক্রিমিনাল অধ্যুষিত এলাকারই কর্তা ব্যক্তি তো সব,—তাই ও-পলিটিক্যাল পারসন্‌দের অবস্থাও গোনে বেগোনে পয়মল ক'রে দিতে পারেন ওঁরা।…মাছ পাবেন?—ঠিক আছে,—এই নিন মাছ। কি বলছেন?—পচা? গন্ধ ছাড়ছে?—কি আশ্চর্য!—এমন মাছ দিলেই বা কে? আর নিলেই বা কোন ইডিয়েট?—নাঃ, যেদিকটায় নিজে না দেখব,—সেদিকেই সব একটা না একটা

কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে!—নাঃ,—আর পারা যায় না এমন মানুষদের নিয়ে!—যাকগে দাদা,—আজ তো আর উপায় নেই কিছু,—ওতেই পেঁয়াজ টেঁয়াজ দিয়ে চালিয়ে নিন কোনমতে।—আর না হয় নিরামিশ আহারই করুন না আজ ,ক্ষেমা ঘেন্না করে?—করে তো লোকে আকছার,—বিশেষ ক'রে আজকের দিনে।—কাল না হয় ভাল মাছের ব্যবস্থা দেখব।···নাঃ, এবার আপনি খামাখাই রাগ করছেন সুনীলবাবু! আরে মশাই,—গোটা পাঁঠাটাই তো আসছে বাইরে থেকে,—ছাল চামড়াটাই যা ছাড়ানো,—তা তার মাংস যদি সেদ্ধ না হয়,—রবার রবার মালুম হয়, কিংবা অন্য কোন জীবের মাংসের মতই ঠেকে,—তা আমি তার কি করতে পারি—বলুন? আমি তো আর মশাই—ও-পাঁঠার গন্ডো সেঁধুতে পারিনে!···

অর্থাৎ এখানেও সেই একাধারে আত্মরক্ষেও, নিয়মরক্ষেও। পাবে সবই, নিয়ম মাফিকই পাবে,—তবে মাছটা মুখে তুলতে পারবে না,—ডিমটাও পচা বেরুবে,—মাংসটাও কোন জীবেরই বটে,—তবে···দোহাই আপনাদের,—প্রাণী বিশেষের প্রতি অমন অহর্নিশি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না।···আর অপরাধ নেবেন না,—দিনকাল কেমন পড়েছে—তা দেখছেনই তো,—মশাই, পাবেন পাঁউরুটির গায়ে ফ্যাঙ্গাস. চায়ের মধ্যে কাঠের গুড়ো, দুধে আধা আধি পাণি,—তা দুধটাও তো স্যার বলতে গেলে পানীয়ই,—আর ও-আনাজপত্তরগুলো যে মাঝে মধ্যে কীটদষ্ট হচ্ছে, পচাটচাও থাকছে,—তা-ওর জন্যেও গোঁসা কববেন না স্যার,—শান্তিপুরের গোঁসাইদের নিয়ে তো আর ঘর করিনে,—কারবার তো করতে হয় যত জোচ্চোর বদমাস্ ঠিকেদারদের নিয়ে। তা যেমন যেমন সাপ্লাই পাব, তেমনিই তো দেব স্যার,—না কি বলুন?···

তা ও-সাপ্লাই বৃত্তান্তটা এখানে সত্যিই বেশ বিচিত্র। আর এ ব্যাপারে সেই শাশ্বতবাণীই সার এ তল্লাটে,—'যত মত তত পথ'।···

পঙ্কজবাবুর কর্ম,—কয়েদীদের প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড়, বিছানাপত্তর, থালা বাসন যোগানো। অর্থাৎ—কিছু দ্রব্য সাপ্লাই করা, অবশ্য জেলের নিয়মকানুন অনুযায়ীই। তা করেনও ভদ্রলোক সাপ্লাই,—'যাহা চাই, তাহাই নাই'। আর নিদেন যেখানে না দিলেই নয় কিছু, বেয়াড়া বেসরম আদমীও তো থাকে কেউ কেউ, তা তাদের তো আর ঝাড়া হাত পায়ে ফেরানো যায় না একেবারে,—তাই দিতেই হয় কিছু,—তবে খোদ পঙ্কজবাবু বলে তো কথা,—একটু আধটু প্যাঁচ তাই থাকেই। তোয়ালের বদলে গামছা বেরোয়, প্যান্ট থাকে তো জামা থাকে না, বালিশ মেলে তো ওয়াড়ের পাত্তা পাওয়া যায় না,—থালা যদিও বা আছে, তো গেলাস বাটিতে লাঠালাঠি।...

আবার ওদিকে মিশির মশাইয়েরও কারবার ওই সাপ্লাই নিয়ে। অর্ডার মাফিক মাল জেলের টাকায় বাইরে থেকে কিনে কেটে এনে প্রিজ্‌নারদের ডেরায় পৌঁছে দেওয়াই ওঁর কাজ। অর্থাৎ সেই সাপ্লাইয়েরই কাজ,—হানড্রেণ্ট পার্সেণ্ট। তবে এর কায়দাটা আলাদা। দোরে দোরে ঘোরাঘুরি ঠিকই আছে,—ভাল ক'রে লিখেটিখেও নেন—কার কি চাই না চাই,—পৌঁছে দেবার দিনক্ষণও বেশ কাছাকাছিই বলেন,—মুখটাও বেশ হাসিখুসী, আচরণেও খুব ভদ্র। তবে ওই ভদ্র মানুষ তো,—তাই সর্বদাই কেমন কিন্তু কিন্তু ভাব।—সলজ্জ ভঙ্গীমা, হ্যাঁ, কালে ভদ্রে দেখা সাক্ষাৎ হলো, দুটো চারটে লেন দেনের কথাবার্তা হলো,- সেই-ই তো ভাল। তাই বলে—থেকে থেকে কোন ভদ্রলোককে বিরক্ত করা কি ঠিক?... তা মিশির মশাই প্রায়শঃই তাই প্রথম সাক্ষাতের পর দ্বিতীয় সাক্ষাতের আর সুযোগ নেন না বড়। কিন্তু প্রিজনারদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিই তো মিশির মশাই,—তাই তাঁরাই হন্নে হয়ে ঘোরেন ওঁর পিছু পিছু। তা বড়ই ভদ্রমানুষ তো মিশির মশাই,—প্রিজনারদের আক্কেল না থাকলে কি হবে,—উনি

কিন্তু পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ঠিক গা ঢাকা দিয়ে ফেরেন। তবে সাপ্লায়েরই কাজ কারবার তো,—তাই যেদিনই হোক, যখনই হোক, দেবেনই ঠিক যার যার বস্তু যুগিয়ে। তা দামে হয়তো বস্তুগুলো দুনো,—কখনও বা চারগুণো; গুণেও হয়তো যারপর নাই নিকৃষ্ট। তা তার আর কি করতে পারেন মিশির সাহেব!··· সারা দেশটাই তো গলাকাটায় ভর্তি স্যার! সৎ মানুষ আর এক আধজনও কি আছে ছাই কোন ভিতে?···

তবে এসব নামী দামী সাপ্লায়াররাই যে তাবৎ কারবারী এ চৌহদ্দিতে, তা নয়। এখানে দরকার মত সব কিছুরই সাপ্লাই মেলে। এমনিতে হয়তো দুধ পায় না একজন,—পাবার কথাও নয় তার,—কিন্তু সেও পাবে,—বোতল বোতল পাবে। তবে তার জন্য টু পাইস ছাড়তে হবে। আর সেক্ষেত্রে নিয়মকানুনও সব সনাতনই,—যত বেশী চিনি ছাড়বে, ততই মিষ্টি হবে। দু' পয়সা বেশী খসাও,—খাসা খাঁটি দুধ। আর ওদিকে টানাটানি করেছ তো দুধে জলে দেদার জানাজানি হয়ে যাবে। মোটের ওপর আসল বস্তু সেই—'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'—মুদ্রারূপী ব্রহ্ম। মুদ্রা ব্রহ্মকে বাগাও, যথাস্থানে কাজে লাগাও, দেখবে—এখানেও সব পাবে। মাছ পাবে, মাংস পাবে, ভাত, রুটি,—মায় এক খুরি খাসা মিষ্টি দই,—তা-ও পাবে;—চা পাতি, চিনি,—সব কিছুই পাবে এখানে। আর তা-ও নিজেকে কষ্ট করে বস্তুর কাছে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না! ও-তাবৎ বস্তু সরাসরি নিজেই এসে করতলগত হবেন। এমন কি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিষিদ্ধ বস্তুরও বাদবিচার থাকবে না তখন। তবে ওই যা বলেছি,—যেমন পুজো তেমনি দক্ষিণে। বড়র দিকে হাত বাড়ালে বাড়তি ব্যয় তো অনিবার্যই।

তা এসব অবশ্য ছুটকো ছাটকা সাপ্লাইয়ের কাহিনী। আসল বৃত্তান্ত তো বলাই হয়নি এখনও। আসল কারবারী তো এঁরা

নন।—এরা তো সেই যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজেন। আসলে ওই মান্না এণ্ড কোম্পানী, চৌধুরী এণ্ড সন্স প্রভৃতিরাই তো রিয়েল সাপ্লায়ার। জেলগেটের অভ্যন্তরে যাবতীয় যা কিছু সেঁধোচ্ছে,—সরকারী দুধটুকু ছাড়া,—বাকী তো সব ওঁদেরই অবদান। আর এ-জাতীয় অবদান কিছু আত্মত্যাগের জমিতে জন্মায়ও না তেমন। তাই ও-প্রথম পদক্ষেপেই—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' নামক পুণ্য কর্মটি চলছে। আর তাতে তেমন 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' মতন ভাবও দেখায় না কেউ বরঞ্চ সোজা কথাটা বেশ সরল ভাষাতেই বলে।

এই যেমন মান্না মশাই-ই বলছিলেন সেদিন…কি বলব স্যার,—সরকারের কোন বিচার বিবেচনা নেই!—কবে সেই মান্ধাতার আমলে—পাঁচ টাকা মাছ, আট টাকা মাংস,—এই সব স্থির হয়েছিল,—ব্যস, আজও তাই-ই চলছে। অথচ জানেন তো স্যার,—আজকাল কিরকম বাজার! ওদিকে হু হু ক'রে আগুন লেগে যাচ্ছে তাবৎ বস্তুতে,—আর এদিকে সরকারের সেই সাবেকী কথা, এক চুলও নড় চড় হবার যো নেই,—সেই যে কথা আছে না—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! অথচ আমাদের দিকটাও ভাবুন স্যার,—বাপ পিতামহের দু' পয়সা নেড়ে চেড়ে নিজেরাও তো খেয়ে পরে একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াব স্যার,—না কি? তাই স্যার,—সাপও মরছে,—লাঠিও ভাঙছে না। তাছাড়া, তার ওপর উপরি ছ্যাপাও আছে তো স্যার এ ব্যাপারে?—আর তা থাকবেই বা না কেন?—জেল জায়গাটাই তো যাচ্ছেতাই,—না কি বলেন? তা মরুক গে সে সব।—কিন্তু স্যার, টপ্ জি থেকে শুরু ক'রে সারা পথ যদি কিছু দিতে দিতেই ঢুকতে হয় জেলে,—তাহলে ওই সঙ্গে গোড়া থেকেই যদি কিছু নিতে নিতে না এগোই—তাহলে তো ভিটে মাটি একেবারে চাঁটি হয়ে যাবে স্যার। তা তেমন বিভ্ভুল মুনিঋষি ক'রে তো আর সত্যিই জন্ম দেন নি পিতামাতারা!…

তবে ও-সাপ্লাই বস্তুটা তো কেবল উদরস্থলেই সীমাবদ্ধ নয়,… তাই ওর রকম বেরকমের কাহিনী শুনি প্রতিদিনই,—যত্র তত্র,—তামাম জেলখানা জুড়েই। এমনকি অমন যে স্থান হাসপাতাল,—আর্তের সেবাস্থল,—তা সেখানেও শুনি ওই কারবার। হাসপাতাল ঠিকই আছে, বড়সড়ই আকারে, বেড-টেডও থাকবার কথা অনেক, ছিলও নাকি একদিন,—কিন্তু আজ? কিছু কিছু খাট গুটিয়ে গুদোমজাত করা এখানে সেখানে,—অনেক খাট আবার বেমালুম হাওয়া হয়ে ভাগ্যবানদের শয্যা পেতেছে অন্যত্র, জেলের ভেতরে, দরকার মতন জেলের বাইরেও। কিন্তু যারা নেই তাদের কথা থাক। যারা এখনও আছে—তাদের কথাই বেশী ক'রে বলি। বেডে বেডে রোগী আছে,—বাড়তি রোগীও আছে কয়েকজন,—এদিক ওদিক ছিটকে ছড়িয়ে। রোগও তাদের সব নানান রকম। কিন্তু তারপর? চিকিৎসাপত্তর? আহার্যের আয়োজন?—হায় ভগবান!—

অথচ—দেখো, ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন,—প্রয়োজনীয় সংখ্যকই আছেন। ওষুধ পত্তরও আসে, প্রচুর পরিমাণই আসে, রাশি রাশি ইঞ্জেকসানও আসে অবিরত, মাংস, ডিম, মাছ, দুধ, দই কলা, মাখন প্রভৃতিরও ঢালাও ব্যবস্থা। অর্থাৎ—নিয়মমাফিক সবই আসে, থাকে, খাতায় কলমে নির্ভুল হিসেব লেখা হয়,—সরকারের অর্থবরাদ্দেও মোটা অঙ্কের টাকা পাশও হয় প্রতি বছর।…কিন্তু ব্যস, ও-বৃত্তান্ত স্রেফ ওই পর্যন্তই স্যার। তার পরের খেল্—বলব না বলব না—করেও স্যার,—পেট থেকে ঠেল মেরে ঊর্ধে উঠে আসে। কি বলব স্যার,—হাসপাতাল তো নয়—যেন কামধেনুই একটা বড় সড়। যে পারছে—দু' হাতে বাঁট টেনে বালতি বালতি সরাচ্ছে। কিছু নিজেরাই সাঁটছে,—কিছু আবার বাজারেও ছাড়ছে। কত পয়সা যে ওই ভাবে লুটছে—তার আর লেখাজোখা নেই।…

তার ওপর—হালফিল আবার বাড়তি মক্কেল জুটেছে—ওই বেটা ছাপোষারা। এমনিতেও তো এটা সেটা দিচ্ছে থেকে থেকে,—তার ওপর একটা জবর কোন ব্যামোর কথা কড়া ক'রে লিখে—পি, জি, টি, জি,—কোন বাইরের হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন তো—ব্যস,—আর পায় কে! নোটের তাড়া গুনতে গুনতেই তখন আঙুলে ব্যথা ধরে যাবে।...কিন্তু দেখবেন স্যার,—এসব কথা যেন ফাঁস ক'রে দেবেন না কোথাও,—এ অধম কিন্তু বেঘোরে মারা পড়বে তাহলে স্যার...দশ বছরের মেয়াদী ফটিকচন্দ্র দাস কম্পাউণ্ডারের কর্মরত অবস্থায় একদা কথাগুলো বলেছিল আমাকে। তবে মাত্র ওই একদিনই। আর নয়।

কিন্তু ও আর না বললে কি হবে? বলবার কি লোকের অভাব আছে কোথাও? বিশেষ যখন নিন্দে মন্দরই কথা? তবে এখানেও সেই ইতর বিশেষ বৃত্তান্ত। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দৃশ্যটা ভিন্ন ধরণের। প্রায় সবাই তখন কেমন মোটামুটি কর্তব্যরত, ন্যায়নিষ্ঠ,—আর্ত-সেবাপরায়ণ!—আর নেতা-টেতা কেউ এলে তো আর কথাই নেই। অহর্নিশি কর্তব্যকর্মের ভার বইতে বইতে তখন সবাই কেমন নেতিয়ে পড়েন। এমনকি ও-হাসপাতাল অঙ্গনে অঙ্গ না ছড়ালেও,—ডাক্তারবাবুরা অক্লেশে খচ্‌খচ্‌ ক'রে স্পেশাল ডায়েট লিখে দেন। বাড়তি ডিম, মাখন, দই, কলা প্রভৃতি মেলে তাতে নিয়মিত।...ওরই মধ্যে আবার হাঁকডাকটা যাঁর বেশী, মারদাঙ্গা গোছের মেজাজ,—তাঁর তো আর কথাই নেই। সেখানে তো সেই মেঘ না চাইতেই পানি। বিনা বাক্যব্যয়েই দেদার সামগ্রীর আমদানি...

অবশ্য এযাবৎ যা কিছু বলা হলো—তা সব মোটামুটি স্থূল বস্তুকে কেন্দ্র ক'রেই।—তবে ওই-ই যে তাবৎ কথা এ কাহিনীর,—তা কিন্তু নয়। ও সূক্ষ্ম জিনিষকে ঘিরেও অনেক ঘোর প্যাঁচ আছে এখানে। এই ধর যেমন—মুক্তি,—রিলিজ জাতীয়

ব্যাপারটা। অর্ডার এসেছে ঠিক সময়েই,—যথারীতি ছাপানো রিলিজ অর্ডার,—যথাবিধি সরকারী শিলমোহর টোহরও ঠিক ঠিক লাগানো,—কিন্তু কোন কত্তারই তিলেকের জন্যও মাথা ব্যথা নেই তাতে। এসেছে,—ঠিক আছে,—আসেই তো অমন হর রোজ কাড়ি কাড়ি অর্ডার। এত বড় জেল,—ঢুকবেও যেমন রোজ রোজ কিছু কিছু মাল,—বেরোবেও তো তেমনি কেউ না কেউ। তা তার জন্য কি হা-পিত্যেশ ক'রে এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? পাগল নাকি? আরে মশাই,—হর লোকের তো দিন দিন,—এ শর্মাদের তো তিন শ পয়ষট্টি দিন! অমন হড়বড় তড়বড় করতে গেলে কি চলে? আরে বাবা,—এতো দিন দিব্যি কাটালি,—আর একটা কি দুটো দিনেই কি অমন দড়ি-ছেঁড়া এঁড়ে গরু হলে কি পারা যায়? বলে—খালাস বলে কথা,—এ খাতা দেখো, সে খাতা দেখো, এটা লেখো, সেটা লেখো,—চারটি খানেক ব্যাপার তো নয়। তাই কিছু বিলম্ব তো হতেই পারে বাপ।... ঘাবড়াবার কি আছে তাতে?..

তবে কত্তারা অমন করলে কি হবে,—রাইটার্স'রা আছে তো? আর ও-কাগজপত্তর খোলাখুলির ব্যাপারটাও তো সামলায় ওরা। তা ওই রাইটার্স'রাও সব কনভিক্ট,—মেয়াদী কয়েদী, কয়েদীদের প্রতি ওদের সহানুভূতিও সেই কারণে স্বাভাবিক। তাই তারাই যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেয় বার্তাটা,—কাদের ভাই, জোর খবর আছে একটা, কিন্তু তার জন্য কি ছাড়বে বল আগে?...অর্থাৎ শুরুতেই যেমনিভাবেই হোক শুরু হয়ে গেল খেলাটা। তারপর— ওই কিছু ছাড়তে ছাড়তে যাও তো ছাড়া পেয়ে গেলে তক্ষুণি। নিদেন সেই ঢোকবার সময়ে যা কিছু জমা রেখেছিলে জেল গেটে —তার পাই পয়সার প্রাপ্তি সংবাদ লিখে দাও কিছু না পেয়েও, হ্যাঁ, হবে, তাতেও হবে। আর এমনিতে তাতে ঝুটঝামেলাও অনেক কম, অনেকটা যেন সেই গায়ে গায়েই শোধ—তাছাড়া কত্তাদেরও

আর হাত পেতে বাড়তি ক্লেশটা করতে হয়না তাতে কিছু।…

তা একদিক থেকে এমন কিছু অতুলনীয় অন্যায় কর্ম কর্তারা যে করেন এ-ব্যাপারে—তাই বা বলি কি ক'রে। সরল নিরপরাধ মানুষকে হঠাৎ কিড্‌ন্যাপ ক'রে মানুষেই তো তার মুক্তিপণ দাবী করে—শুনি। টাকার অঙ্কও তো সেখানে শুনি অনেক সময় আকাশ-ছোঁয়াই। তা সেক্ষেত্রে কৃত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের জন্য এ জেলের মধ্যে রিলিজ কালে কিছু চাওয়াটা আর এমন কি জঘন্য দুষ্কর্ম সে তুলনায়? আর টাকার অঙ্কটাও তো দেখো যৎসামান্যই এ সব স্থানে। অনেক সময় তো আবার ও-টাকা জাতীয় ব্যাপারই নয় আদপে,—স্রেফ্ সিকি আধুলিতেই সন্তুষ্ট দেবতারা।…

কিন্তু—এ প্রসঙ্গে যা চরম,—পরমও,—তা তো বলিইনি কিছু এখনও। সে কাহিনী শোনবার পরে তো এসব নেহাৎ জোলো জোলোই বোধ হবে।…

জেলে একটা আমদানী ঘর ব'লে ঘর আছে। ঘর মানে—আয়তনে বেশ বড় সড় একটা হলঘর মতনই জায়গা। সাকুল্যে সে শতাধিক লোকের বসা শোওয়া চলে অনায়াসেই। তা ওই আমদানী ঘরকে কেন্দ্র ক'রেই এবারকার কাহিনী। সেই চরম ও পরম বৃত্তান্ত।—কিন্তু তার পূর্বে ওই আমদানী ঘর সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অর্থগত অধ্যায় রচনা বোধ করি প্রয়োজন। নইলে গোড়াতেই একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে—অহেতুক।

জেল জায়গাটাই এমন যে এখানে ও-আসা যাওয়ার স্রোতটা প্রায় সমান্তরাল। জোয়ার ভাঁটার টানাপোড়েন যে ঘটেনা কখনও—তা নয়। তবে মোটামুটি ওই আসন্তি যাউন্তিদের তুল্য মূল্য অবস্থাই। তা অবস্থাটা ওদিক থেকে যেমনই হোক,—আর একদিক থেকে কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান। যাউন্তিদের যেমনই হোক,—আসন্তিদের আবির্ভাব কাল কিন্তু প্রায়শই সেই সায়ং সন্ধ্যা।…

ফাইলে ফাইলে শেষ লক্ আপ্ যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, কয়েদীরা সব যে যার আস্তানায় রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে, গুন্‌তি টুনতি শেষ হয়েছে,—তখন লম্বা কালো মার্কামারা পুলিশভ্যানে ক'রে নবাগতেরা সব জেলগেটে এসে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ অফিস-ঘরের সামনের দিকে তাদের বসিয়ে দাঁড় করিয়ে—প্রয়োজনীয় লেখা জোঁকা চলে। ব্যস, তারপরেই সারি বেঁধে সেধোও বাছাধনেরা সব জেলের গর্ভে,—একে একে।···

তা সেধোলে তো জেলের ভেতরে,—কিন্তু ঠাঁই পাবে কোথায় এখন? এত রাত্তিরে? আর ফাইল টাইলই বা নির্দিষ্ট করবে কে এমন বেয়াড়া সময়ে? কাল বেলা নটা দশটার আগে তো সুপার সাহেব আসবেন না? কেস্ টেবিলে তোমাদের কুলপঞ্জিকা তো পৌঁছোবে না?—আর ও-সব না হলে তো নির্দিষ্ট ঘরদোর মিলবে না কিছু?—অতএব?—কালকের কথা কালকের জন্যই মুলতুবি রাখো বাবা,—আজ রাতের মত ওই পাঁচমেশালী হলঘরটাতেই কোনমতে হাল্কা হও,—হাত পা ছড়িয়ে একটু জিরোও। তা নতুন আমদানীই তো তোমরা এ জেলে,—তাই তোমাদের ও-সর্বজনীন আস্তানার নামই—আমদানী ঘর।···

তা ও-আমদানী ঘরেই অনবদ্য সেই নাটকটা জমে প্রত্যহ। রজনী যখন একটু গভীরা হয়,—সারা জেলটা যখন নিস্তব্ধ,—কাক-পক্ষীতেও টের পায়না যখন কিছু,—তখনই খেল্‌টা শুরু হয়।···

প্রথমে দেহতল্লাসী,—সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ, কুৎসিৎ অঙ্গ-ভঙ্গী। তা তাতে যা হাতে এলো,—এলো। সেটা তো কেবল সেই বাড়তি দক্ষিণা। কিন্তু তাতে আর কি এমন বলবার মত বস্তু মিলবে?—একে তো,—নানা কিসিমের মানুষ সব, বিত্ত সামর্থ্যও অনেকের এমনিতেই কম,—তাছাড়া সরাসরি তো আর জেলে ঢোকেনি কেউ,—কয়েক ঘাটে জল খেতে খেতেই এসেছে এমন,—তাই হাতাতে হাতাতে হাতে আর কিছু রাখেনি বড় কেউ।—তার

ওপর জেল গেটে যাবতীয় ট্যাকের কড়ি কেড়ে নিয়ে টুকে রেখেছেন কর্তারা। এখন তাই সব এমনিতেই কপর্দক শূন্য।

কিন্তু সেই যে কথা আছে না—'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে',—ও-আমদানী ঘরের নায়কদের নজরে ঠিক পড়েই যায় সব। যত গুপ্ত-স্থানেই রাখ, মালকড়ি সব ঠিক কেড়ে নেবে হুদ্দাড় ক'রে। কিন্তু—ওই যে বলেছি,—তাতে আর কি এমন মিলবে? মেহনৎ পোষাবে কেন তাতে? তাছাড়া, সোজা আঙ্গুলে—কতটুকুই বা ঘি ওঠে?'—অতএব, শক্ত হও, কোমরের কঠিন বেল্টটা খুলে নিয়ে শক্ত হাতে চালাও,—এলোপাথাড়ি চালাও,—মায়া মমতার ধার ধেরো না,—দেখবে,—সুড় সুড় ক'রে বেরুচ্ছে সব,—অপ্রত্যাশিত অঙ্কেরই ভীড় জমছে জমার ঘরে। তাই ব'লে—সব হিসেবই কি অমন মিলছে সব সময়? পাগল না কি?—তা-ও কখনও হয়? খামাকাই রক্ত-পাত ঘটে বই কি অনেক সময়। তা তার আর কি করা যাবে বল? ছাই মাত্তরই তো উড়িয়ে দেখতে হবে,—কি জানি—অরূপরতন মিললেও তো মিলতে পারে কোথাও।—তাই।...

আর নিশ্চিত রতন তো আজকাল মিলছেই অহরহ। কাপোষারা আসছেন তো সব নিত্য নতুন। তা লাখোপতি, কোটিপতি মানুষ তো সব। সেই কথায় বলে—কাছা ঝাড়লেও—কত টাকা। তবে সেয়ানা মুনিষ্যিই তো সব,—সত্যি সত্যিই আর কাছায় বেঁধে আনেন না তো কেউ কিছু,—তাই যথাপদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়।...ঠিক আছে, সঙ্গে নেই তো নেই,—কিন্তু বাড়ীতে আছে তো? গুদোমেও গুদোমজাত তো দেদার মাল? হাত ঝাড়ো বাবা,—এই নাও—কাগজ কলম,—লেখো টাকা দেবার কথা, উঁহুহু, টাকার অঙ্কটা আরও অনেক মোটা কর চাঁদ, হাতটা একটু দরাজ কর,—একটু দিলদার হয়ে ওঠো বাবা,—নইলে আমার দিলের হদিশ তো পেয়েছই বাপ্,—হালুয়া চটকে দেব এক মুহূর্তে।...কি বলছ? বন্দী তো? তা বাপ্, বন্দী বলেই তো এমন বাগে পেয়েছি তোমায়,—নইলে তো

তোমার সে প্যালেসের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যে পায়ে প্যারালিসিস ধ'রে যেতো বাছাধন। তা—বাপ্, তুমি যেমন বন্দী,—আমিও তো তেমনি বন্দী! কিন্তু তাই ব'লে—এ জেলের সেপাই সান্ত্রীরা তো আর বন্দী নয়,—স্থান, পাত্র,—ঠিকঠাক লিখে দাও,—যথাকালে ওই মুক্ত পুরুষেরাই যাবে যথাস্থানে, আর গুণে গুণে টাকাগুলো নেবে। তারপর—ফুসমন্তরে ইধার কা মাল উধার,—স্রেফ হাত ঘুরেই কত্তাদের হাতে এসে যাবে সব মালকড়ি।—না, না,—তা ভেবো না, ও স্বয়ং ভগবানের বাচ্চাও টের পাবে না কিছু।···

কি বলছ?—আমার লাভ?—ওরে শালা,—পলিটিক্স্ মারছ?—ভেদ্ভাও—চালাচ্ছ?—তা তাতে কোন লাভ হবে না চাঁদ,—ও হাজার প্যান্প্যান্ কর,—এ শালা পান্নার পরাণে দয়া মায়া ব'লে কিচ্ছুটি দেন নি তোদের সে শালা ঈশ্বর,—না কি।—তাছাড়া নাদাপেটা লাখোপতি শালা,—এ পান্নাকে দেখে কি তোমার সেই ধাত্রী-পান্নাকে মনে পড়ছে চাঁদ—যে শালা স্রেফ পরার্থেই সব পরম কম্ম সারছি? নারে শালা,—নিজের হিস্সা টু দি পাই—না পেলে এ পান্না শম্মা হাই তুলেও উব্গার করে না কারো···

তা একটু আধটু বীররস বা দুয়েকটা চড় চাপড়ে,—কিংবা বেল্টের গোটাকতক বেত্রাঘাতে কাজ হয় ভাল,—নইলে একেবারে নির্মমই হয়ে ওঠে আমদানীঘরের মেট্ পান্না। লোহার রড্, গন্গনে কলকের আগুনের ছাঁকা, সবই চলে,—অনায়াসে চালায় পান্না, হাসতে হাসতেই চালায়।···

অথচ আশ্চর্য!—এই পান্না নামক লোকটা এমনিতে কিন্তু তেমন বদ্মেজাজী নয়, মারাত্মক ধরণের মানুষ তো নয়ই কোনমতে। দিব্যি ভদ্রলোকের ছেলে,—ব্যবহারও ভদ্র, কথাবার্তাও মার্জিত। আর চেহারাটা তো মোটেই তেমন ভীতিপ্রদ নয়। বরঞ্চ বিপরীতই। মাঝারি সাইজের রোগা সোগা মানুষটা,—হাত দুটোও হাড্ডিসার,—তার ওপর কেন জানি—সব ক'টা আঙুলও নেই হাতে। চোখও

নাকি একটা কানা,—কালো চশমা নাকি সেই কারণেই পরে থাকে সর্বক্ষণ। তা এহেন পান্না—ওই রাতের বেলায় যখন কয়েক পাইট্ টেনে নিয়ে কোমরের বেল্টা খুলে নিয়ে—সেটাকে চাবুকের মত হাতে নিয়ে দাঁড়ায় আর শিকার সন্ধানে গুটি গুটি সামনের দিকে এগোয়—তখন নাকি ও এক ভীষণ জীব!—কালো চশমার আবরণ ভেদ ক'রেও ওর নাকি চোখ ছুটো জ্বলতে থাকে তখন। ও তখন হিংস্র শ্বাপদই নাকি একটা সর্বপ্রকারে!···

তবে—এ পান্না-নাট্যের আসল নায়ক কিন্তু ও নয়। আসল নায়ক বা নায়কেরা কিন্তু থাকেন অন্তরালে। তাঁরাই পান্নাকে চালান। তাঁরাই ওঁকে নিতি নিতি বেহেড্ হবার মত দেদার পানীয় সরবরাহ করেন,—কার্যসিদ্ধির জন্য ওকে অমন 'ছুরন্ত পশু' হবার জন্য দরাজ হাতে সুযোগ সুবিধে দেন।—আর সর্বোপরি অমন নারকীয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগও নেন ওই নায়কেরাই। হ্যাঁ, পান্নাও পায় বটে কিছুটা,—কিন্তু তা নেহাতই অর্থহীন যৎসামান্য অর্থ। একে তো পরিমাণে উল্লেখযোগ্য নয়, তার ওপর পান্নার নিজের ভোগে তো লাগবে না তার কানাকড়িও। বেচারী পান্না তো আসলে এক লাইফার,—বারেকের তরেও এ জেলের বাইরে যাবার তার অধিকার নেই,—এই কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই একদিন তার চোখের তারা থির হয়ে যাবে। তাই ও পাপের টাকা প্রাণ থাকতে তো আর তার কোন কাজে লাগবে না। আর মরার পরেই—বা কোন্ মহাজন যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত জঘন্য অপরাধীর চিতায় মঠ তোলবার কথা ভাববেন বল? তাই মুখে পান্না যাই-ই বলুক,—আসলে কিন্তু এক অর্থে ও ধাত্রী পান্নারই স্বজাতি। আর মাঝে মাঝে তা বোধ করি—ও বুঝতেও পারে। ওই নিষ্ঠুর হিংস্র পশুসদৃশ পান্নাই নাকি তখন অকারণে অট্টহাসি হাসে,—চোখের কোণ দিয়ে নাকি টস্‌টস্ ক'রে জল গড়ায়···

এ সবই অবশ্য আমার শোনা কথা। শোনা অন্ততঃ জনা তিনেক ভুক্তভোগীর কাছে। আর তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন শুধু মুখেই বলেনি ব্যাপারটা, সর্বাঙ্গ থেকে কিছু কিছু সাক্ষ্যও তার দাখিল করেছে।···কিন্তু এমনিতে যেমনই যা হোক,—যা কিছুই ঘটুক,—তবুও জায়গাটা জেল। এর বাইরের ও লৌহ কপাটের মত ভেতরেও লৌহ শৃঙ্খলা। পান থেকে চুনটি খসবার উপায় নেই এখানে। এতটুকু নিয়মভঙ্গ মানবারও নিয়ম নেই। এমনকি লঘু পাপেও এখানে গুরুদণ্ড হয়। অহরহ হয়। এই যেমন পরশু সন্ধ্যার সেই ঘটনাটাই ধরা যাক। আমাদের ওয়ার্ডের শ্রীমান জগদীশ দাসকে তিন তিনটে দিন কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলে আটকে রাখা হলো। আর তার আগে দু'দুজন জোয়ান সেপাই যেভাবে লাঠিপেটা করলে ওকে কিছুক্ষণ,—তা তো আর কহতব্য নয়। নেহাৎ নিত্য হাত সাফাই ক'রে অনেক ঘি দুধ মাছ মাংসই উদরে চালান করে মানুষটা,—নইলে সেলে সেঁধোবার পূর্বেই ও শুয়ে পড়ত চির নিদ্রায়। কিন্তু আদপে ব্যাপারটা কি? দোষটা কি বেচারীর? শ্রীমান জগদীশ নাকি—কিঞ্চিৎ জবরদস্তি ক'রেই দুপ্যাকেট দামী সিগারেট বাগিয়ে নিয়েছে এক ছাপোষা ভদ্রলোকের কাছ থেকে। তা অপকর্মই তো এটা একটা,—তাই তার সাজাও পেতে হয়েছে ওকে। অন্যত্র যা হয় হোক,—তাই বলে এখানে? উঁহু, অন্যায় করলে শাস্তি সবাইকে পেতেই হবে এখানে। কারণ—জায়গাটা যে জেল! এখানে তাবৎ নিয়ম কানুনই যে খুব কড়া···

দিনে দিনে অনেকদিন কেটে গেল। একে একে অনেকগুলো ঋতুরও পরিবর্তন হলো। পরিবর্তন হলো—আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিরও। ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন রং-এর আনাগোনা ঘটল। এমনকি অমন যে সনাতন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত,—তাদেরও যেন কেমন নিত্য-নূতন ঠেকল। ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন নতুন পাখীরাও এলো,—দু'চারদিন কলরব তুলল, রং বেরঙের পাখা ঝাপটালো, আবার

একদিন কোথায় যেন সব অদৃশ্য হয়ে গেল।...

কালে কালে অনেক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে জেলের ভেতরেও। সুপার পাল্টেছেন,—মোক্তার গেছেন, মুখুয্যে এসেছেন। জেলারও বদলেছেন,—কমল বাঁড়ুয্যে কলকাতা ছেড়েছেন,—দার্জিলিং না কোথায় যেন বদলী হয়েছেন,—নতুন এক নবীনতর জেলার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছেন। এসেছেন নতুন নতুন অনেক রাজবন্দীও। কিছু মিসায়,—কিছু বা সরাসরি সত্যাগ্রহ করে,—ভারতরক্ষা আইনে, ইউ. টি. হিসেবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মার্কামারা রাজনৈতিক কর্মী, কেউ কেউ আবার আদৌ সে জাতীয় নয় কিছু। কেউ সাংবাদিক। কেউ বা সাহিত্যিক। কেউ বা আবার একাধারে সাহিত্যক সাংবাদিক—উভয়ই। আবার—নেহাতই কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মানুষও আছেন—কেউ কেউ। মোদ্দা—হরেক-রকমের বাড়তি কিছু মানুষই এসে জড়ো হয়েছেন একে একে। জড়ো হয়েছেন মানে—সদাশয় সরকারই সবাইকে জড়ো করেছেন অমন। আর তা করেছেনও স্পষ্টতঃ একই কারণে।

এমনিতে যে যেমনই হোন,—একটি ব্যাপারে সবাই কিন্তু ওঁরা এক। ওঁরা কেউ যো-হুকুমের দলে ভিড়তে চাননি, ভেড়েননি। আর যেখানে একের হুকুমই তাবৎ হক্ কথা,—স্বয়ং 'ভগবান উবাচ' সদৃশ,—সেখানে অন্য কথা তো অমার্জনীয় বাচালতাই,—তাই কিঞ্চিৎ হয়রাণি জলপানি না দিলে—হুকুমদারের হিম্মতের প্রমাণ মেলেনা। অতএব—মুর্খ বাচাল,—বন্দী হয়ে বান্দা বনবার চেষ্টা কর কিছুকাল। ..তা ওই সুবাদেই সার বেঁধে প্রতিদিনই এসেছেন কিছু নতুন নতুন মানুষ, জেলগেটে প্রবেশ কালে কিছু কিছু সরকার বিরোধী শ্লোগানও দিয়েছেন,—বন্দেমাতরমও বলছেন। ঘরে বসে বসেই দিব্যি রোজ রোজ শুনেছি ও-সব। তবে ও-আসাটাই যে ঘটেছে শুধু এক তরফা রোজ রোজ,—তা কিন্তু

নয়। রোজ যেমন আসছেন কিছু সত্যাগ্রহী,—জামিন নিয়ে জেল ছেড়ে চলেও যাচ্ছেন তেমনি প্রতিদিন কেউ না কেউ। সকালেই হয়তো বুক চিতিয়ে কেউ বলে গেলেন,—কক্ষণো না। মরে গেলেও না। সত্যাগ্রহী হয়ে—জামিন নেব? পাগল নাকি? ...কিন্তু হা হতোস্মি! বিকেলেই আবার গুটিগুটি এসেছেন সেই মহাজনই,—ভিজে ভিজে চোখে বলেছেন,—মাষ্টারমশাই,—চললাম।

তা যান—যে যেমন ক'রে চান,—পারেন। অপরের আর কি বলবার থাকতে পারে—তাতে! আর আসবার কারণটাই যেখানে অসঙ্গত,—সেখানে যাবার মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজতে বসবে কোন্ মন্দমতি! তবে—ওই যা বলছিলাম—নিত্যি শুধু আসছেনই না বন্দীরা,—যাচ্ছেনও। অবশ্য আসা-যাওয়ার এ দাঁড়িপাল্লায়—আসার দিকটাই অপেক্ষাকৃত অনেক ভারী। তবে—এও সঙ্গে সঙ্গে সত্য-যে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ওই সামগ্রিক আসার অঙ্কটাও অস্বস্তিকর,—দুর্ভাগ্যজনক। এতগুলো দল পশ্চিমবাংলায়,—অতো সব কর্মী সকলের,—কিন্তু জেলে এলেন আর কতজন? ক'জন? —বলতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু কেন? কেন এমন হলো? পশ্চিমবাংলার মতন এমন সচেতন রাজ্য,—এমন সদা সংগ্রামী বাংলা, বিপ্লবী বাংলা,—তবুও কেন এমন নীরবতা? নিষ্ক্রিয়তা? —কেন এমন অহেতুক কালহরণ? এমন আত্মসমর্পণ? বিশেষতঃ জাতীয় জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে? রাজনৈতিক মতাদর্শের এমন ক্রস্‌রোডে?

সত্যিই ভাবি—ব'সে ব'সে এসব কথা। ভাবি,—কিন্তু সন্তোষজনক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনে।

প্রণব মুখুয্যে অবশ্য বলে,—বামেরাই বাম বলে এমনটি হয়েছে। বিশেষ ক'রে সি, পি, এমের ভূমিকাটাই এ প্রসঙ্গে সব চাইতে বেশী হতাশাজনক। পশ্চিমবাংলায় ওরাই সর্ববৃহৎ বিরোধী দল। ওঁদেরই

অনেক ক্যাডার আছে, ক্যাডারদের মধ্যে ডিসিপ্লিন আছে,—দলীয় নেতাদের প্রতি তাঁদের অটুট আনুগত্যও আছে। তথাপি এমন দিনেও সি, পি এম কার্যতঃ নীরব, নিষ্ক্রিয়, পঙ্গুপ্রায়। আর বাকী বামপন্থী বন্ধুদের কথা তো বলবার নয়। তাঁদের তো সেই গাঁটছড়া বাঁধা বৃত্তান্ত! সি, পি, এমের সঙ্গে গিঁট বেঁধেই জড়ানো তো সব। উনি চললে,—চলার গতিতে গিঁটে টান পড়লে,—তবেই তো গুটি গুটি চলবেন তাঁরা! তা খোদ নায়কই যখন নিষ্ক্রিয়,—সাইড ক্যারেকটারে আর কি কারসাজিই বা দেখাবে। অতএব—যা হবার তাই হয়েছে,—শ্মশানের শান্তিই বিরাজ করছে·· দেশজুড়ে···

তা প্রণব মুখুয্যের কথা যে এ প্রসঙ্গে আদৌ প্রণিধানযোগ্য নয়,—তা নয়। সত্যিই তো,—বামেরা তো আন্দোলনমুখী নন। সি, পি, এম্ কার্যতঃ তো নিষ্ক্রিয়ই। আর দলের এই নিষ্ক্রিয়তা যে এখানকার বন্দী সি, পি, এম্ কর্মী বন্ধুদেরও অনেক আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে, অনেক দুঃখের সৃষ্টি করেছে,—তাতো তাঁদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়,—সাধারণ আচার আচরণেই ধরা পড়ে। তাই বোধকরি—হঠাৎ সেদিন সংসদ-সদস্য জ্যোতির্ময় বসু এসে যখন উপস্থিত হলেন এ জেলে,—তখন তাঁকে ঘিরে ওঁদের সবার কী আনন্দ, কি আনন্দ,—ভাব! যদিও শ্রীবসু পাকাপাকি এ-জেলবাসী হতে আসেননি,—নিতান্তই ক'দিনের অতিথি সদৃশ ব্যক্তি, তিহার জেল থেকে সাময়িকভাবে এই প্রেসিডেন্সী জেলে চালান হয়েছেন, পিতৃকার্য সম্পন্ন করতে, ক'দিনের জন্য প্যারোলে পেয়েছেন তা হোক দু'দিনের অধিবাসী, তবুও ভদ্রলোক জবরদস্ত এক সি, পি, এম্ নেতাই তো, তাই—অনেক অন্ধকারের বুকে হঠাৎ এক ঝলক আলো, নিরাশার মাঝখানে অনেকখানি আশা। তাঁকে নিয়ে তাই পার্টি ক্যাডারদের ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ততা,—মুহুমুর্হু খোঁজ-খবর।···

তা জ্যোতির্ময়বাবু আমাদের এই গোরাডিগ্রিতেই উঠেছিলেন। সদ্য সদ্য পিতৃবিয়োগের ব্যথা বুকে নিয়েই এসেছিলেন ভদ্রলোক,

কিন্তু কদিনের সাহচর্যেই অনেক প্রীতি, অনেক আনন্দ আমাদের দিয়ে গেছেন,—বোধকরি নিয়েও গেছেন তেমনি দুহাত ভরে। আমরা স্বভাবতই তাঁর পিতৃকার্যে উপস্থিত হতে পারিনি, কিন্তু ও উপলক্ষ্যে ওই দিনেই প্রেরিত বন্ধুবরের অনেক মিষ্টান্ন উপহারের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ অবশ্যই পেয়েছি।

কিন্তু জ্যোতির্ময়বাবুর এ আগমন তো নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, বলতে গেলে—একটা আকস্মিক দুর্ঘটনাই। আসল মামলার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই কিছু। আসল মামলা তো সেই আন্দোলনের বৃত্তান্ত,—সি, পি, এম সহ তাবৎ বামপন্থী দলগুলোর নিষ্ক্রিয়তার সমস্যা। তা সেখানে কিন্তু প্রশ্নটা নিরুত্তরই থেকে গেল এর পরেও।···

তবে—কি জানো—এই জরুরী অবস্থা নামক গোটা জিনিষটাই যেন কেমন একটা ধাঁধা জাতীয় বস্তু। আন্দোলন-টান্দোলন কিছু নেই, তার ওপর এমনিতে জয়প্রকাশজীর সঙ্গে তেমন গাঁটছড়া বাঁধা জাতীয় সম্বন্ধও কিছু নয় এখানকার বামপন্থীদের, তাছাড়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও শুনেছি সব বহালতবিয়তেই,—অথচ হুট্ ক'রে আচমকাই কিছু সি, পি, এম মার্কা বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন একদিন। পেশায় এঁরা সকলেই শুনলাম—সরকারী কর্মচারী। তা এলেন ভালই হলো,—সঙ্গী-সাথী বাড়লো আমাদের, এমনিতে তাই খুসী হবারই কথা। কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এঁরা ক'জন কোন্ সূত্রে এমন এসে পড়লেন? বেছে বেছে এই ক'টি প্রাণীকেই বা মিসা করা হলো কেন? আর শুধু কি তাই? এঁদের মধ্যে অনেককে আবার সরকার যেমন জেলেও পাঠিয়েছেন তেমনি তাদের চাকরীও খেয়েছেন, বোঝ বৃত্তান্ত!—দেখো,—সরকার আমাদের কেমন বিচক্ষণ! আর শক্তিমান যে তা তো সন্দেহাতীতই। দেখছো না,— একই হাতে কেমন যুগপৎ ডিটেনশান ও 'ডিসচারজ্' অর্ডার ইস্যু করেছেন!···

কিন্তু এসব পরচর্চায় এমন মাতি বল কোন্ মতিতে? আমার নিজের দলের অবস্থাই বা কি? বাহ্যতঃ জয়প্রকাশজীর বড় কাছের মানুষ বলে যাঁরা বেশ একটু কুলীন কুলীন ভাব দেখাতেন,—তাঁরাই বা কোথায় সব? কাউকেই তো ধারে কাছে দেখছি না। অন্য কোন কারাগারেও যে কেউ কায়া ঢুকিয়েছেন,—কৈ, এমন সংবাদও তো বড় কানে আসছে না। বরং শুনছি,—সবাই নাকি সুকৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন,—'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' সেঁধিয়েছেন। তা এ-সংবাদ যদি সত্য হয়,—তাহলে আনন্দেরই কথা। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে থেকে প্রয়োজনীয় আয়োজনেই তো মেতেছেন সব এমন,—শক্তি সঞ্চয় ক'রে সারফেসে সরাসরি ভেসে উঠবেন নিশ্চয়ই সব যথাকালে, আর দুর্বার আন্দোলনও একটা আত্মপ্রকাশ করবে নির্ঘাৎ তখন।--তবে তবুও ভাবি,—কবে আসবে সেদিন?—আর কত দিন পরে?—কখন?···কিন্তু যেমনই হোক,—সে তো ভবিষ্যতের কথা। বোধ করি ভবিতব্যের কথাও।··

মাঝে মাঝে প্রণব মুখুয্যে অবশ্য বলে,—ভাগ্যিস, আর্ এস্, এসের ওপর ব্যান্ চাপিয়েছিলেন সরকার, আর অনেক দিন বাদে হলেও—মুখ্যতঃ ওই ব্যান্ ওঠাবার তাগিদেই ওঁরা আন্দোলনে নেমে পড়েছেন, আর ওই আন্দোলনের রণকৌশল হিসেবেই জনসংঘর্ষ সমিতির পতাকাতলে দাঁড়িয়ে সমিতির নেতা প্রফুল্ল সেনের জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছেন,—আর অমনভাবে ওঁদের নেমে পড়তে দেখে—তাই না ওঁদের সঙ্গে রাস্তায় এসে আরও কিছু মানুষ দাঁড়িয়েছেন, আর তাতে করেই যাহোক কিছু লোক সত্যাগ্রহ ক'রে এজেলে,—সে জেলে ঢুকেছেন, বন্দীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ বাড়িয়েছেন। নইলে ও রাজনৈতিক বিরোধিতা, দলনেতা, দলীয় শৃঙখলা,—এসব শব্দের কোন অর্থই বোধ হয় বোধগম্য হতো না এবারকার এই পরিস্থিতিতে···

তা ও-প্রণব মুখুয্যেই যে কেবল বলে এমন কথা,—তা নয়

কিন্তু। আরও অনেকেই অল্পবিস্তর বলেন অমনতর কথা। সামনা সামনি না বললেও—আড়ালে আবডালে বলেন। সাক্ষাতেও ঠারে ঠোরে দু'চার কথা বলেন। এইতো সেদিন—সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গেই বললেন এক বিশিষ্ট বন্ধু,—দূর! দূর! একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা সরকারের!—হ্যাঁ, মানি,—বিগিনিংএ ঠিক বোঝা যায়নি ব্যাপারটা,—ভেবেছিলো,—কিনা জানি কুরুক্ষেত্রই বেঁধে যায় একটা শেষপর্যন্ত,—তাই নেতাদের আটকেছো,—কিন্তু এখন কি? এতদিনেও কি বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢোকেনি বাবা,—যে এদেশে সবাই লীডারস্, বাট নো ফলোয়ারস্ টুবি লেড্? তা এবার ছাড়্ বাবা সকলকে? তা না,—ডিটেনশান্ কনটিনিউড! ছ্যা, ছ্যা ···তা এ বাক্যগুচ্ছ বাহ্যতঃ সবকারের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হলেও মূলতঃ যে আমাদের বিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যেই বানানো,—তা বুঝতে তো আর কষ্ট হবার কথা নয়।···

এমনকি—এজেলে নবাগত ওই যে কতিপয় সি, পি, এম সমর্থক সরকারী কর্মচারীর কথা বলছিলাম,—তাঁদেরও একজন সেদিন বললেন,—যাই-ই বলুন, এটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য যে আপনারা সব এতদিন জেলে—কিন্তু বাইরে কেউ আপনাদের মুক্তির জন্য আওয়াজও তুললনা! এমনকি একটা হাতে লেখা পোষ্টার পর্যন্ত কোথাও সাঁটলনা!···অথচ দল-টল তো আপনাদের ঠিকই আছে, অফিস-টফিসও খুলছে।—আর তা হবেই বা না কেন, ব্যান্‌ড্ তো আর হয়নি কেউ!···

তা এ-সব কথা হয়তো কেউ কোন মতলব নিয়ে বলেনা। হয়তো আমাদের আঘাত করতেও কথাগুলোকে অমন শানায়না। নিছক কথাচ্ছলেই বলে হয়তো কথাগুলো। কিংবা হয়তো—প্রত্যাশা পূর্ণ না হবার জ্বালাতেই বলে অমন জ্বালাধরানো কথা। ঠিক কিছু বুঝতে পারিনা। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে পারি,—শুধু বোঝা কেন, মর্মে মর্মে অনুভব করি—যে ওদের কথায় আঘাত

পাই,—বেদনা বোধ করি,—বন্দী দিনগুলো যেন আরও বিষন্ন মনে হয়। মনে হয়—অমনভাবে ও-কথাগুলো বলার ওদের কোন প্রয়োজন ছিলনা। ঠিক আমাদের প্রাপ্যও বোধ হয় ছিলনা ও বাক্য-উপহার!—অমন আঘাত!…সত্যি কথা বলতে কি—এসব কথাশুনে মাঝে মাঝে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে কেমন অসহায় বোধ হয়। তবে—ভাগ্য ভাল,—অমন অবস্থাটা তেমন বেশীক্ষণ থাকেনা। হয়তো থাকলে চলেনা বলেই অমন থাকেনা।—কে জানে!…

কিন্তু তাই বলে চিন্তাটা যে একেবারে উবে যায়,—তা নয়। থেকে থেকেই কেমন ফিরে ফিরে আসে, মাথার ভেতরে পাক হয়।—মনটাকে মুষড়ে দেয়। বিশেষ ওই ইন্‌টারভিউয়ের দিনটাতেই যেন ভাবনাটা কেমন পেয়ে বসে। আর তা যে নিছক অকারণে নয়,—তা তুমিও জানো,—তুমিও বোঝো। এমনকি—প্রথমদিকে এক আধদিন তুমিও তুলেছিলে কথাটা। পরে অবশ্য আর বলোনি ও-কথা,—বোধহয় আমি দুঃখ পাই ভেবেই—অমন নীরব থেকেছো ও-প্রসঙ্গে। তবুও—কথাটা যে মাঝে মাঝে তোমারও মনে আসত, তোমার মনকেও ভারাক্রান্ত করত,—ভাবে ভঙ্গীতে তা আমিও বুঝতে পারতাম। কিন্তু—আমরা কেউ ব্যক্ত করি বা না করি, ভাবনাটা তো তাই বলে মরে যায় না! আর তার ভার-বোঝাও কিছু তাতে হাল্কা হয়ে যায় না।…

সত্যিই, কি আশ্চর্য দেখো,—এত লোক তো আসছেন ওই ইন্‌টারভিউয়ের দিনটিতে দেখা সাক্ষাৎ করতে,—খোঁজ খবর নিতে, দুদণ্ড ভাল ভাল কথা বলে বন্দীর মনটাকে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করতে,—উৎসাহ দিতে! আর কত দূর দূরান্তর থেকেও না কত কষ্ট ক'রে কত লোক আসছেন। কিন্তু কৈ, আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা তো কেউ কোনদিন আসেন নি! আসেন না!—কিন্তু কেন?

হ্যাঁ, ভিজিটারদের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দিয়েছেন সরকার:

কিন্তু তুমি তো জানো,—সে ওই নামকা ওয়াস্তে, নিতান্তই খাতায় কলমে। পাঁচের জায়গায় পঁচিশেও বড় কেউ আপত্তি করেন না। এমনকি বেদিনে দেখা করতে এলেও কাউকে বড় ফিরে যেতে হয় না। নিয়ম যাই-ই থাক,—নিয়ত দেখাসাক্ষাত করে যান তো অনেকেই। আর অন্য কোন ভয়েরও যে আশঙ্কা কিছু আছে এ ব্যাপারে—তা-ও তো মনে হয় না। এতদিন তো কাটলো এ জেলে,—কৈ কখনও তো শুনিনি এমন কথা যে—নিছক এই অপরাধীকে দেখতে আসবার অপরাধেই কেউ রাজরোষে পড়েছেন? তবে? তাছাড়া, এ-জাতীয় ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া তো পলিটিক্যাল পার্টির কর্মীদের পক্ষে শোভা পায়না! সত্যিই প্রিয়া,—বন্ধুদের বিরূপ কথা শুনেও যেমন ভাবি,—না শুনেও মাঝে মাঝে এই সব কথা ভাবি। ভাবি—বিশেষ ক'রে এই ইনটারভিউয়ের দিনগুলোতে। মনটা সত্যিই খারাপ হয়।....

তবে বিশ্বশিল্পী যেমন শুধু অন্ধকারই সৃষ্টি করেন না, কালোর পাশে পাশে আলোর রেখাও টানেন, অস্ত আর উদয়কে একই সূত্রে আবদ্ধ করেন, জীবন-শিল্পীও বোধকরি কখনও অবিমিশ্র দুঃখ দেননা। দুঃখ আর সুখের মালা গাঁথেন একই সুতোয়। তাই দলীয় কর্মীদের ব্যবহারে যেমন দুঃখ পাই,—তেমনি সান্ত্বনাও পাই, আনন্দও পাই,—অমন কতশত অপ্রত্যাশিত আগমনে! কত আন্তরিক সৌহার্দ্যে,—প্রাণভরা প্রীতিতে! দলে দলে যখন আমার ছাত্রেরা আসে, ছাত্রীরা আসে, সহকর্মী অধ্যাপকেরা আসেন,—জানা অজানা অনুরাগী বন্ধুরা আসেন,—আসেন কখনও কখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও,—আর আসেন দলে দলে সেই সব আত্মীয় স্বজন—যাঁরা এমনিতে কালেভদ্রেও দেখা দিতেন না বড়,—আর আসেন সকলেই কিছু না কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে,—তখন ক্ষতির তুলনায়—সত্যিই ক্ষতিপূরণটা অনেক বেশী মনে হয়।

অথচ দেখো—এঁরা অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য,—

তাই জেল, পুলিশ প্রভৃতিতে এমনিতে ভয়ই থাকবার কথা। তবুও কেমন অসঙ্কোচেই আসেন সব। আর যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা তো প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধবাদী। তথাপি—ও মতাদর্শঘটিত মামলাকে কেমন অনায়াসে মুলতুবি রেখে ওঁরা আমাকে দেখতে আসেন, প্রাণ খুলে কথা বলেন, হাসেন, হাসান,—নির্দিষ্ট সময় শেষে চলছল চোখেই বিদায় নেন। তুমি তো দেখেছো এসব,—দেখছই প্রতিনিয়ত। তাই বলছিলাম,—সত্যিই শূন্যতা যা সৃষ্টি হয়—ভাগ্যবিধাতা তা পূর্ণও ক'রে দেন।···

আর ভাল কথা, সুকুমারকে মনে আছে তোমার? সুকুমার ভট্টাচার্য?—নিশ্চয়ই মনে আছে। তা দেখো, ও-তো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। আমার মত একজন সরকারের শত্রুরূপে চিহ্নিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখতে আসা,—তা-ও আবার এই জেলের মধ্যে, অতগুলি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অমন সদা সতর্ক ও সন্দিগ্ধ চোখের সামনে,—ওর পক্ষে নিশ্চয়ই খুব দুঃসাহসের কথা। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কাটা আদৌ উড়িয়ে দেবার ব্যাপারই নয় এমন ক্ষেত্রে। তা ওই সুকুমারও এসেছিল সেদিন। অ-দিনে এবং অসময়েই এসেছিল। সরকারী দপ্তর থেকেই সোজা জেল গেটে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভেতরে এসে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছিল। তবে—কথাবার্তা আর তেমন কি,—কেঁদে কেঁদেই তো চোখ ফুলিয়েছিল সারাক্ষণ। কিন্তু বিশ্বাস কর,—সুকুমারের ওই চোখের জলে—যদিও আমাকে অভিভূত করেছিল, আমার চোখেও জল এনেছিল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দেরও আমাকে অধিকারী করেছিল সেদিন—তো বোধকরি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলবে চিরদিন। বন্দী 'স্যারের' জন্য প্রাক্তন ছাত্রের এ-অশ্রুপাত স্যারের পক্ষে যে কতখানি সান্ত্বনা, কত বড় সম্পদ,—তা আর কাকে বোঝাব বল? অন্তর্যামী ভগবানই জানেন,—ওর সেদিনের প্রণিপাতের মুহূর্তে প্রাণভরা কত আশীর্বাদই না ঝরে

পড়েছিল ওর শিক্ষকের। সত্যি প্রিয়া,—এইজন্যই বলছিলাম,—শুধু কালোই নয়,—কালোর পাশে পাশে অনেক, অনেক—আলোর রেখাও টেনেছেন ভগবান।....

তাছাড়া, ওই কালোটুকুও যে একেবারে নিশ্ছিদ্র কালো,—তা-ও কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে বেশ মজার ঘটনাও ঘটে, কৌতুকের খোরাকও জোটে। এই যেমন ধর—আণ্ডারগ্রাউণ্ড বৃত্তান্তটা। দিব্যি ঘুরছেন ফিরছেন, যথারীতি কাজকর্ম করছেন,—এমনকি পার্টি অফিসে টফিসেও মাঝে মধ্যে যাচ্ছেন, জাঁকিয়ে বসছেনও সেখানে কিছুক্ষণ,—খবরাখবর সবই পাচ্ছি,—অথচ তবুও তিনি আণ্ডারগ্রাউণ্ড। ছুনিয়া ঘুরেও নাকি পুলিশ তাঁদের পাত্তা পাচ্ছেন না! বোঝ কি সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু এ-ব্যাপারে সেদিন চরম করলেন অবশ্য চারুভায়া। এই জেলের অফিসের সামনেই।...

ভদ্রলোক অধ্যাপক। তায় পোষাকে আষাকেও পেশাকে বেশ প্রকট ক'রেই চলেন। কলেজে-টলেজেও নিয়মিত যান, ক্লাস-টাসও যথারীতি করেন, মায়—মার্কা মারা পেটফোলা প্রফেসারী ব্যাগটাও সর্বত্র হাতে ঝুলিয়ে বেড়ান,—এমনকি এ জেলেও সেদিন এলেন অমনিরূপে। আর এলেনও ঠিক ইন্‌টারভিউয়ের টাইমে,—যখন চারিদিকে এস,বির লোক গিস্ গিস্ করছে। তবুও আমি কিছু বলবার আগেই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি জানালেন,—আমি আর 'চারু' কিন্তু নই দাদা, রাজেন। ওই নামেই এখন ডাকবেন,—আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছি তো আজকাল। ভাবো অবস্থাটা। হাসব? না কাঁদব?—ক'দিন ধরে কেবল তাই-ই ভাবলাম ব'সে ব'সে......

তবে সত্যি সত্যি আণ্ডারগ্রাউণ্ডেও যে আছেন অনেকে,—তার প্রমাণও কিন্তু প্রায় রোজই কিছু না কিছু পাই। রকম বেরকমের সব বুলেটিন হাতে এসে পৌঁছোচ্ছে। কত না রোমাঞ্চকর সংবাদ,—সব উত্তেজক রচনাই না তাতে কী ছাপানো! আর প্রতিদিন সংবাদহীন

সংবাদপত্র পাঠ ক'রে ক'রে অতৃপ্ত মন আমাদের কী আগ্রহ নিয়েই না ওই সব পাঠ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে!···তা দেখো,—এই বুলেটিনগুলো তো .আর সত্যিই 'বোল্ট ফ্রম দি ব্লু' জাতীয় বস্তু নয়। এগুলোর পরিকল্পনা, এগুলোকে লেখানো, ছাপানো,—এগুলোকে হাতে হাতে বিলি করা, প্রচার করা,—মায় এ জেলের লৌহকপাট ভেদ ক'রেও আমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া,—তা এতসব কর্ম তো আর এমনিতে হয় না! আইন রক্ষকদের জ্ঞাতসারেও হয় না এমন বে-আইনী অপকর্ম! অতএব,—আছে নিশ্চয়ই দেদার দিল্‌দরিয়া মানুষ কর্তাদের অগোচরে,—যদিচ তাঁদের আশে পাশেই। তার ওপর—ওই কর্তাদের ইচ্ছায় প্রকাশিত ও পরিচালিত পত্রিকাগুলোতেও কখনও কখনও অমন ফেরার নেতাদের সংবাদাদিও ছাপা হয়। এমন কি—ওই 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো',—যাকে লোকে ইদানীং 'অল্ ইন্দিরা রেডিয়োই' বলে, তা ও রেডিয়োতেও পলাতক নেতাদের কথা শোনা যায় মাঝে মধ্যে। আর বি, বি, সি, ভয়েস অফ আমেরিকা, বা পিকিং নিউজ্ প্রভৃতিতে তো অমন কাহিনীর ছড়াছড়িই। সুতরাং ও-আণ্ডারগ্রাউণ্ড বৃত্তান্তটা বিলকুল বাজে কথা তো নয়ই, বরঞ্চ হয়তো অপ্রত্যাশিত ভাবেই বড় বেশী সত্য। তবে ওই মহার্ঘ বস্তুটা অমন কাঁচমূল্যে যে কিনতে চাইছে সবাই,—এতেই যা কৌতুক। তাতেই যা আপত্তি।···

কিন্তু কৌতুক যে কেবল পরেরই অমনতর কথায় বোধ করি,—তা নয়। অন্যের কথা ঠিক জানি না, ও-কৌতুক কিন্তু বোধ করি প্রতিদিন আমাদের নিজেদের কথা ভেবেও।···

জানি,—কোন সংবাদ নেই, কিচ্ছু নেই, নিতান্তই কর্তা-কথিত অমৃত বচন ছাড়া,—তবুও প্রতিদিন প্রভাতে যেন জলগ্রহণ করতে ইচ্ছে যায় না কাগজগুলোর পাতা না উল্টে। আর শুধু কি আগ্রহ? উৎসাহও বা কি অফুরন্ত! প্রথম পাতায় নেই,—ঠিক আছে,—দ্বিতীয়তে আছে।—দ্বিতীয়ে নেই, তো তৃতীয়ে নিশ্চয়ই আছে। আর

শেষপাতায় না পৌঁছোনো পর্যন্ত যে শেষ কথা বলা যায় না,—এতো জানা কথাই। তাছাড়া, একটা কাগজে নেই ব'লে বাকীগুলোতেও যে কিছু থাকবে না,—এমন কথাই বা বলবে কোন্ বিজ্ঞজন। তার ওপর,—বাংলা কাগজে হয়তো নেই,—কিন্তু ইংরাজীতে আছে,—হয় এমন অনেক সময়। আকছারই হয়। অতএব ওল্টাও পাতার পর পাতা,—পড়ো এক কাগজ ছেড়ে আর এক কাগজ, বাংলা ছেড়ে ইংরাজী। এমন কি সম্ভব ক্ষেত্রে দৈনিক ছেড়ে সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ছেড়ে পাক্ষিক,—চোখ বুলোও সর্বত্র, হাতড়ে হাতড়ে বেড়াও—মনেধরা সংবাদ, মনোমত সংবাদ। আর তা-ও কি তেমন সহজ কর্ম এ গোরা-ডিগ্রিতে!—একে তো আমরাই আছি বেশ কয়েকজন, আর আছিও সবাই আকণ্ঠ সংবাদ-তৃষ্ণা নিয়ে,—তাই এমনিতেই হাতে আসছে না কখনও গোটা একটা সংবাদপত্রও, একটা পাতা এ পড়েন তো দ্বিতীয় পাতায় চোখ বুলোন দোসরা ব্যক্তি, একজন শেষ করতে না করতে খপ্ ক'রে ছিনিয়ে নেন আর একজন প্রায় চরকির মতনই ঘোরে কাগজগুলো হাতে হাতে,—কিছুই মেলেনা কারো,—কোথাও, তবু কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি, ওই কিছু সংবাদের জন্যই,—সংবাদের মত কোন সংবাদ পাবার আশায়।…

তা এ-চিত্র তো কেবল আমাদের ক'টি প্রাণীর। কিন্তু আমরাই তো সব নয়। আরো তো আছেন অন্ততঃ ডজন দেড়েক মানুষ,—যাঁরা প্রত্যহ সকালে এ গোরাডিগ্রীমুখো হন শুধু কিছু মুখরোচক সংবাদের আশাতেই। আর তাতে এমনিতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। কারণ—এমন অসংখ্য আর এমন রকম বেরকমের কাগজ তো আর কুত্রাপি লভ্য নয় এ কয়েদখানায়। তাই ও কাগজ পড়ুয়েদের অমন ভীড় আমাদের এ-আস্তানায়। আর ওখবরের জন্য খরদৃষ্টি তো তাবৎ রাজনৈতিক বন্দীরই। আর ওই খবরের প্রত্যাশায় প্রত্যহ এই কাগজ নিয়ে তাঁদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি। ফলে আর কার কি লাভ লোকসান হয় তা জানিনা, কিন্তু কাগজ বেচারাদের তো

প্রাণান্তকর অবস্থা। একে আমরা তো টানাটানি করিই,—অধিকন্তু ওঁরাও এসে হাত লাগান। আর ওই হাতে হাতে কাগজগুলোর যা দশা দাঁড়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই—তা আর কহতব্য নয়।

কিন্তু এ, হেন হুলুস্থুলুস কাণ্ড যাকে নিয়ে,—সে কোথায়? সংবাদ কৈ সংবাদপত্রে? শুধু তো পাতার পর পাতা জুড়ে—তাঁরই সংবাদ, তাঁরই বক্তব্য, তাঁরই ছবি—নানারূপে, নানা ভঙ্গিতে। না, না, শুধু তাঁরই নয়,—জননীর সঙ্গে তাঁর তনয়ও আছেন। মা ইন্দিরাও আছেন, পুত্র সঞ্জয়ও আছেন। তা মা যে অমন থাকবেন,—তা তো জানা কথাই। দেশের প্রধানমন্ত্রী তো এমনিতেও প্রাধান্য পাবেন দেশের কাগজে। পাচ্ছেনও অমন অনেকদিন ধরেই। তার ওপর আবার এই এমারজেন্সী পিরিয়ড,—সঙ্গে সেন্সারের সম্মোহন, অতএব—উনি যে অমন সর্বত্র বিরাজিতা হবেন,—তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু আসল ধন্দটা লাগে ওই তনয়কে কেন্দ্র করেই। কি আশ্চর্য! এই যে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের মতই জ্বলছেন অমন জ্বল জ্বল ক'রে,—আর আমরা এই তাবৎ জনসাধারণ এমন জুল জুল ক'রে তা দেখছি,—কিন্তু কৈ, এ-মার্তণ্ডের কোন উদয়াচলের তো সংবাদ পাইনি কেউ কোনদিন! অকস্মাৎ অমন মধ্য গগনে আসন নিলেন কি উপায়ে! কোন সূত্রে! সাধক কবির যে গান শুনেছিলাম 'তনয়ে তারো তারিণী'···তা এ-ও কি সেই তনয়ে তরানোরই লীলা-বৃত্তান্ত! কি জানি—ঠিক কোন ধারণাই কেন করতে পারিনে এ-ব্যাপারে পারিনে—আরও এই কারণে যে—গর্ভধারিণী না হয়—তনয়কে তরাতে উঠে পড়ে লাগলেন,—মায়ের কাছে শুনেছি—কানা ছেলেও পদ্মলোচন পদ্মলোচন ঠেকে,—কিন্তু বাকী সব? তাঁরা সব অমন মুক্ত কচ্ছ হয়ে ওই তারিণী-তনয়ের পিছে ছুটছেন কেন অমন? কি কারণে? নিছক 'ছা'কে খুসী ক'রে মাকে খুসী করতে?···কি জানি! সত্যিই ঠিক সব বুঝে উঠতে পারিনা! বরঞ্চ রকম সকম দেখে মাঝে মাঝে কেমন অবাকই হয়ে

যাই,—কিরে বাবা, দেশটা রাতারাতি মগের মুল্লুক হয়ে উঠল না কি।··

হোন প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় পুত্র, কিন্তু এমনিতে সরকারের তো কেউ নন, সংসদ-সদস্য টদস্যও নন, এমনকি দলনেতা জাতীয়ও কোন কেউ কেটা ব্যক্তি নন,—অথচ শুনি দিব্যি সরকারী ব্যয়ে চলাফেরা করছেন, ফৌজী হেলিকপটারেও উড়ছেন যত্রতত্র, সরকারী প্রকল্পের উদ্বোধনও করছেন বোতাম টিপে টিপে,—সরকারী অর্থের দানকর্মও নিষ্পন্ন করছেন এখানে সেখানে,—আর আশ্চর্য। ওঁকে স্বাগত জানাতে—রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সরকারী পাত্র মিত্র—সবাই ছুটছেন তটস্থ হয়ে। কিন্তু কি সুবাদে হচ্ছে এসব!—কোন প্রোটোকলের প্রভাবে ঘটছে এমন অদৃষ্টপূর্ব কাণ্ডকারখানা!—সত্যিই, সব দেখে শুনে কেমন যেন তাজ্জব বনে যাচ্ছি। তাজ্জব ব'নে যাচ্ছি—সংবাদ-পত্রের কাণ্ডকারখানা দেখেও। ঠিক আছে,—সেন্সারের অঙ্কুশ রয়েছে,—কিন্তু তাই ব'লে কাগজের পাতায় পাতায় শ্রীমান সঞ্জয়কেই অমন অংকশায়ী করতে হবে? সংবাদপত্রকে ব্যক্তি-বিশেষের এ্যালবামে পরিণত করতে হবে। কি জানি।···

কিন্তু—যাক্ সে কথা,—ধান ভানতে সেই শিবের গীত আর নাই বা গাইলাম এমন,—আসল বক্তব্য তো ওই সংবাদজনিত কৌতুকের বৃত্তান্ত। তা ও-কৌতুক চলে যে কেবল সাত সকালে সংবাদপত্রকে ঘিরে,—তা নয়। মুখরোচক নানান সংবাদই এসে নিতি নিতি আছড়ে পড়ে জেলের ভেতরে। কোন্ মহাজন যে প্রথম আমদানি করেন কোন বৃত্তান্তটি তা ঠিক ধরা পড়ে না বড়,—কিন্তু উত্তেজনায় যেন টগ্‌বগিয়ে ফুটতে থাকে জেলখানা···জানেন,—আজ রাত্তিরেই মশাই এমার্জেন্সীর ইতি হয়ে যাচ্ছে।···শুনেছেন দাদা,—গুরুতর ব্যাপার,—দিল্লীতে 'কুপ' হয়ে গেছে আজ সকালে,—এখন ও-তাবৎ সরকারী দপ্তরেই মিলিটারি কনট্রোল। আর তা অমন কয়েক শ'। ট্যাঙ্ক গড়গড়িয়ে নয়াদিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে···সর্বনাশ হয়েছে

সর্বনাশ হয়েছে স্যার ?···জয় প্রকাশ জী ইজ নো মোর···সে কি ? হ্যাঁ সার, এই মাত্র খবর এসেছে···। ইত্যাদি ইত্যাদি সাংঘাতিক রকমের খবরের ধাক্কায় বেসামাল হবার যোগাড়। আর এর কোনটাই যে তেমন বানানো বৃত্তান্ত,—তা নয়। সবই সেই—'ফ্রম হরসেস্ মাউথ্'। অবশ্য বলা বাহুল্য,—এর কোনটির পরমায়ুই তেমন পয়মন্ত নয়,—এই রটলো, আবার এই খারিজ হয়ে গেল, একেবারে সূতিকাগার থেকেই সরাসরি শ্মশান যাত্রা।···

কিন্তু এ-সবও বলতে গেলে তেমন জমাটি কিছু নয়। আসল কৌতুকটা জমে ওঠে সেই বেতার-সংবাদের সময়। বিশেষ ক'রে আকাশবাণী আর বি. বি. সির নিউজের কালে।···

অন্যসময় যে যেমনই থাকুন,—ওই নৈশ সংবাদের আসরে কিন্তু সবাই সমবেত হন, দোতলার বারান্দায় পাশাপাশি সব গোল হয়ে বসেন, ধ্যানমগ্ন ঋষির মত একমন হয়ে ওঠেন। আর কথাবার্তা তো—একেবারে সেই 'স্পিকৃটি নট'। তবে ওই 'স্পিকটি নট'—ব্যাপারটা সেই যতক্ষণ রেডিওরা স্পিক করে। তারপরেই কিন্তু সব সরব, সোচ্চার। কিন্তু সে ব্যাপারেও ও-এলোপাথাড়ি বাক্যচ্ছটা নয়,—এলেম অনুসারে একে একে বক্তব্য নিবেদন। অর্থাৎ—ওই রেডিয়ো প্রদত্ত সমাচারের শব ব্যবচ্ছেদ। কি কি আছে, আর কি কি নেই—ওই পরিবেশিত সংবাদ সমূহে,—তারই সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। তা এ ব্যাপারে—সর্বাপেক্ষা সুনিপুন কারিগর কিন্তু বিমানবাবু। একেবারে অসাধ্য সাধনই ক'রে ফেলেন এক একদিন।···

নির্ভেজাল সরল সংবাদ, প্যাঁচ ঘোঁচ নেই কিচ্ছু,—আমরা সবাই বুঝিও তেমনি, বলিও তদ্রুপ, কিন্তু না, বিমানবাবু ঠিক খুঁজে পেতে বার করবেনই কিছু না কিছু। ছিঁটে কোঁটা হলেও আশার আলো কিঞ্চিৎ ছড়াবেন। আর কি আশ্চর্য, ওর ওই বক্তব্য রাখবার পরে —আমাদেরও কেমন যেন বিচারশক্তিটা নতুন ক'রে নড়ে চড়ে

বসে—,ঠিকই তো,—এদিকটা তো তেমন ভেবে দেখিনি এমন করে! সত্যিই তো, আশা করবার মত অনেক কিছুই আছে তো—সংবাদের ভেতরে। মনে মনে বেশ আশান্বিত হয়েও উঠি বস্তুতঃ।

কিন্তু হয়! সেই যে কবি বলছেন—'আশা শুধু মিছে ছলনা!' তা দু'রাত্তিরও পেরোবার সময় হবে না,—সমস্ত আশাকে নির্মূল ক'রে নতুনতর অঘটনই ঘটে যায় কোন না কোন। কিন্তু আশা-কুহকিনী ছেড়ে যায় না আমাদের,—কানের ঘোরও কাটে না, বিশ্বাস মরেও মরে না,—রোজই সন্ধ্যায় সেই বারান্দায় এসে সবাই বসি,—কান পেতে রেডিও শুনি,—বিমানবাবুর ব্যাখ্যাতেও সায় দি, সন্তুষ্ট হই। প্রতিদিনই ওই একই প্রত্যাশায় পুলকিত বোধ করি। তবে বিশ্বাস কর—,সর্বক্ষণই কিন্তু ঠিক এই একই নেশায় আমি মাতি না। বাইরে হয়তো অমনটিই করি,—কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেক সময় নিজের আচরণেও নিজে কৌতুক বোধ করি, মনে মনে নিজেকে নিয়েই তখন খুব হাসি···

হাসিও অমনি মাঝে মাঝে প্রত্যাশিত ব্যক্তিদের দর্শন না পাবার দুঃখের মধ্যেও। মাঝে মাঝে চাণক্যের সেই শ্লোকটাও কেন জানি মনে পড়ে,—আর তাতেও বেশ কৌতুক বোধ করি। জানই তো চাণক্যের কথা,—"উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব।" তা দেখো,—ব্যসন বলতে যা বোঝায়—তা ঠিক আমার কোনদিনই ছিল না। দুর্ভিক্ষ দেখেছি যদিও,—কিন্তু নিজে ঠিক তার গ্রাসে পড়িনি,—তাই তেমন অবস্থায় পড়লে—কে কি করতেন,—তা ঠিক বলতে বলতে পারব না। আর শ্মশান-শায়ী হয়ে কারো বন্ধুত্ব পরখ করবার দিন যে এখনও আসেনি—তা তো বুঝতেই পারছ। তবে হ্যাঁ,—উৎসবে অনুষ্ঠানে—সুহৃদদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কিন্তু বিগলিত বোধ করেছি বহুবার। কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবে আর রাজদ্বারে—হায়!—সেই—'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়'!···

কিন্তু বিশ্বাস কর,—ও হাজার লবণাক্ত সাগর শুকিয়ে গেলেও আমি দুঃখ করি না। প্রবহমানা পুতঃসলিলা মন্দাকিনী অলকা-নন্দারা যে দর্শন দেয় নিয়মিত,—তাতেই আমি তৃপ্ত, তাতেই আমি পরিপূর্ণ। তুমি তো আসো নিয়মিত,—তাতেই আমি খুসী। অসুস্থ শরীর, পঙ্গু মন, হাজারো কাজ কর্মজীবনে, এক হাতেই সমস্ত সংসার, —তবুও তো একদিনের তরেও বিরতি নেই আসার, বিলম্ব নেই এক মুহূর্ত্তেরও,—এই-ই তো পরম পাওয়া আমার। তাছাড়া যারা আসে না—তাদের না আসার দুঃখ ছাপিয়ে অনেক—অনেক মানুষের, অনেক প্রিয়জনের—আসার আনন্দটাই অনেক বড় হ'য়ে যে দেখা দেয় তাতেও তো সন্দেহ নেই কিছু।...

আর যেদিন ও-ইন্‌টারভিউও থাকে না,—যেদিন তোমরাও কেউ আসোনা,—কারো আসবার কথাও থাকে না, তখনও কিন্তু ও আনন্দের দূত একটি একটি ক'রে আমার সামনে বোধ করি প্রেরণ করেন আমার ভাগ্যবিধাতাই। এই যে প্রতিদিন বেড্‌টির গ্লাসটা হাতে ক'রে সদ্য লক্‌আপ্‌ মুক্ত বন্দী আমি বাইরে এসে দাঁড়াই আর বাঁদিককার আকাশে সুন্দর সূর্যোদয়টা দেখি,—কিংবা ওই যে প্রত্যহ দিনান্তে ডানদিকের রক্তিম আকাশে টকটকে লাল সূর্যটাকে পশ্চিম দিগন্তে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি,—দেখবার মত মন থাকলে তাতেই কি কিছু কম আমন্দ পাই।...জানি, এমনিতে অভিনব কিছু নয়, অদৃষ্টপূর্ব তো নয়ই কিছু, তথাপি—সত্যই কি সুন্দর! সত্যই কি মন মাতানো মহিমান্বিত দৃশ্যটা। মাঝে মাঝে, —আশ্চর্য!—আমার কেন জানি এমনও মনে হয়—ভাগ্যিস জেলে এমন বন্দী হয়ে সীমিত দৃষ্টি নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম, নইলে সত্যিই অমন সূর্যোদয় সূর্যাস্তটা এমন নীবিড় ভাবে দেখবার সুযোগ পেতাম কি কোনদিন? সুযোগ পেতাম কি—অমন অতক্ষণ ধ'রে ধ'রে অতদিন ওই সুন্দর হলদে পাখীটাকে দেখতে?—অমন ঝাঁকে ঝাঁকে ঘন সবুজ পালক, অমন টুকটুক লাল বাঁকা ঠোঁটের

টিয়াগুলোকে দেখতে? অমন স্বাধীন, স্বচ্ছন্দগতি ভাবে? এত কাছ থেকে? প্রতিদিন চোখে পড়ত কি অমন—ক্ষুদ্রকায় বিশ্রীদর্শন অথচ অপূর্ব ছন্দময়দেহ কাঠবেড়াল দম্পতির অমন প্রণয়-লীলা? এত ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ পেতাম কি কোনদিন অমন গুচ্ছ গুচ্ছ স্বর্ণ-চাঁপার এমন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে? আর এমন তারা ভরা রাতের ও-নীলাকাশ প্রত্যক্ষ করেছি:কি কখনও ইতিপূর্বে? বিজলী-বাতির রোশনাই ঘেরা কলকাতায় ও-আকাশ ধরা দিয়েছে কি কোন-দিন আমার কাছে? না, প্রিয়া, আজকের এ কৃত্রিমতার আবরণে মোড়া নগর-জীবনে এমনিতে এ সব দৃশ্য কষ্ট কল্পনারই নামান্তর মাত্র। তাই মাঝে মাঝে সত্যিই ভাবি,—এ-ও এক লাভ বই কি অন্যথায় এই অবক্ষয়ের জীবনে!

আর এই সব পরিচিত অথচ অপরিচিতপ্রায় প্রকৃতির কথা, দেখা অথচ প্রায় না দেখা জীবের কাহিনীই তো তাবৎ কথা নয়—এ জেল জীবনে। আজ আমার চারপাশে বর্তমান, আমারই মত কারাবন্দী ওই যে অগুনতি মানুষ,—যারা অতীতে আমার চলার পথের দু'ধারে এমনিতে ভীড় করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও যাদের দেখেও কোনদিন দেখিনি, দেখবার যোগ্য বলে ভাবিনি, বরঞ্চ সজ্ঞানে যাদের সান্নিধ্য বোধ করি এড়িয়ে চলতে চেয়েছি এতাবৎকালে—তাদের মধ্যেও যে কত দ্রষ্টব্য আছে, কত আকর্ষণ আছে, বিরল মানবিকতার মণিমাণিক্যের কত দ্যুতি আছে,—তা ঘটনাচক্রে এমন ক'রে ওদের কাছাকাছি না এলে বোধ হয় কোনকালেই জানা সম্ভব হতো না আমার পক্ষে। আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণী যে এক অর্থে সত্যিই কত অভিন্ন,—তা কি এমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি কখনও?—না প্রিয়া, সে সব হয়নি এ জীবনে। হতোও না বোধ করি কোনদিন। তেমন সুযোগ বোধ করি পেতাম না কখনও···

আর জানো,—মাঝে মাঝে এরই মধ্যে এক আশ্চর্য অনুভূতির

কেন জানি জন্ম হয় আমার মনের মধ্যে। সমস্ত ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশাকে অতিক্রম ক'রে এক অক্ষয় বিশ্বাস ও অনাবিল আনন্দেরই কল্পলোক যেন জাগ্রত হয় তখন ধীরে ধীরে। মনে হয়—এই লক্ আপ্, এই জেল,—এই দেশ, সমগ্র সসাগরা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে, ওপরের ওই আকাশ, ওই কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক পরিবৃত নক্ষত্র-লোককে অতিক্রম করে,—ঊর্ধে, আরও ঊর্ধে এক মহামহিমান্বিত পরম পুরুষ বিরাজ করছেন,—যিনি তাবৎ বিশ্ব চরাচরের অদৃষ্ট স্রষ্টা, শাশ্বত নিয়ামক, অমোঘ নিয়ন্ত্রক। নিরপেক্ষ নিষ্ক্রম্র বিচারক। তিনি মনুষ্যসহ তাবৎ জীবের সমস্ত সুকৃতি দুষ্কৃতিকে সযত্নে রক্ষা করেন তাঁর নিজ করপুটে, আর তিনিই চরম ও অন্তিম দণ্ডদাতারূপে ভাগ্যে ভাগ্যে ভাগ করে দেন যথাযোগ্য 'সুখানি চ দুখানি চ'। সেই পরম পুরুষই আবার মহাকালরূপে পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত ক'রে দেন কালে কালান্তরে। তিনি সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন,—ঊর্ধে উত্তোলিত করেন, নিম্নে নিক্ষিপ্ত করেন। তিনি গড়েন, তিনি ভাঙেন, আর তাঁরই এই ভাঙাগড়ার সংসারে ব'সে আমরা রাজা সাজি, মন্ত্রী সাজি, মানুষের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা সাজি। নিজের পদভারে সেই ধরণীকেই প্রকম্পিতা করি—যে ধরিত্রীর বুকেই একদিন আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, নিজের চিতাশয্যাও বিস্তৃর্ণ করব একদা যে ধরণীর বক্ষদেশেই। মুর্খ মানব, দুহাতে ঘরের সমস্ত প্রদীপকে নির্বাপিত ক'রে অন্ধকার রাত্রিতে যখন অশুভ পেচক চিৎকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিকে সে সন্ত্রস্ত করে, আর ভাবে— অন্ধকারের বন্যায় বোধকরি ঢল নেমেছে চতুর্দিকেই, তখন সুরসিক বিশ্ববিধাতা শুধু মনে মনে হাসেন, আর অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আলোক রশ্মিকে আকর্ষণ করেন। প্রত্যহ প্রকৃতিতে যেমন নিশাবসানে নবারুণ রাগে পূর্বাচল অপূর্ব আলোকমালায় উদ্ভাসিত করিয়ে তিনি আনেন নব নব পুণ্যপ্রভাত, তেমনি মনুষ্যকৃত অন্ধকারকেও তিনি যথাকালে তাঁর পুণ্যকরস্পর্শে উজ্জ্বলতর আলোকে পরিণত করেন, সূচনা করেন নতুনতর যুগের,

গৌরবদৃপ্ত ইতিহাসের। নিশাচর জীবের শত বীভৎস চিৎকারকে স্তব্ধ ক'রে তখন প্রভাত গগনে সোচ্চারে ঝঙ্কৃত হয় মুক্তিবীণা, শান্তি-বীণা, কল্যাণবীণা। হয় এমন, হবে এমন,—যুগে যুগান্তরে, চিরকাল ধরে....

কখনও কখনও রাত্রির শেষপ্রহরে যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, শয্যাত্যাগ ক'রে বদ্ধ লক্-আপের সামনে যখন এসে দাঁড়াই, একটু একটু ক'রে ফরসা হয়ে আসা একফালি পূব আকাশটার দিকে যখন তাকাই,—ওই অনুভূতিটা অকস্মাৎই কেমন যেন আমার মনে জাগ্রত হয়, আমার মনকে আচ্ছন্ন করে। আর আশ্চর্য, কে যেন তখন অস্ফুটস্বরে আমার কানে কানে বলে—না, না, ভাবনা কোরো না, দুঃখ কোরোনা, কোন ত্যাগ, কোন তিতিক্ষাই বিফলে যায় না।—ওই যে আকাশ দেখছ—একটু একটু ক'রে শুভ্র হচ্ছে, সূর্য ওঠবার প্রস্তুতি চলছে, তেমনি এ-কারাগারের অন্ধকারও কেটে যাবে, মুক্তিসূর্য উঠবে, অচিরেই উঠবে, সব শান্ত হবে, শুভ হবে,—মাভৈঃ, মাভৈঃ—

—শেষ-